রমযানের তিরিশ শিক্ষা

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

রমযানের তিরিশ শিক্ষা

রমযানের তিরিশ শিক্ষা

(নতুন তথ্য সম্বলিত বর্ধিত সংস্করণ)

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

রমযানের তিরিশ শিক্ষা

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

ISBN : 984-581-168-X

প্রকাশনায়
বিশ্ব প্রকাশনী, ঢাকা
পরিবেশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
মক্কা পাবলিকেশন্স
মাওলা প্রকাশনী
রেক্স পাবলিকেশন্স
খেয়া প্রকাশনী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫
দশম প্রকাশ
জুন ২০১৬
রমযান ১৪৩৭
আষাঢ় ১৪২৩

কম্পোজ
মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহ্মদ
আহ্সান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা, ফোন : ৫৮৬১১৯৭৩

প্রচ্ছদ : এম জি এ আলমগীর

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত আশি টাকা মাত্র

RAMADANER TIRIS SIKKAH (Thirty Lessons of Ramadan) Written by **A. N. M. SERAJUL ISLAM**, Published by Bishaw Prokashoni Dhaka, Distributed by Ahsan Publication, Dhaka First Edition February, 1995 Tenth Edition June 2016 Price Tk. 180.00 only.

প্রকাশকের কথা

রমযান মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অতি বড় নিয়ামত। মানুষের কল্যাণের জন্যই রোযার বিধান চালু করা হয়েছে। রোযা হচ্ছে মুসলমানদের পাঁচ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘরের তৃতীয় স্তম্ভ– আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয।

এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। এ মাস রহমতের মাস– এ মাস বরকতের মাস– এ মাস মাগফেরাতের মাস। এটি হচ্ছে নেক কাজের মওসুম। এ মাসে আল্লাহ দিয়েছেন কদরের রাত– যা হাজার মাসের চাইতে উত্তম। এ মাসেই আল্লাহ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন।

এ মাস ধৈর্য ও সবরের মাস, এ মাস জিহাদের মাস, এ মাস বিজয়ের মাস। মুসলমানদের বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয়গুলো এ মাসেই সাধিত হয়েছে। এ মাসে নফল এবাদত ফরযের সমান আর একটা ফরয এবাদতের সওয়াব সত্তরটা ফরযের সমান।

আল্লাহর হুকুমের যথার্থ অনুসরণ করে অনেকেই মাহে রমযানের নিয়ামতে ধন্য করেন নিজেদের, আবার এ অফুরন্ত কল্যাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই আমরা অনেকে। কারণ আরমা জানি না কিভাবে এ মাসের ইজ্জত করতে হয়, কিভাবে চললে লাভ করা যায় এ রহমত ও বকরত।

এ সব বিষয় নিয়ে সহজ সরল ভাষায় **'রমযানের তিরিশ শিক্ষা'** নামে **এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম**-এর বইটি সত্যি অনন্য। ইতিপূর্বে বইটির দুইটি সংস্করণ প্রীতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে বইটি ১৭৬ পৃষ্ঠার স্থলে ২৫৬ পৃষ্ঠায় উন্নীত হয়েছে। নতুন অনেক তথ্য এই বর্ধিত সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ আশা নিয়েই আমরা বইটি প্রকাশ করেছি, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সেইভাবে চালান– যেভাবে চললে তিনি তাঁর বান্দাদের উপর বর্ষণ করেন অফুরন্ত রহমত ও বরকত। আমীন।

সূচীপত্র

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কেবলমাত্র তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং কেবলমাত্র তোমার প্রদত্ত রিজক দ্বারাই ইফতার করেছি। (আবু দাউদ)

ইফতারের পরের দোয়া

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ পিপাসা দূর হয়েছে, খাদ্যনালী সিক্ত হয়েছে এবং পারিশ্রমিক অর্জিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।' (আবু দাউদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম শিক্ষা

ক. তাকওয়া রমযানের মূল শিক্ষা

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য রোযার বিধান চালু হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে মুসলমানের পাঁচ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘর। রোযা হচ্ছে সেই ঘরের তৃতীয় স্তম্ভ। রমযানের রোযা সবার জন্য ফরয।

رَمَضَانُ শব্দটি رَمْضٌ শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। রোযা রাখলে গুনাহ্ মাফ হয়। রমযান গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। তাই এর নাম রমযান। রমযানের রোযা কেন ফরয করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।' (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

এই আয়াতে রোযা ফরয করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে। রোযার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। তাকওয়ার মূল ধাতু হলো وَقْىٌ -এর অর্থ বাঁচা। আল্লাহ বলেন ঃ فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

'আল্লাহ্ তাদেরকে ঐ দিনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছেন।'

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো, ভয় করা।

পারিভাষিক অর্থ হলো ঃ اِمْتِثَالُ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ الزَّوَاجِرِ -

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা'।[১]

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর

---

১. মেরকাত শরহে মেশকাত- মোল্লা আলী কারী (রহ)

মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরয, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া। সকল আলেম, মোহাদ্দিস ও মোফাস্‌সিরগণ তাকওয়ার এই অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ 'তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানী না করা; আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা।[১]

ওমর বিন আবদুল আযীয (র) বলেছেন ঃ 'দিনে রোযা রাখা কিংবা রাত্রে জাগরণ করা অথবা দু'টোর আংশিক আমলের নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ যা ফরয করেছেন তা পালন করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। এরপর আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দান করেন সেটা এক কল্যাণের সাথে অন্য কল্যাণের সম্মিলন।[২]

ইবনুল কাইয়েম (রহ) বলেন ঃ তাকওয়ার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আর যত কিছু বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এটাই সর্বোত্তম সংজ্ঞা। আল্লামা যাহাবী বলেছেন, এটা তাকওয়ার চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। নাসেরুদ্দিন আলবানী বলেছেন ঃ এ বর্ণনা তলাক বিন হাবীবের সংজ্ঞা থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ।

প্রখ্যাত তাবেঈ তলাক বিন হাবীব (রহ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আলোর রৌশনীতে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করা।'[৩]

তাকওয়া হচ্ছে একজন মোমিনের কাম্য গুণ। এই গুণ না থাকলে মোমিন হওয়ার কোন অর্থ নেই। কারণ, যে মোমিন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানে না সে আল্লাহকে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে না। ভয় করলে, অবশ্যই সে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতো। তাকওয়া অর্জনের জন্য কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান দরকার। সেজন্য কোরআন ও হাদীস পড়তে হবে ও বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যারা কোরআন-হাদীস পড়ে না তাদের পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা খুবই কষ্টকর।

তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরয, ওয়াজিব ও হারাম কাজ সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং অন্যদেরকে মোত্তাকী নয় বলে মনে করেন। তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি-পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি,

---

১. সাপ্তাহিক আদ্‌দাওয়াহ, ১০-২-১৯৯৪, রিয়াদ, সৌদী আরব, ২. প্রাগুক্ত, ৩. প্রাগুক্ত

গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব-পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করেন। অথচ এগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়।

কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগণিত ফরয-ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করেন না এবং সেগুলোর খবরও রাখেন না। যেমন, পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান-মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ তারাই সত্যিকার অর্থে মোত্তাকী। তারাই রাসূলুল্লাহর (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জান-মালের সর্বাত্মক কোরবানী করে তাকওয়ার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখান। তারা বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। এরাই যদি মোত্তাকী না হন, তাহলে যারা এতো সস্তা আমল করে এবং কঠিন আমল থেকে দূরে থেকে তারা মোত্তাকী হন কোন্ যুক্তিতে ? তাকওয়াতো শুধু কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরয কাজ আদায়ের নাম নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতিসহ শিক্ষা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানতে হবে।

এক ধরনের ভণ্ড পীর-ফকীর ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে প্রকাশ করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দূরের কথা বরং তার থেকে হাজার মাইল দূরের জিনিস। কেননা, তাকওয়ার অর্থ হল, সকল ফরয-ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে, তারা হারাম কাজগুলো সব করে এবং ফরয-ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা দোজখের ইন্ধন ছাড়া আর কি ?

ওমার বিন খাত্তাব (রা) মৃত্যুর সময় নিজ পুত্র আবদুল্লাহকে অসীয়ত করেন, তুমি তাকওয়া অর্জন করো, যে তাকওয়া অর্জন করলে আল্লাহ তোমাকে বাঁচাবেন, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে (দান করবে) তিনি তাকে বিনিময় দেবেন, যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে দেবেন।

'ওমর বিন খাত্তাব (রা) উবাই বিন কা'ব (রা)কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা) বলেন ঃ আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন ? ওমার (রা) বলেন, 'হাঁ'। উবাই বলেন, কিভাবে চলেছেন ? ওমর বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না

লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই বলেন, 'এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।'[১]

ফলে দেখা যাচ্ছে, হযরত উবাই বিন কা'বের মতে, তাকওয়ার উদাহরণ হচ্ছে, কন্টকাকীর্ণ সরু গিরিপথে চলা। যার দুই দিকেই কাঁটা এবং যে পথে সামনে চলতে হলে সাবধানে না চললে গায়ে কাঁটা লাগার সম্ভাবনা আছে। সমাজে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে কাঁটার সাথে তুলনা করা যায়। আর সামনে অগ্রসর হওয়াকে তাকওয়া বলা হয়। কাঁটার মাঝে চলতে হলে কাঁটা সরিয়ে চলতে হবে। তাহলে কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মোমিনকেও অনুরূপভাবে কাঁটা সরিয়ে নিষ্কন্টক পথে চলতে হয়। তাহলে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মোত্তাকী হওয়া যায়।

বাইম মাছ যেমন কাদার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে কাদা লাগে না, একজন মোমিনও সমাজে পাপ-পঙ্কিলতা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কলুষিত পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। পরিবেশের তালে গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে কলুষমুক্ত থাকেন। তিনি স্রোতের বিপরীতে চলেন এবং সমাজে ন্যায় ও কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত করেন।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।' এখানে 'সম্ভবতঃ' শব্দটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া। কিন্তু রোযা রাখলেই সবাই তাকওয়া অর্জন করতে পারে না। অনেক রোযাদারের রোযা, রাত্রি জাগরণ এবং ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে না যদিও তারা রোযা রেখেছে। এর কারণ কি ? কারণ হচ্ছে, তারা না তাকওয়ার অর্থ বুঝেন, আর না বুঝেন রমযানের উদ্দেশ্য। বুঝেন না বলেই রোযা শেষ হওয়ার পর কিংবা রমযানের মধ্যেই তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন এবং নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকেন। রোযা তাদের জীবনকে বিশুদ্ধ বা সংশোধিত করতে পারেনি। রোযার মাধ্যমে তাদের জীবন এবং আমলের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা রোযার আকাংখিত ফল লাভ করতে সক্ষম হননি। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।' অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব। যাদের চেষ্টা নেই, তারা তা অর্জন করতে পারে না।

---

১. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, আবদুল্লাহ নাসের আলওয়ান, প্রঃ ১৯৮১ দারুস সালাম, বৈরুত।

অন্যদিকে, যারা রোযার মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও আমলে পরিবর্তন এনেছেন এবং রোযার আগে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করতেন, তারা রোযার মাধ্যমে এবং রোযার পর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা শুরু করেছেন, তারাই রমযানের মূল উদ্দেশ্য-'তাকওয়া' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের জন্যই রয়েছে রমযানের অনেক পুরস্কার। হাদীসে রোযাদারের জন্য যে সকল ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা লাভ করবেন।

আল্লাহ সকল যুগের লোকদেরকে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ -

'আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর এখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে তাকওয়া অলবম্বন করো।' (সূরা নিসা ঃ ১৩১)

তাকওয়া অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক ফায়দা আছে। এখন আমরা সে সকল ফায়দা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তাকওয়ার দুনিয়াবী ফায়দা

১. তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا -

'আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন।' (সূরা তালাক ঃ ৪)

এর ফলে সঠিক পথে চলতে বান্দার কোন কষ্ট হবে না।

২. তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

'যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তান তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।' (সূরা আরাফ ঃ ২০১)

৩. শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচা বিরাট সাফল্য। আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ

'জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দেবো।' (সূরা আরাফ ঃ ৯৬)

ফলে বান্দার আর সমস্যা থাকবে না।

৪. সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তৌফিক লাভ করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ـ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার মানদণ্ড দান করবেন।' (সূরা আনফাল ঃ ২৯)

৫. সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ـ

'যে আল্লাহ্কে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন।' (সূরা তালাক ঃ ২০) বিপদ মুক্তি ও প্রশস্ত রিযক বিরাট নেয়ামত।

৬. আল্লাহর ওলী ও বন্ধু হওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ ـ 'মোত্তাকীরা তাঁর বন্ধু।' (সূরা আনফাল ঃ ৩৪)

যার বন্ধু আল্লাহ্, তার আর সমস্যা কি ?

৭. আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ - 'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

এটা তাকওয়ার মহান সাফল্য।

৮. আল্লাহর সাহচর্য লাভ করা যায়। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاتَّقُو اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ 'যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সীমা লংঘন থেকে দূরে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেইসব মোত্তাকীদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪)

আল্লাহু আকবার, আল্লাহর সাহায্য, হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করা কত বিরাট সৌভাগ্য!

৯. মোত্তাকীর আমল কবুল হয়। তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - 'আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।' (সূরা মায়েদা ঃ ৫৭)

আমল কবুল না হলে সর্বনাশ। কিন্তু মোত্তাকীর এটা সৌভাগ্য।

১০. দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

'যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়-ভীতি ও পেরেশানী নেই।' (সূরা আরাফ ঃ ৩৫)

১১. গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবে। তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا -

'যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।' (সূরা তালাক ঃ ৫)

১২. তাকওয়া উত্তম সম্বল। আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

'তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।' (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

১৩. মোত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।' (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

মোমেনের এর চাইতে বড় চাওয়া-পাওয়া আর কি হতে পারে ?

১৪. আল্লাহ মোমেন মোত্তাকীকে নাজাত দেন ও উদ্ধার করেন। তিনি বলেন ঃ

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ -

'যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অনুসরণ করেছে আমরা তাদেরকে উদ্ধার করেছি ও বিপদমুক্ত করেছি।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ১৮)

১৫. তাকওয়ার অনুসারীরা দুনিয়া ও আখেরাতে খোশ খবর লাভ করে। এর মধ্যে দুনিয়ায় স্বপ্ন কিংবা মানুষের ভালবাসা ও প্রশংসা অন্যতম। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

'যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে সুসংবাদ।' (সূরা ইউনুস ঃ ৬৩-৬৪)

তাকওয়ার পরকালীন ফায়দা

তাকওয়ার মাধ্যমে পরকালে জান্নাত, মুক্তি, সম্মান, মর্যাদা ও বহু নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য হবে। এখন আমরা এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহর বাণী ও প্রতিশ্রুতিগুলো উল্লেখ করবো।

১. মোত্তাকীরা বেহেশতে থাকবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ -

'নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে বাস করবে।' (সূরা দোখান ঃ ৫১)

২. তাকওয়ার ফল হবে জান্নাত লাভ। তিনি বলেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنّٰتٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও, যার প্রশস্ততা হলো আসমান-যমীনের সমান; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।' (সূরা আলে এমরান ঃ ১৩৩)

৩. মোত্তাকীরা নহর প্রবাহিত জান্নাতে বাস করবে। তিনি বলেন ঃ

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

'যারা তাকওয়ার অনুসরণ করে তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে জান্নাত- যার পাশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে।' (সূরা আলে এমরান ঃ ১৫)

৪. মোত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ـ

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।' (সূরা আয-যুমার ঃ ৭৩)

দলে দলে মিছিলের মতো জান্নাতে যাওয়ার আলাদা আনন্দ রয়েছে।

৫. মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে বাস করবে। সেখানে কোন বিপদ-আপদ নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ـ

'নিশ্চয়ই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।' (সূরা দোখান ঃ ৫১)

৬. মোত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা লাভ করবে। তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدً ـ

'সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।' (সূরা মরিয়ম ঃ ৮৫)

৭. মোত্তাকীদের জন্য জান্নাতে কক্ষের উপর কক্ষ অর্থাৎ বহুতল ভবন দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ـ

'যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাকওয়া অর্জন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কক্ষের উপর নির্মিত কক্ষ।' (সূরা আয-যুমার ঃ ২০)

৮. মোত্তাকীদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে সত্যের আসন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ. فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

'মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।' (সূরা কামার ঃ ৫৪-৫৫)

৯. মোত্তাকীরাই হবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ـ

'আমার মোত্তাকী লোকদেরকেই আমি জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাবো।' (সূরা মরিয়ম ঃ ৬৩)

১০. জান্নাতকে মোত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিনা কষ্টে তারা তাতে প্রবেশ করবে। এ মর্মে তিনি বলেন ঃ

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ـ

'জান্নাতকে মোমেনদের জন্য নিকটবর্তী করা হবে এবং তা দূরে থাকবে না।' (সূরা কাফ ঃ ৯০)

১১. মোত্তাকীদেরকে বেহেশতের আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিয়ে দেয়া হবে। এ মর্মে তিনি বলেন ঃ

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

'এরূপই এবং আমি তাদেরকে বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে বিয়ে দেবো।' (সূরা দোখান ঃ ৫৪)

১২. আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

'আখেরাতে পৌঁছার পর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।' (সূরা মরিয়ম ঃ ৭২)

১৩. মোত্তাকীদের বন্ধু ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তাই মোত্তাকীদেরকে দুনিয়াতে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করলে পরকালে তারা কাজে আসবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلْاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

'মোত্তাকীদের ছাড়া ঐদিন সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। (সূরা আয-যুখরুফ-৬৭)

১৪. মোত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে পরিষ্কার ও সুপেয় পানি, অবিকৃত স্বাদের দুধ, স্বাদের শরাব এবং স্বচ্ছ মধু এই চার ধরনের নহর প্রবাহিত হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ـ

'মোত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে আছে, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ সুপেয় পানি,

অবিকৃত স্বাদের দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাব, পরিষ্কার মধুর নহরসমূহ এবং তাতে আরো আছে সকল ফল-ফলাদি ও তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা।' (সূরা মুহাম্মদ-১৫)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারিতা ও ফায়দা। কোরআন এবং হাদীসে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। সেজন্য আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ - 'তোমরা আল্লাহকে তাকওয়ার যথার্থ দাবী পূরণ করে ভয় করো।' (সূরা আলে ইমরান-১০২)

পবিত্র রমযান মাস এ মহান তাকওয়ার অনুশীলনের এক বাস্তব কর্মসূচী। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে রমযানের এ মূল শিক্ষা অর্জনের তওফীক দেন। আমীন!

খ. অন্যান্য ধর্মে রোযা

যুগে যুগে এই তাকওয়া অর্জনের সুযোগ ও চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। তাই আমরা দেখি, অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীদের উপরও রোযা ফরয ছিল। একথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

অর্থ ঃ 'যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছিল।' (সূরা বাকারা-১৮৩)

অন্যান্য উম্মতের উপর কি আমাদের মতই রোযা ফরয করা হয়েছিল, না অন্যভাবে, তা আমাদের জানা নেই। হাদীসে এসেছে, হযরত দাউদ (আ) রোযা রাখতেন। তিনি একদিন পর পর বছরের ৬ মাস রোযা রাখতেন। তবে তিনি পুরা দিন রোযা রাখতেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই। ইহুদীরা ১০ই মুহররমে আশুরার রোযা রাখে। সেই দিন আল্লাহ হযরত মূসা (আ)কে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন।

অতীতের বহু জাতি রোযা রেখেছে। পারস্য, রোমান, হিন্দু, গ্রীক, ব্যাবিলনীয় ও পুরাতন মিসরীয়রা রোযা রাখত। ক্যাথলিক গীর্জা রোযার কোন নির্দেশ ও নীতিমালা জারী করেনি। তবে গীর্জার দৃষ্টিতে কোন কোন সময় পূর্ণ উপবাস কিংবা আংশিক উপবাসের মাধ্যমে কিছু গুনাহ মাফ হয় এবং তা এক প্রকারের

তাওবা হিসেবে গণ্য হয়। রোমান গীর্জা, মাঝে মধ্যে দিনে এক বেলা খাবার গ্রহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রোযার উপদেশ দেয়।

প্রাচীন খৃস্টানরা বুধবার, শুক্রবার ও শনিবারে রোযা রাখত। তারা তাদের ওপর আপতিত বিপদ মুক্তির জন্য রোযা রাখত। ৪র্থ খৃষ্টাব্দের শুরুতে খৃস্টানদের উপর মারাত্মক নির্যাতন নেমে আসে। সে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য নবী মূসা (আ)-এর অনুকরণে তারা ৪০ দিন ব্যাপী বড় রোযা রাখত।

এছাড়াও ঐ সময়ে মানুষের মধ্যে এ ধারণা বিরাজ করে যে, মানুষের খাওয়ার সময় শয়তান শরীরের ভেতর প্রবেশ করে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা জরুরী, যেন শয়তানকে তাড়িয়ে নফসকে পবিত্র করা যায়। সে জন্য তারা রোযা রাখত। মথি লিখিত সুসমাচারে আছে, নামায ও রোযা দ্বারা শয়তান বেরিয়ে যায়।

প্রাচীন হিব্রুরা শোক কিংবা বিপদের মুহূর্তে রোযা রাখত। বিপদ দূর হয়ে গেলে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখত। হিব্রু ক্যালেন্ডারে আজও ক্ষমা দিবসে ইহুদীদের রোযা রাখার নিয়ম আছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা বছরে কয়েকদিন একাধারে রোযা রাখত। তাদের মতে, এটা আত্মাকে বিশুদ্ধ করার উত্তম পদ্ধতি। দার্শনিক পিথাগোথ ৪০ দিন রোযা রাখতেন। তার মতে, রোযা চিন্তার সহায়ক। সক্রেটিস এবং আফলাতুনও ১০ দিন রোযা রাখতেন। প্রাচীন সিরিয়ানরা প্রতি ৭ম দিনে রোযা রাখত। আর মঙ্গোলিয়ানরা রাখত প্রতি ১০ম দিবসে। সর্বযুগেই রোযার প্রচলন ছিল।

অনুরূপভাবে, বৌদ্ধ, হিন্দু, তারকা পূজারী ও আধ্যাত্মবাদীদেরও উপবাস সাধনার নিয়ম রয়েছে। তারা বিশেষ কিছু খাবার পরিহার করে আত্মাকে উন্নত করার চেষ্টা করে। তাদের ধারণা, দেহকে দুর্বল করার মাধ্যমে আত্মা শক্তিশালী হয়। আত্মাকে সবল করার জন্য তাদের এই উপবাস প্রথার আবিষ্কার হয়েছে। মূলকথা, রোযা প্রায় সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে রয়েছে। যদিও তার ধরন-প্রকৃতি আমাদের জানা নেই।

২য় শিক্ষা

ক. রমযানের বৈশিষ্ট্য

রমযান মাস মুসলমানের জন্য আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে নেক কাজের মওসুম। এই মওসুমে নেক কাজ করার সুযোগ অনেক বেশী। তাই একজন মোমিন নিজে ঈমান ও আমলকে উন্নত করার জন্য ১১ মাস অপেক্ষা করে। যারা বেশী বেশী নেক কাজ করে এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! পক্ষান্তরে, যারা এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে না, তারা অবশ্যই হতভাগ্য।

রমযানের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. রমযান তাকওয়ার মাস।

২. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট। (বোখারী ও মুসলিম)

৩. রোযাদারের ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতে থাকে।

৪. রোযাদারের সম্মানে বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি বিশেষ দরজা খোলা হবে। ঐ দরজা দিয়ে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বোখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)

৫. আল্লাহ ঈদ পর্যন্ত প্রতিদিন বেহেশতকে সাজাতে থাকেন এবং বলেন, সহসাই আমার নেককার বান্দারা এখানে প্রবেশ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। এই মাস হুরের সাথে রোযাদারের বিয়ের মাস।

৬. এই মাসে বড় বড় শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

৭. বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

৮. রমযানের প্রতি রাত্রে রোযাদার মোমিনদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রমযানের শেষ এক রাত্রেই সারা মাসের সমান সংখ্যক লোককে মুক্তি দেয়া হয়।

৯. এই মাসে কদরের রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

১০. এই মাসের প্রথম ১০ দিন রহমত, মাঝের ১০ দিন ক্ষমা এবং শেষ ১০ দিন দোজখ থেকে মুক্তির দিবস।

১১. অন্য মাসে যে কোন নেক কাজের বিনিময় ১০ থেকে ৭শ গুণ। কিন্তু রমযানের রোযার প্রতিদান এর চাইতেও অনেক বেশী। আল্লাহ নিজ হাতে সেই সীমা-সংখ্যাহীন পুরস্কার দান করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

১২. এই মাস দান-সদকার মাস। এই মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাধিক দান করতেন।

১৩. রমযান মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে, তাই এটি কোরআনের মাস।

১৪. রমযান হচ্ছে জেহাদের মাস। এই মাসে মুসলমানদের বড় বড় ঐতিহাসিক বিজয় সাধিত হয়েছে। তাই এটাকে কোরআনে বিজয়ের মাসও বলা হয়েছে।

১৫. এই মাসে এতেকাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি রমযানে এতেকাফ করতেন।

১৬. ইফতার রমযানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়।

১৭. এই মাসে নফল এবাদত অন্য মাসের ফরযের সমান এবং ১টা ফরয এবাদত অন্য মাসের ৭০ ফরযের সওয়াবের সমান।

১৮. এই মাসের ওমরায় হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারী, মুসলিম)

১৯. রমযান সবর ও ধৈর্যের মাস।

২০. কোন রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদারের রোযার সমান সওয়াব পাওয়া যায়, যদিও রোযাদারের সওয়াবের কোন ঘাটতি করা হয় না।

২১. শ্রমিক কর্মদিবসের শেষে যেমন পারিশ্রমিক পায়, রোযাদারও তেমনি রমযানের শেষ দিন ক্ষমা লাভ করে। (বায়হাকী)

২২. রমযানের পরের মাসে অর্থাৎ শাওয়ালের ৬ রোযা রাখলে পুরো বছর আল্লাহর কাছে রোযাদার হিসেবে গণ্য হবে এবং রোযার সওয়াব লাভ করবে।

২৩. এই মাসে সেহরী খাওয়া হয়। সেহরীতে রয়েছে অনেক বরকত।

২৪. রমযান রাত্রি জাগরণের মাস। এই মাসে সালাতুল কেয়াম অর্থাৎ তাহাজ্জুদসহ তারাবীর নামায পড়া হয়। তারাবীর নামায দ্বারা অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৫. রমযানে সাদাকাতুল ফিতর দিতে হয়। এর মাধ্যমে রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হয়।

২৬. রোযার মাধ্যমে পেটের যাবতীয় অসুখ এবং ডায়াবেটিসসহ বহু শারীরিক রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়।

২৭. রোযার মাধ্যমে মুখ-চোখ ও কানকে সংযত রাখার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে নিন্দা-গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরীর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পায়।

২৮. রমযান হচ্ছে তাওবার মাস। তাওবার মাধ্যমে গুনাহ্ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২৯. রোযার উপবাসের মাধ্যমে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর অভাবী মানুষের দুঃখ বুঝা সহজ এবং এভাবেই রোযা মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতি, মমত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে।

৩০. ঈদুল ফিতরের খুশী রমযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। এর মাধ্যমে যেন আমরা রমযানের মূল শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারি। রমযান যেন আমাদের জীবনে গতানুগতিক না হয়ে কল্যাণ ও মুক্তির প্রতীক হতে পারে সে চেষ্টা সবাইকে করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের জীবনে রমযানকে বারবার ফিরিয়ে আনুন, এটাই হউক আমাদের প্রার্থনা।

খ. রোযার ফযীলত

রমযানের রোযার ফজীলত অনেক। ইসলামে যে সকল এবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার সর্বাধিক তার মধ্যে রমযানের রোযা অন্যতম। অন্য কোন এবাদতের ফযীলত এতো বেশী কমই বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা রমযানের রোযার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

অর্থ ঃ 'যে ঈমান ও এহতেছাবের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখবে আল্লাহ্ তার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে ঈমান বলতে সত্যিকার ও যথার্থ ঈমান এবং সওয়াবের নিয়ত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রোযা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ
ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ اِنَّهُ

تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ اَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ

অর্থ : 'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ গুণ পর্যন্ত সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, রোযা এর ব্যতিক্রম। সে একমাত্র আমার জন্যই রোযা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানা-পিনা ত্যাগ করেছে। রোযাদারের রয়েছে দুইটা আনন্দ। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম।' (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের আরেকটি অর্থ আছে। আর তা হলো, আল্লাহ নিজেই রোযার পুরস্কার হবেন। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাত লাভ করা যাবে। তখন হাদীসটি হবে :

وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ অর্থ : আমি নিজেই এর বিনিময় হবো।

এই হাদীসে অন্যান্য এবাদতের সওয়াবের পরিমাণ উল্লেখ করে রোযাকে ভিন্নধর্মী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি নিজ হাতে রোযার সওয়াব দান করবেন এবং সেটা হবে প্রচলিত হিসেবের চাইতে অনেক বেশী। অর্থাৎ আল্লাহ্ রোযাদারকে রোযার জন্য অনেক বেশী সওয়াব, পুরস্কার ও বিনিময় দান করবেন।

হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) এরশাদ করেছেন :

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلَ مِنْهُ اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ 'বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ সেই দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। রোযাদাররা প্রবেশ করলে তা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।' (বোখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)

রোযার বিশেষ ফজীলত হচ্ছে বেহেশতের রাইয়ান দরজা। এটা রোযাদারের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। 'রাইয়ান' শব্দটি আরবী رِيٌّ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা। রোযাদাররা বেহেশতে প্রবেশের পর সুস্বাদু পানীয় পান করবে, যার ফলে কোন দিন তারা তৃষ্ণার্ত হবে না। ইবনে খোযাইমা উপরোক্ত হাদীসের আরো একটু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন।

তাহলো ঃ مَنْ دَخَلَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا -

অর্থ ঃ 'যারা প্রবেশ করবে, তারা পান করবে এবং যে পান করবে সে আর কোনদিন তৃষ্ণার্ত হবে না।' রোযাদারের জন্য বেহেশতের দরজা 'রাইয়ান' নামকরণের তাৎপর্যও তাই। রাইয়ানের শাব্দিক অর্থের সাথে তাৎপর্যের মিল রয়েছে।

রোযাদারের ক্ষুধার চাইতে পিপাসার কষ্টই বেশী। তাই ক্ষুধার তৃপ্তির পরিবর্তে পানীয় পান করার তৃপ্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বেহেশতে সকল খাবারই মওজুদ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কাছে আমল বা কাজ সাত ধরনের। এর মধ্যে দুই ধরনের আমল ওয়াজিবকারী, অপর দুই ধরনের আমল সমান সমান বিনিময়ের অধিকারী। এক ধরনের আমল ১০ গুণ মর্যাদার অধিকারী। আরেক ধরনের আমল ৭শ' গুণ মর্যাদার অধিকারী এবং সর্বশেষে এক ধরনের আমলের মর্যাদা ও সওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

ওয়াজিবকারী দুই ধরনের আমল হলো– (১) যে ব্যক্তি শির্ক ছাড়া এখলাসের সাথে নির্ভেজাল এবাদতসহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তার জন্য জান্নাত বা বেহেশত ওয়াজিব হবে। (২) আর যে ব্যক্তি শির্কের সাথে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে তার জন্য জাহান্নাম বা দোযখ ওয়াজিব হবে।

সমান সমান বিনিময়ের অধিকারী আমল দুটো হচ্ছে– (৩) যে ব্যক্তি একটি পাপ কাজ করে, তার একটিমাত্র পাপ হয়। (৪) এবং যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করার নিয়্যাত করার পর শেষ পর্যন্ত করেনি সে একটি সওয়াব পাবে। (৫) কেউ একটি নেক কাজ করলে ১০টি সওয়াব পাবে। (৬) কেউ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে তাকে বহুগুন সওয়াব দেয়া হবে। এক দিরহাম দীনার দান করলে ৭শ' দিরহাম দীনারের সওয়াব পাবে। (৭) রোযা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া এর সওয়াব আর কেউ জানে না।' (তাবরানী)

এই হাদীসে বিভিন্ন এবাদতের মধ্যে রোযাকে শ্রেষ্ঠ এবাদত হিসেবে চিত্রিত করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রোযার সওয়াব অগণিত ও অসংখ্য। আল্লাহ কি পরিমাণ সওয়াব বান্দাকে দেবেন, তা তিনিই ভাল জানেন। অথচ অন্যান্য এবাদতের সওয়াবের পরিমাণ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়ায় সবাই তা জানে। নিঃসন্দেহে রোযার বিনিময় ও পুরস্কার রহস্যময়। আমরা যেন রোযার এই রহস্যময় বিনিময় থেকে উদাসীন না থাকি।

হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لاَمِثْلَ لَهُ

অর্থ ঃ তুমি রোযা রাখ। রোযার সমতুল্য কিছু নেই। (নাসাঈ)

ইবনে হিব্বান উল্লেখ করেছেন, এরপর মেহমান ছাড়া আবূ উমামার ঘরে দিনে কখনও ধূয়া দেখা যায়নি। অর্থাৎ তিনি রোযা রাখতেন। রমযানের রোযা ছাড়া নফল রোযারও বিরাট সওয়াব রয়েছে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবূ উমামা রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা করলে আমি বেহেশতে যেতে পারবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে রোযা রাখার কথা বলেন। (ইবনে হিব্বান)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জিহাদের অভিযান পরিচালনা কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে, রোযা রাখ, সুস্বাস্থ্য লাভ করবে এবং সফর কর, ধনী হতে পারবে। (তাবারানী)

এই হাদীসে রোযা রাখলে ভাল স্বাস্থ্য লাভ করা যাবে বলা হয়েছে। এটা কতইনা বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক সত্য। কতগুলো রোগের জন্য রোযা নজীরবিহীন চিকিৎসা। যেমন মেদ-ভুঁড়ি ইত্যাদি। এগুলো থেকে বহুমূত্র, রক্তচাপ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। রোযা বহুমূত্র রোগীর জন্য ঈদ স্বরূপ। কেননা, এর মাধ্যমে রক্তে সুগারের পরিমাণ হ্রাস পায় ও রোগী স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ের ডায়াবেটিস ব্যতীত বাদ বাকী ডায়াবেটিসের জন্য রোযা অত্যন্ত সুফলদায়ক। এছাড়াও পেটের বিভিন্ন অসুখ ও বদহজমীর জন্য রোযা খুবই উপকারী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে আলসার ও গ্যাস্টিকের রোগীর জন্য রোযা বিশেষ উপকারী। তাছাড়া সারা বছর হজমযন্ত্রকে দীর্ঘ মেয়াদী বিশ্রাম দেয়া সম্ভব হয় না। রোযার মাধ্যমে হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لكل شيئ زكاة زكاة الجسد الصوم والصيام نصف الصبر.

অর্থ ঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত বা পরিশুদ্ধি আছে। শরীরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে রোযা। রোযা সবরের অর্ধেক। (ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসে রোযাকে শরীরের যাকাত বলা হয়েছে। কেননা, সম্পদের যাকাতের মতো রোযাও শরীর থেকে অতিরিক্ত কিছু জিনিস বের করে দেয়। যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ ১. বৃদ্ধি করা, ২. পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি অর্জন।

সম্পদের যাকাত দিলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন এবং তাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসে। অনুরূপভাবে তার নৈতিক পবিত্রতাও অর্জিত হয়। রোযার মাধ্যমে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং নফসের লাগামহীন চাহিদা ও খারাপ লোভ-লালসা দূর হয়। ফলে নৈতিক দিক থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে। যদিও বাহ্যিক দিক থেকে শরীরের কিছু ঘাটতি হয় বলে মনে হয়। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ.

অর্থ ঃ রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং দোযখের আগুন থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। (মোসনাদে আহমদ)

রোযাকে ঢাল বলার কারণ হলো, যুদ্ধে ঢাল যেমন শত্রুর তলোয়ার ও তীর বল্লম থেকে যোদ্ধাকে হেফাজত করে, রোযাও তেমনি রোযাদারকে গুনার কাজ ও শয়তান থেকে রক্ষা করে। সত্যিকার রোযাদার তাকওয়ার অনুশীলন করতে গিয়ে হাত, পা, চোখ, কান ও নাকের রোযা রাখে। অর্থাৎ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, যা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ রোযাদার দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

বায়হাকী 'শোআ'বুল ঈমান' গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার নেক ও পাপ কাজের হিসেব নেবেন। তিনি তাদের নেকির বিনিময়ে পাপ কমাতে থাকবেন। তারপরও যদি পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং রোযার বিনিময়ে তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

এই হাদীসে রোযার সওয়াবকে বিনিময়ের উর্ধ্বে রাখার কথা বলা হয়েছে। আন্যান্য নেক কাজের সওয়াবের বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হবে। কিন্তু রোযার

সওয়াব গুনাহ মাফের মোকাবিলায় নয়, বরং বেহেশতে প্রবেশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হবে। রোযার সওয়াব ও মর্যাদা কতইনা বেশী। হাদীসে এসেছে ঃ

وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

অর্থ ঃ 'রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্‌কের সুঘ্রাণ থেকেও উত্তম। (বোখারী ও মুসলিম)

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লামা কোস্তালানী বলেছেন, হাশরের দিন রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ সুগন্ধে পরিণত হবে এবং তা রোযাদারের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে। কারও মতে, আল্লাহ পবিত্র। তিনি কোন দুর্গন্ধকে ভালবাসতে পারেন না। তাই এই দুর্গন্ধ আল্লাহর পরিবর্তে ফেরেশতাদের কাছে বেশী প্রিয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ফেরেশতারাও পবিত্র। তাদের কাছে দুর্গন্ধ কিভাবে মেশকের চাইতে প্রিয় হতে পারে? এই ক্ষেত্রে আল্লামা কোস্তালানীর জবাবই বেশী যুক্তিসঙ্গত।

রোযার সময় উপবাসের কারণে পেট খালি থাকার ফলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। মানুষের কাছে তা দুর্গন্ধ ও ঘৃনিত কিন্তু আল্লাহর কাছে তা পবিত্র। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কারণেই তা মুখ থেকে বের হয়। তাই এর এই অসাধারণ মর্যাদা।

অনুরূপভাবে হাশরের দিন শহীদের শরীরের আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মেশ্‌কের।

রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ পবিত্র হওয়ার কারণে তা মুখের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ দিনে রোযার মধ্যে মেসওয়াক করাকে মাকরূহ বলেছেন কিংবা উত্তম মনে করেননি। প্রখ্যাত মোফাসসির ও মোহাদ্দিস আ'তা বিন আবি রেবাহ এই মতের অনুসারী। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য আছে। কোন কোন আলেম রোযার দিনের শেষাংশে মেসওয়াক করাকে মাকরূহ বলেছেন। তখন পেট সর্বাধিক খালি থাকে ও মুখের দুর্গন্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। এখানে সময়ের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য আছে ঃ (১) আসরের পর থেকে কিংবা (২) সূর্য হেলে যাওয়ার সাথে সাথে অথবা (৩) প্রথম ওয়াক্তে জোহর পড়ার সাথে সাথে মেসওয়াক করা মাকরূহ।

ইমাম আহমদ সর্বশেষ মতের অনুসারী কিন্তু হানাফী মাযহাবের ইমামগণসহ অন্যান্য বহু আলেমের মতে রোযার মধ্যে মেসওয়াক করা মাকরূহ নয়। কেননা, এই মর্যাদা পরকালের জন্যই, দুনিয়ায় মেসওয়াক করে পবিত্রতা অর্জন করা ঐ মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

আবদুল্লাহ বিন গালিব (র) নামায ও রোযার ব্যাপারে খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবরের মাটি থেকে মেশ্‌কের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁর কবরের সুঘ্রাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে জবাবে বলেন, এটা নামাযে কোরআন তেলাওয়াত এবং রোযার উপবাসের কারণে বের হচ্ছে।[১]

বর্ণিত আছে, আল্লাহ মূসা (আ)-এর সাথে ৩০ দিন রোযা শেষে কথা বলার ওয়াদা দিয়েছিলেন। মূসা (আ) রোযা শেষে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলা ভাল মনে করেননি। তিনি মেসওয়াক করে গেলেন। আল্লাহ বললেন ঃ 'হে মূসা! তুমি কি জান না, আমার কাছে ঐ দুর্গন্ধ মেশ্‌কের চাইতেও পবিত্র। যাও এবং আরো ১০টি রোযা পূর্ণ করে এসো।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ ঃ কেয়ামতের দিন রোযা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি, আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। কোরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে রাত্রে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের উভয়কে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।' (আহমদ, তাবারানী হাকেম)

রোযা ও কোরআন যদি বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করে, তাহলে হাশরের কঠিন দিনে তা অন্য যে কোন সাহায্যকারীর চাইতে উৎকৃষ্ট হবে। যদিও সেখানে কেউ কারুর সাহায্য তো দূরে থাক, সাহায্যের নাম শুনলেও পালিয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন ঃ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ. (সূরা আবাসা-৩৪-৩৬)

অর্থ ঃ 'সেদিন ভাই তার ভাই থেকে, মা বাবা থেকে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে, বাচ্চারা নিজ পিতা থেকে পালিয়ে যাবে। সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান আল মোয়াজ্জাম- হাফেজ যায়নুদ্দিন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান বিন রজব। পৃঃ ৫৮। ২. প্রাগুক্ত।

থাকবে।' কারুর ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। হ্যাঁ, যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন, তারা পারবেন। যেমন হাফেজে কোরআনসহ বিভিন্ন লোক। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَاعَدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتّٰى مَاتَ هَرِمًا.

অর্থ ঃ 'কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে এত দূরে রাখবেন, যতদূর একটা কাকের বাচ্চা জন্মের পর থেকে বৃদ্ধা অচলাবস্থায় পৌঁছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উড়তে পারে।' (আহমদ)

এই হাদীসে দোযখ ও রোযাকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলা হয়েছে। অর্থাৎ খালেস নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা রাখলে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে বহু দূরে রাখবেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

অর্থ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়ের সগীরাহ গুনার ক্ষতিপূরণ হবে যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়। (মুসলিম)

এই হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুম'আর পাশাপাশি রমযানকেও মধ্যবর্তী সময়ের গুনার কাফফারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ছোট গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ কবীরা গুনাও মাফ করেন। রমযানের রোযা দ্বারা এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সত্যিই রমযান কতইনা মহান।

হযরত কা'ব বিন উজরাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মিম্বার নিয়ে আসো। আমরা মিম্বার নিয়ে আসলাম। তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, 'আমীন'। তারপর দ্বিতীয় সিঁড়িতেও পা রেখে বললেন, 'আমীন'। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেও 'আমীন' বললেন। তিনি মিম্বার থেকে নামার পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমরা আপনার কাছে আজ এমন জিনিস শুনতে পেলাম যা আগে কখনও শুনতে পাইনি। তখন তিনি

বললেন, হযরত জিবরীল (আ) এসেছিলেন। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যে রমযান পাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহ্ মাফ হয়নি, আমি তখন বললাম 'আমীন' অর্থাৎ হে আল্লাহ্, কবুল করো। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর বললেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করেনি। তখন আমি বললাম 'আমীন'। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিবরীল (আ) বললেন, সেই ব্যক্তিও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা-বাবা দুইজনকে কিংবা একজনকে পাওয়া সত্ত্বেও তাদের সেবা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারেনি। আমি বললাম, 'আমীন'। (হাকেম)

এই হাদীসে রমযানের গুরুত্ব আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ রমযান থেকে যে সকল পুরস্কার পাওয়ার কথা, তা না হলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকা ছাড়া আর কি গতি হতে পারে ? রমযানে রহমত, মাগফেরাত ও নাযাত রয়েছে। রয়েছে আরো অনেক পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে । সিয়াম ও কেয়ামসহ অন্যান্য এবাদতের মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। যদি কেউ সিয়াম-কেয়াম ও অন্যান্য এবাদত না করে, তাহলে তার ভাগ্যে জিবরীল (আ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর বদদোয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে ? আর এ কথা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ঐ দুইজনের বদদোয়া আল্লাহর কাছে অবশ্যই কবুল হবে এবং হতভাগ্য ব্যক্তির দুর্ভাগ্য সুনিশ্চিত হবে। ইবনু আবীদ দুনইয়া হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلصَّائِمُوْنَ يَنْفَحُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ رِيْحُ الْمِسْكِ وَيُوْضَعُ لَهُمْ مَائِدَةٌ
تَحْتَ الْعَرْشِ يَأْكُلُوْنَ مِنْهَا وَالنَّاسُ فِى الْحِسَابِ.

অর্থ ঃ 'রোযাদারের মুখ থেকে মেশ্কের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের নিচে তাদের জন্য খাবার পরিবেশন করা হবে। যে মুহূর্তে লোকেরা হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকবে, ঠিক সে মুহূর্তে তারা খাবার-দাবারে ব্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ তাদের হিসাবের কোন বালাই নেই। তখন অন্যান্য লোক বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের হিসেব চলছে অথচ তারা পানাহার করছে ? তখন তাদেরকে উত্তরে বলা হবে, তোমরা যখন পানাহারে নিয়োজিত ছিলে তারা তখন রোযা রেখেছিলো এবং যখন তারা রাত জেগে নামায পড়েছে তখন তোমারা ঘুমিয়ে ছিলে।[১] অর্থাৎ এখন রোযাদারের অবস্থা দুনিয়ায় বে-রোযাদারের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। (হাদীসটির সনদ দুর্বল)

---

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান আল-মোয়াজ্জাম– হাফেজ যায়নুদ্দিন আবুল ফারাজ।

এক নেক লোক রোযার কারণে মারা যাওয়ার পর তাঁর এক সাথী তাকে কবরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মৃত ব্যক্তি হেসে জবাব দেন, আমাকে ইজ্জত ও সম্মানের পোশাক পরানো হয়েছে এবং খাদেমরা পান পাত্র নিয়ে আমার চারপাশে অবস্থান করছে। পুনরায় আবার সজ্জিত করে আমাকে আওয়াজ দেয়া হয়েছে, হে কোরআন পাঠকারী! তোমার আরো উন্নতি হউক, কসম করে বলছি যে, রোযা তোমাকে নেককার বানিয়েছে।[১]

আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ ঃ 'যখন রমযান আসে তখন বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, দোজখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল পরানো হয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খোযাইমা এবং তিরমিযী এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ রমযানের প্রথম রাতে শয়তান এবং অবাধ্য জিনকে শিকল পরিয়ে আটক করা হয়, দোজখের দরজা বন্ধ করা হয় এবং আর একটি দরজাও খোলা হয় না। বেহেশতের দরজা খোলা হয় এবং একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। একজন আওয়াজ দানকারী এই বলে আওয়াজ দেন, হে কল্যাণ প্রার্থী! এগিয়ে এসো; হে অকল্যাণ প্রার্থী! বিরত থাকো। প্রত্যেক রাতে আল্লাহ দোজখ থেকে বহু লোককে মুক্তি দেন।'

বায়হাকী এক রেওয়ায়েতে বলেছেন ঃ 'দুষ্ট ও কট্টর জিনগুলোকে রমযানে আটক রাখা হয়।' এ দ্বারা বুঝা যায়, সকল শয়তানকে রমযানে আটক করা হয় না। শুধু মাত্র বেশী দুষ্টু কিংবা বড় শয়তানগুলোকে রমযানে আটক করা হয়। ছোট শয়তানগুলো আগের মতোই মুক্ত থাকে। ফলে রমযানে শয়তানের তৎপরতা ও অনিষ্ট কম থাকে কিংবা সীমিত থাকে, একেবারে বন্ধ হয় না। সে জন্য রমযানেও গুনাহর কাজ সংগঠিত হয়। কিন্তু মোমিনরা এ মাসে নেককার হওয়ার চেষ্টা করলে শয়তানের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হবে না। কেননা নাফরমান, দুষ্টু ও বড় শয়তানগুলোকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই এ মাসে পাপী লোকদের নেককার হওয়ার সুযোগ বেশী। মাসব্যাপী বেহেশতের দরজা খোলা এবং দোজখের দরজা বন্ধ রেখে আল্লাহ মূলতঃ মানুষের জন্য এক নেক ও রহমতের পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

---

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান আল-মোয়াজ্জাম– হাফেজ যায়নুদ্দিন আবুল ফারাজ।

শয়তান দুই প্রকার। জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান।

আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন ঃ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

অর্থ ঃ ওয়াসওয়াসা দানকারী জিন ও মানুষ থেকে আশ্রয় চাই।' (সূরা নাস-৬)

জিন শয়তানকে বাঁধা হলেও মানুষ শয়তানকে বাঁধার কথা বলা হয়নি। তাই রমযান মাসে মানুষ শয়তানসহ ছোট ছোট জিন শয়তানগুলো অপকর্মে লিপ্ত থাকার ফলে রমযানে পাপ কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেউ নেক কাজ করতে চাইলে আসমানের রহমতের দরজা ও বেহেশতের দরজা উন্মুক্ত এবং সেদিকে আকর্ষণের পথে বাধা কম।

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাহকে রমযানে এমন ৫টি জিনিস দান করা হয়েছে যা আগের আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১. রমযানের ১ম রাতে আল্লাহ্ তাদের দিকে তাকান। আর আল্লাহ যাদের দিকে তাকান তাদেরকে কখনও আজাব দেবেন না। ২. রোযাদারের সান্ধ্যকালীন মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশ্কের সুঘ্রাণের চাইতে উত্তম। ৩. ফেরেশতারা তাদের জন্য প্রত্যেক রাতে গুনাহ্ মাফ চায় ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৪. আল্লাহ বেহেশতকে নির্দেশ দেন, প্রস্তুত হও এবং আমার বান্দাহদের জন্য সুসজ্জিত হও। শীঘ্রই তারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে আমার ঘর ও সম্মানের কাছে বিশ্রাম নেবে ৫. রমযানের শেষ রাতে তাদের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হয়। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি কদরের রাতে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'না'। শ্রমিকদের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি ? কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তাদেরকে কি পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না ? (বায়হাকী)

এই হাদীসে যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা উম্মাতে মোহাম্মদীর জন্য বিশেষ নেয়ামত ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবু মাসউদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি ঃ বান্দারা যদি জানতো যে রমযান কি, তাহলে আমার উম্মাত পুরো বছর রমযান অব্যাহত থাকার আকাংখা পোষণ করতো। খোজাআ গোত্রের একজন লোক বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে হাদীস শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রমযানের সৌজন্যে বেহেশতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজানো হয়। রমযানের ১ম দিন আরশের নীচ দিয়ে মৃদু হাওয়া প্রবাহিত হয়। ফলে বেহেশতের গাছ-গাছালির পাতাসমূহ পত্পত্ করে ঝংকৃত হতে থাকে। বেহেশতের আয়তলোচনা হুরদের নজর সে দিকে আকৃষ্ট হয়। তারা এই

বলে প্রার্থনা জানায়, হে রব, এই মাসে আমাদের জন্য তোমার বান্দাদের পক্ষ থেকে এমন নয়নাভিরাম স্বামী দান করো যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে এবং আমাদেরকে দেখে তাদেরও চোখ জুড়াবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন বান্দা রমযানে রোযা রাখলে বেহেশতে মনি-মুক্তা দ্বারা তৈরি তাবুতে হুরদের সাথে তাদের বিয়ে হবে। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন ঃ

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ.

অর্থ ঃ 'সুন্দরী হুর বালারা তাবুতে সুরক্ষিতা আছে।' (আর রাহমান-৭২)

তাদের প্রত্যেকের পরনে ৭০ প্রকার সুন্দর পোশাক আছে এবং প্রত্যেক পোশাকের রং অন্যটা থেকে ভিন্ন। তাদেরকে ৭০ প্রকার বিভিন্নধর্মী সুঘ্রাণ সরবরাহ করা হয়, একটা থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক নারীর জন্য রয়েছে ৭০ হাজার দাসী ও ৭০ হাজার দাস। প্রত্যেক দাসের সাথে রয়েছে একটি সোনার তৈরি বড় পেয়ালা। এতে একই রকমের খানা থাকবে কিন্তু প্রথম লোকমার সাথে অন্য লোকমার স্বাদের মিল থাকবে না। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নারীর জন্য লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি ৭০টা খাট থাকবে। প্রত্যেক খাটের ভিতরে মোটা সিল্ক দ্বারা তৈরি ৭০টা মনোরম বিছানা থাকবে। প্রত্যেক বিছানায় থাকবে ৭০টি মনোরম বসার পৃথক আসন। তাদের স্বামীদেরকেও লাল ইয়াকুতের পাথরের তৈরি এবং মুক্তা খচিত নকশা করা খাটের উপর অনুরূপ জিনিস দান করা হবে এবং তাতে থাকবে সোনার দু'টো চুড়ি। এই ভাবে তাদেরকে রমযানের প্রতিটি রোযার বিনিময় দান করা হবে এবং তা হবে অন্যান্য নেক আমল ছাড়াই। (ইবনে খোযাইমা, ইবনে হিব্বান)

এই হাদীসে রমযান মাসের একটি লোভনীয় বিনিময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, রোযাদারদের জন্য সারা বছর বেহেশতকে সাজানো হয় এবং রোযাদারদের সাথে রোযার বিনিময়ে হুর বালাদের বিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রোযা হচ্ছে হুরদের দেনমোহর।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ রমযানের প্রত্যেক রাতে একজন আহ্বানকারীকে তিনবার এই আওয়াজ দেয়ার নির্দেশ দেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি ? আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করবো। কোন তওবাকারী আছে কি ? আমি তার তওবা কবুল করবো। গুনাহ্ থেকে কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি, আমি তার গুনাহ্ মাফ করবো।

সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শা'বানের শেষ

দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বললেন ঃ 'হে লোকেরা! তোমাদের কাছে এক মহান বরকতময় মাস সমাগত। অর্থাৎ রমযান মাস উপস্থিত। এই মাসে এমন এক রাত আছে যা হাজার মাসের চাইতে উত্তম। অর্থাৎ কদরের রাত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মাসে রোযাকে ফরয এবং রাত্রের কেয়াম (তারাবীর নামাযকে) সুন্নত করেছেন। কেউ এ মাসে কোন ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করলে, অর্থাৎ কোন নফল এবাদাত করলে, তা অন্য মাসের ফরয এবাদাতের সমতুল্য হবে এবং কেউ এ মাসে একটা ফরয আদায় করলে তা অন্য মাসের ৭০টা ফরয আদায়ের সমান হবে।

রমযান হচ্ছে ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের সওয়াব হচ্ছে বেহেশত। রমযান সহানুভূতির মাস। এই মাসে মোমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তা তার গুনাহর ক্ষমা ও দোজখের আগুন থেকে মুক্তির উপায় হবে। সেও রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে কিন্তু তাই বলে রোযাদারের সওয়াবের কোন কমতি হবে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের সবারতো রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তাকেও ঐ সওয়াব দান করবেন যে রোযাদারকে একটি খেজুর কিংবা পানি অথবা একঢোক পানি মিশানো দুধ দিয়ে ইফতার করাবে। যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভর্তি করে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এমনভাবে পান করাবেন যে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এ অবস্থায় সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এটা এমন মাস, যার প্রথম ভাগ রহমত, মধ্যভাগ ক্ষমা এবং শেষ ভাগ দোযখ থেকে মুক্তি। এ মাসে কেউ নিজ দাস দাসীর কাজ শিথিল করে দিলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন।' (বায়হাকী 'শোআবুল ঈমান')

ইবনে খোযাইমা আরো একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এই মাসে চারটি কাজ বা অভ্যাস বাড়াও। দু'টো কাজের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং অন্য দু'টো কাজ না করে তোমাদের উপায় নেই। যে দু'টো কাজের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে সে দু'টো কাজ হচ্ছে, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া। আর অন্য যে দু'টো কাজ না করে উপায় নেই, তা হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহর কাছে বেহেশত প্রার্থনা ও দোযখ থেকে আশ্রয় চাইবে।'

এই হাদীসে রমযানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং মোমিনের সবচাইতে বড় চাওয়া পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শাবানের শেষ দিন বিশেষ খোতবায় এই সকল বিষয়ে রোযাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের জন্য শাবান মাস থেকেই প্রস্তুতি নিতেন এবং অন্য সবাইকেও সমান ভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) শাবান মাসের দিনগুলোর ব্যাপারে যেভাবে সতর্ক থাকতেন অন্য কোন মাসে এভাবে সতর্ক থাকতেন না। কেননা শাবানের শেষেই রমযান শুরু হওয়ার কথা। তারপর রমযানের চাঁদ দেখা মাত্রই রোযা রাখতেন। যদি মেঘের কারণে ২৯শে শাবানের রাতে চাঁদ দেখা না যেতো, তাহলে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করেই রমযানের রোযা রাখতেন। (আবূ দাউদ)

এই হাদীস দ্বারাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রমযানের এক সাগর ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন এবং সে জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।

রজব মাস এলে সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দিন এবং রমযান মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। রমযান মাস এলে তারা নিখোঁজ ব্যক্তির আগমনের চাইতে আরও বেশী খুশি হতেন।

তাই রমযানের জন্য প্রতিটি মোমিনেরও অনুরূপ শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

দু'টি স্বপ্ন

হাফেজ যয়নুদ্দিন আবুল ফারাজ বিন রজব লিখেছেন ঃ[১] কোন এক নেক ব্যক্তি বেশী তাহাজ্জুদ পড়তেন ও রোযা রাখতেন। এক রাতে মসজিদে নামায পড়ার পর তিনি ঘুমের চাপ অনুভব করে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নে একদল লোক দেখেন তারা মানুষ নয়। তাদের হাতে প্লেট এবং তাতে রয়েছে বরফের মতো সাদা রুটি। প্রত্যেক রুটির উপর রয়েছে ডালিমের মতো মুক্তা। তাঁরা তাকে বললো, 'খাও'। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি।' তারা তাকে বললেন, এটি রাখ। এই ঘরের মালিক তোমাকে খাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' তিনি বললেন, আমি খেলাম এবং মুক্তাটি উঠিয়ে নিয়ে আসার জন্য হাত

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান আল-মোয়াজ্জাম– প্রকাশ ১৯৮৪ মিসর।

বাড়ালাম।' তারা বললেন, এটি রাখ। আমরা এটা বপন করবো এবং তোমার জন্য উত্তম গাছ জন্মাবো।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ? তারা জবাবে বললেন, এমন এক জায়গায় যা কোনদিন ধ্বংস হবে না, যেখানে ফল পরিবর্তিত হবে না, মালিকানা শেষ হবে না, কাপড় পুরাতন হয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হবে না। সেখানে থাকবে সন্তুষ্টি, ঝর্ণাধারা, নয়নাভিরাম সন্তুষ্ট স্ত্রী, যাদের উপর স্বামীরাও সন্তুষ্ট থাকবে, তারা কারুর ক্ষতি করবে না এবং কাউকে ধোঁকা দেবে না। তোমার উচিত, যেখানে আছো সেখান থেকে পা গুটিয়ে নিয়ে আসা। এটা হচ্ছে মূল লক্ষ্যে রওনার উদ্দেশ্যে একটু তন্দ্রার জায়গা। এরপর তোমাকে এই স্থানে ফিরে আসতে হবে।'

এই স্বপ্নের পর তিনি মাত্র দুই জুম'আ বেঁচে ছিলেন। তারপর ইন্তেকাল করেন। এই স্বপ্ন তিনি যে সাথীর কাছে বর্ণনা করেছেন সেই সাথী তাকে তার ইন্তেকালের রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিটি বললেন, 'আমি তোমার কাছে যে গাছ রোপনের ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম তাতে আশ্চর্য হয়ো না। তাতে এখন ফল ধরেছে।' সাথীটি জিজ্ঞেস করলেন, কি ফল ধরেছে ? তিনি উত্তরে বললেন, 'কেউ এর বর্ণনা দিতে সক্ষম নয়। কোন সম্ভ্রান্ত দরবারে অনুগত ব্যক্তি হাজির হলে যে কি সম্মান ও মর্যাদা পায়, তা বর্ণনা করা অসম্ভব।'

এই ঘটনাটি রোযাদারের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই এ মাসে কেউ কি আছে যে রোযাদারের উদ্দেশ্যে তৈরি বেহেশতের জন্য প্রস্তুত এবং সেই নেয়ামত ভোগ করে আল্লাহর সম্ভ্রান্ত দরবারে সম্মানিত হতে চায় ?

বিশর বিন হারেসকে একজন স্বপ্নে তার কবরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।[১] তিনি বলেন, 'আল্লাহ জানতেন যে, খাওয়ার প্রতি আমার আগ্রহ কম। তিনি আমাকে তাঁর নিজ সত্তা দেখার অনুমতি দিয়েছেন।' তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আমরা পরকালে আপনাকে কোথায় তালাশ করবো ? 'তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর সত্তার প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের দলে।' আবারও প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি তা কিভাবে জানেন ? তিনি জবাব দেন, আমি সকল নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজের দুই চোখকে বিরত রেখেছি, প্রত্যেক গুনাহ ও মন্দ কাজ থেকে আমি দূরে অবস্থান করেছি এবং আল্লাহর কাছে জান্নাতে তাঁর সত্তা দেখার তাওফীক কামনা করেছি।'

এই ঘটনায়ও রোযার তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। 'খাওয়ার প্রতি আগ্রহ কম' এই কথার অর্থ হলো, রোযা রাখা। তিনি রোযা রেখে সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নিজ সত্তা দেখার তাওফীক প্রার্থনা করে তা পেয়েছেন। রোযার

---

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান আল-মোয়াজ্জাম– হাফেজ যায়নুদ্দিন আবুল ফারাজ।

ফযীলত ও মর্যাদা কতই মহান। আল্লাহ্ প্রত্যেক রোযাদারকে ক্ষমা, দয়া ও মুক্তি দান করে বেহেশত নসীব করুন এবং রমযানের জন্য নির্ধারিত সকল ফযীলত ও মর্যাদা দান করুন। এক হাদীসে এসেছে ঃ

(نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ) অর্থ ঃ রোযাদারের ঘুমও এবাদত।'

কেননা ঐ ঘুমের মাধ্যমে রোযাদারের নিয়ত থাকে রমযানের এবাদাত করার জন্য শরীরে শক্তি সঞ্চয় করা। ফলে সে দিনে ধৈর্যধারণকারী রোযাদার আর রাতে পানাহারকারী শোকরগোজার। রমযানের ঘুম এবং খাওয়া দাওয়াও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সোবহানাল্লাহ!

গ. চিন্তার বিষয়

এতক্ষণ আমরা রোযার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রোযার ফযীলত ও মর্যাদা কত অসীম।

এখন আমরা এর পাশাপাশি আরেকটি হাদীস আলোচনা করবো যা প্রতিটি রোযাদার মুসলমানের চিন্তার বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطْشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ.

অর্থ ঃ 'বহু রোযাদার রোযার মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না এবং রাত্রের বহু নামাযী রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না।' (ইবনে মাজাহ)

চিন্তার বিষয় হলো, রোযার এতো অগণিত পুরস্কার ও মর্যাদা সত্ত্বেও বহু রোযাদার এবং তারাবী ও তাহাজ্জুদ গুজারের ভাগ্যে ক্ষুধা-পিপাসা এবং রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছু জোটে না। রমযান মাসে আল্লাহর সকল মাখলুক আল্লাহর রহমতের স্পর্শ লাভ করে, সেখানে বহু রোযাদারের এই দুরবস্থা কেন ? এর কারণ ও প্রতিকার জানা না থাকলে আমরাও সেই দুর্ভাগ্যের মিছিলের অংশীদার হয়ে যেতে পারি। মোটেও বিচিত্র নয় যে, এতদিন আমরা আমাদের রোযার মাধ্যমে ক্ষুৎ-পিপাসা ও রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারিনি।

তাই রমযানের রোযা সম্পর্কে আজ আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা করতে হবে। আসুন, আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে আলোচনা করি। এর ফলে আমরা আমাদের রোযাকে সফল করে তুলতে পারবো। ইন্‌শাআল্লাহ।

৩য় শিক্ষা

অন্তরের রোযা

দেহের রোযার ভিত্তি হচ্ছে অন্তরের রোযা। শুধু তাই নয়, যে কোন এবাদতে অন্তরের স্থান সবার আগে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. (সূরা আত তাগাবুন-১১)

অর্থ ঃ 'যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে হেদায়াত করেন।' অন্তরের হেদায়াত সকল এবাদতের মূল কথা। তাই রোযার জন্য মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত হতে হবে। সৎ নিয়ত, সৎ চিন্তা, পরিকল্পনা, একনিষ্ঠতা কিংবা এখলাস হচ্ছে অন্তরের মূল কথা। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

অর্থ ঃ 'সকল আমলের মূল ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ ঃ 'হুশিয়ার! শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত এমন আছে যা ঠিক ও সংশোধিত হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে এবং তা খারাপ হলে, গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। হুশিয়ার! সেটি হচ্ছে অন্তর।' (বোখারী ও মুসলিম)

মন বা অন্তর দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের অন্তর হচ্ছে, ঈমানের রসে সিক্ত ও আল্লাহ্ প্রেমে উদ্বুদ্ধ। তা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহর প্রতি সকল ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য নিবেদিত। সেই মন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে এবং বাতিল ও অনইসলামী কাজের প্রতি তার থাকে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্রোহের মনোভাব। আরেক ধরনের অন্তর হচ্ছে, মৃত ও অসুস্থ্য। তাকে পাপী অন্তরও বলা যায়। এই অন্তরের প্রধান কাজ হলো,

দ্বীন ও ঈমান এবং নেক কাজে অনীহা, অনাগ্রহ ও ইসলাম বিরোধী কাজে উৎসাহবোধ করা। শেষোক্ত ধরণের অন্তর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا.

অর্থ ঃ তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ এবং আল্লাহ সেই রোগ আরো বাড়িয়ে দেন।' (সূরা বাকরা-১০) আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

অর্থ ঃ তারা কি কোরআনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো (সূরা মোহাম্মদ-২৪)

সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বেশী বেশী করে নিম্নের এই দোয়া পড়তেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

অর্থ ঃ 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী। আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।' (তিরমিযী, কিতাবুল কদর, ইবনে মাজাহ, কিতাবুদ দোয়া')

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তরের রোযা বলতে কি বুঝায় ? অন্তরের রোযা বলতে বুঝায়, অন্তরকে শিরক থেকে মুক্ত, বাতিল আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট ওসওয়াসা-মনোভাব ও নিয়ত থেকে খালি রাখতে হবে। মনকে গর্ব-অহংকার থেকে দূরে, হিংসা-বিদ্বেষ ও লোক দেখানোর মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কেননা, তা নেক আমলকে ধ্বংস করে ও জ্বালিয়ে দেয়। তখন গুনাহর কাজের প্রতি কোন আগ্রহ উদ্দীপনা থাকবে না।

মনকে এ সকল খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখলেই অন্তরের রোযা হয়ে যায়। তখন রোযাদারের মন আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ থাকে এবং তাকে তাঁর নাম ও গুনাবলীসহ জপতে থাকে। অন্তর সর্বদা আল্লাহর সৃষ্ট জগত ও বিচিত্র কুদরত সম্পর্কে ধ্যানে থাকে এবং মন্দ ও খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

মোমিনের অন্তরে ঈমানের রোশনী বা আলো থাকে। এর সাথে অন্ধকার সহ-অবস্থান করতে পারে না। ঈমানী নূর বা আলো বলতে বুঝায়, চিরন্তন পয়গাম, আসমানী শিক্ষা ও আল্লাহর আইনের আলোকবর্তিকা। ঐ নূরের সাথে আল্লাহর তৈরি ফিতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতির নূরও যোগ হয়। তখন দুই নূর এক সাথে হয়– এ কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَاءُ.

অর্থ ঃ 'নূরের উপরে নূর, আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরের দিকে হেদায়াত দান করেন।' (সূরা নূর-৩৫)

অন্তর রোযা রাখলে তা আল্লাহ-প্রেমে আবাদ হয়। তখন তা বাতির মতো মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করে। দিনে তা সূর্যের মতো আলো দান করে এবং ভোর রাতে সোবহে সাদিকের লালিমার মতো জ্বলতে থাকে। অন্তরকে হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ধোকাবাজি থেকে দূরে রাখতে পারলে বেহেশতে প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত হবে।

আহমদ, নাসাঈ,ও বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার একজন সাহাবীর বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। অন্য একজন সাহাবী ঐ সাহাবীকে অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁর মধ্যে বিশেষ কোন আমল আছে কি না, তা জানার জন্য। একদিন তিনি এক বাহানা করে ঐ সাহাবীর ঘরে রাত্রি যাপন করেন। কিন্তু অনবরত অনুসরণ করা সত্ত্বেও তার মধ্যে বিশেষ কোন আমল দেখতে না পেয়ে তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সুসংবাদ সম্পর্কে জানতে চান। তখন তিনি জবাবে বললেন ঃ 'আমি যখন ঘুমাই তখন আমার অন্তর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা কিংবা ধোঁকাবাজি ও শঠতা থেকে মুক্ত থাকে।'

এই হাদীসে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শঠতা থেকে অন্তর মুক্ত রাখার কাজকে বেহেশতে প্রবেশের উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তরের রোযার এটাও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ রোযার মাধ্যমে আমাদের অন্তরকে পূত পবিত্র ও নিষ্কলুষ করুন।

৪র্থ শিক্ষা

পেটের রোযা

পেটের রোযা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর দেহের রোযার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। মানুষের জীবন, কাজ-কর্ম, চরিত্র ও আচরণের উপর হালাল ও হারাম খাদ্যের প্রভাব পড়ে। তাই হালাল খাবার খেলে ভাল ও নেক কাজ করার প্রেরণা জাগে। পক্ষান্তরে হারাম খাবার খেলে গুনাহ্ ও নিষিদ্ধ কাজ করার প্রেরণা জাগে। সে জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

يَاۤ اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا.

অর্থ ঃ 'হে রাসূলেরা! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ কর এবং নেক কাজ কর।'

এখানে পবিত্র খাবারের সাথে নেক আমলকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র ও হালাল খাবারের অনিবার্য দাবী হচ্ছে নেক কাজ করা। (সূরা আল-মোমিনুন-৫১)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক খাও এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।' (বাকারা-১৭২)

আল্লাহ্ পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পবিত্র জিনিসসমূহকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসসমূহকে হারাম করেছেন।' (সূরা আরাফ-১৫৭)

পেটের রোযা বলতে বুঝায় পেটকে হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে বাঁচানো। ভুঁড়িভোজ বা অতিরিক্ত আহার না করা, রোযার সময় দিনে পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং হারাম জিনিস দিয়ে ইফতার না করা।

হারাম খাবার

এখন আমরা হারাম খাবার কি সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

ক. আল্লাহ অনেক খাবার হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন- শুকরের গোশত, হাতী, কুকুর, বিড়ালসহ বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী, চিল, বাজ ও কাকসহ পা দিয়ে ছোঁ মেরে শিকার করা বিভিন্ন পাখী, মদ, মলমূত্রসহ যাবতীয় অপবিত্র জিনিস।

খ. হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ খাওয়া হারাম। হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ অনেক। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. সুদ

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ বেচা-কেনা ও ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।' (সূরা বাকারা-২৭৫)।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান-১৩০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ সূদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও স্বাক্ষীগণের উপর লানত বর্ষণ করেন।' (মুসলিম, আহমদ, বায়হাকী)

যারা ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্প ও কৃষি কাজে সুদী কাজ-কারবার করে তাদের ঐ সকল আয় হারাম। সে আয় খেয়ে রোযা রাখলে, যাকাত দিলে কিংবা হজ্জসহ যাবতীয় নেক কাজ করলে আল্লাহ কবুল করবেন না।

২. ঘুষ

ঘুষের আয় হারাম। এই আয় দিয়ে খাদ্য কিনে খাওয়া, জীবিকা নির্বাহ করা ও পরিবার চালানো হারাম। স্বভাবতই এই অর্থ খরচ করে রোযা রাখলে, সেহরী ও ইফতার খেলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ فِى النَّارِ.

অর্থ ঃ 'ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহণকারী দুইজনই দোযখে যাবে।' কেউ কেউ ঘুষকে বকশিশের সমতুল্য মনে করেন এবং ভাবেন যে, তা ঘুষ নয়, আসলে তা ঘুষ।'

৩. অন্যায় পথে অর্থ আয় করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

অর্থ ঃ 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাত করো না।' (বাকারা-১৮৮)

অন্যায়ভাবে আয়ের বহু পদ্ধতি ও উপায় আছে। এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, চুরি-ডাকাতি করা, যাদু ও মন্ত্র করা, জুয়া, মদ ও হারাম জিনিসের ব্যবসায়ে আয়, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

৪. জুলুম

আল্লাহ্ জুলুম করে অর্থ আয় করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْـوَالَ الْيَـتَـامٰى ظُلْمًـا اِنَّمَـا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

অর্থ ঃ 'যারা জুলুম সহকারে ইয়াতীমের মাল-সম্পদ খায়, তারা মুলতঃ পেটে আগুন প্রবেশ করায় এবং তারা শীঘ্রই দোজখে প্রবেশ করবে।' (সূরা নিসা-১০)

সমাজের ধনী ও শক্তিশালী লোকেরা কিংবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অনেক সময় জবরদস্তি ও জুলুম করে অপরের অর্থ আত্মসাত করে।

হারাম আয়-রোজগার দিয়ে রোযাসহ যত এবাদত করা হয় সেগুলোর কোনটাই যে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি প্রকাশ্য হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

ثُمَّ ذَكَـرَ الـرَجُلَ يُـطِيْـلُ الـسَّـفَـرَ اَشْـعَثَ اَغْـبَـرَ يَمُـدُّ يَدَيْـهِ اِلَى السَّمَـاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَـطْعَمُـهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُـهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُـهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ.

অর্থ ঃ 'তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক মুসাফিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন যিনি বহু দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে এসেছেন এবং যার চুল ধূলা-মলিন ও এলোকেশী, তিনি আকাশ পানে দুই হাত তুলে দোয়া করেন এবং বলেন, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারামের উপর ভিত্তি করেই তিনি গড়ে উঠেছেন, তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে ?'

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় লোকটি বড় ও বেশী এবাদতকারী এবং বহু দূর-দূরান্ত থেকে পবিত্রস্থান সফরে এসেছেন দোয়া ও এবাদতের জন্য। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি ? যার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম আয়ের এবং যিনি হারাম খেয়েই নিজের শরীরের রক্ত-মাংস তৈরি করেছেন তার এবাদত অবশ্যই আল্লাহ কবুল করবেন না। তাই তার রোযা ব্যর্থ।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি খানা খান। তারপর নিজের চাকরকে জিজ্ঞেস করেন, এই খাবার কোথা থেকে এসেছে ? চাকর জওয়াব দেয়, আমি জাহেলিয়াতের যুগে গণকের কাজ করে যে অর্থ পেয়েছি তা দিয়ে এই খাবার কিনেছি। তখন হযরত আবু বকর (রা) মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমি করেন ও সকল খাবার বের করে ফেলেন। (মুসলিম)

হারাম থেকে বাচার কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! তাই হালাল কামাই-রোজগার ও হালাল খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'নিজ হাতের কামাই-রোজগারের চাইতে বান্দার উত্তম খাবার আর কিছু নেই। স্বয়ং আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতের আয় থেকে খেয়েছেন। (বোখারী-কিতাবুল বুয়ু)

বিভিন্ন নবী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রি, হযরত মূসা (আ) রাখাল, হযরত দাউদ (আ) কামার, হযরত সোলাইমান (আ) রাজমিস্ত্রি, হযরত যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রি এবং হযরত মোহাম্মদ (সা) রাখাল ও ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম একদিকে ব্যক্তি জীবনে যেমন হালাল আয়ের নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনেও হালাল আয়-রোজগারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম সুদ, ঘুষ, জুয়া, হারাম জিনিসের ব্যবসা-বাণিজ্য, চোরাকারবারী, মজুতদারী, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল মেশানো, চুরি-ডাকাতি, জুলুম-নির্যাতন ও ছিনতাই-রাহাজানির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে হারাম ঘোষণা করেছে।

তাই একজন রোযাদারকে ব্যক্তিগত আয়-রোজগার হালাল করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও ইসলাম সম্মত করার চেষ্টা করতে হবে। রাষ্ট্র থেকে সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ও অন্যান্য আয়ের সকল উৎস বন্ধ করে দিতে হবে।

তা না হলে সেগুলোর হারাম প্রভাবও ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত কাপড়ের কলের তৈরি কাপড় পরে আমরা নামায-রোযা ও দোয়া করছি। সুদের ময়লাযুক্ত ঐ সকল কাপড় পরে এবাদত কিংবা দোয়া করলে কতটুকু কবুল হবে তা চিন্তার বিষয়।

তাই প্রয়োজন হচ্ছে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা, যার ফলে ব্যক্তিগত আয়কে হালাল করা অধিকতর সহজ হবে।

৫ম শিক্ষা

জিহ্বার রোযা

ইসলামে মুখের কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। জিহ্বা হচ্ছে কথা বলার বাহন বা হাতিয়ার। তাই জিহ্বাকে সংযত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রোযার ক্ষেত্রে এই সংযম আরো বেশী দরকার।

আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ ঃ 'কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে।' (সূরা ক্বাফ-১৮)

অর্থাৎ মানুষের উচ্চারিত সকল শব্দের তদারক করা হয় এবং সেজন্য হিসেব দিতে হবে। তাই কথা বলার সময় বিবেচনা করতে হবে ও ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা যাবে না।

কোরআনে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করাকে মোমিনের বিশেষ গুণ আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

অর্থ ঃ ('তারাই মোমিন) যারা অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকে।' (সূরা আল-মোমিনুন-৩)

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মো'আজ (রা)-কে বললেন ঃ হে মো'আজ! এটাকে সংযত রাখ। এ কথা বলে তিনি নিজ জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন মো'আজ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল কথা বলি, সেগুলোর ব্যপারেও কি আল্লাহ পাকড়াও করবেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সর্বনাশ, হে মো'আজ! জিহ্বার খারাপ ফসল হিসেবেই মানুষকে তার নিজ চেহারার উপর উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত সাহাল বিন মো'আজ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ 'যে আমাকে তার দুই ঠোঁট ও দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার বেহেশতের নিশ্চয়তা দেবো।' (বোখারী)

এই হাদীসে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দুই স্থানকে হেফাজত করলে বেহেশত পাওয়া যাবে।

মূলতঃ এই দুটো জিনিস খুবই বিপজ্জনক এবং শয়তানের বড় হাতিয়ার। জিহ্বার কারণেই মানুষ কষ্ট পায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'সেই ব্যক্তি মুসলমান যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' (বোখারী ও মুসলিম)

পক্ষান্তরে যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়।' প্রবাদ আছে, 'কথার ঘা শুকায় না, মারের ঘা শুকায়।' তাই জিহ্বার ব্যাপারে সর্বাধিক সর্তক থাকতে হবে।

কথা কম বললে ভুল কম হবে এবং অপরাধ বাড়বে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে কিংবা চুপ করে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ভাল কথাই বলা উচিত। আর ভাল কথা না থাকলে চুপ করে থাকা উচিত।

জিহ্বার ১৫টিরও বেশী দোষ আছে। সেগুলো জিহ্বা ছাড়া সংগঠিত হতে পারে না। সেগুলো হচ্ছে ঃ ১. মিথ্যা বলা ২. খারাপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ৩. অশ্লীল ও খারাপ কথা বলা ৪. গালি দেয়া ৫. নিন্দা করা ৬. অপবাদ দেয়া ৭. চোগলখুরী করা ৮. বিনা প্রয়োজনে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া ৯. মোনাফেকী করা ও দুই মুখে কথা বলা ১০. ঝগড়া-ঝাটি করা ১১. হিংসা করা ১২. বেহুদা ও অতিরিক্ত কথা বলা ১৩. বাতিল ও হারাম জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা ১৪. অভিশাপ দেয়া ১৫. সামনা-সামনি প্রশংসা করা।

সূক্ষ্ম অর্থ সহকারে কথা না বললে কোন কোন সময় তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

মোমিনদেরকে সাধারণভাবে এবং রোযাদার মোমিনকে বিশেষভাবে জিহ্বার এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই প্রিয় নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ.

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করে না, তার খানাপিনা বন্ধ রাখতে

আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।'(বোখারী) অর্থাৎ আল্লাহ এই জাতীয় রোযা কবুল করবেন না এবং তার সওয়াব দেবেন না। প্রিয় নবী আরো বলেছেন ঃ

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ.

অর্থ ঃ 'কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়, বরং রোযা হচ্ছে, বেহুদা কথা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা।' (ইবনে হিব্বান) হাফেজ আবু মূসা আল মাদানী বলেছেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) রোযাকে জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বিশুদ্ধ রাখার পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন ঃ

اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفَثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ.

অর্থ ঃ 'তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার।' (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিই জিহ্বার অপরাধ থেকে বাঁচার উত্তম মাপকাঠি। অর্থাৎ কেউ তাকে খারাপ কাজে জড়াতে চাইলে সে জড়িয়ে যাবে না বরং এড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জিহ্বার লাগাম খুলে দেয় তার রোযা কিভাবে হয় ? যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলে ও কথার মাধ্যমে ধোঁকা দেয় তার রোযার অর্থ কি দাড়ায় ? যে ব্যক্তি পরনিন্দা করে, গালি দেয় ও অন্যকে কষ্ট দেয়, তার রোযার ফলাফল কি হবে ? এ সকল রোযা সবই নষ্ট এবং বাতিল।

কত লোক আছে জিহ্বার অনিষ্টতার কারণে তাদের সকল রোযা নষ্ট হয়ে যায়। রোযার উদ্দেশ্য তো শুধু উপোস থাকা নয়। বরং রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদব, শিষ্টাচার ও সংযম শিক্ষা করা এবং তার প্রয়োগ করা। তাই রোযাদারের মুখ সর্বদা ভাল কথা, কোরআন পাঠ, তাওবা, তাসবীহ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং আল্লাহর রহমতের আর্দ্রতায় ভিজা থাকবে।

---

১. ওজায়েফ শারহি রামাদান – হাফেজ যাইনুদ্দিন আবুল ফারাজ– নাইদা প্রকাশনী– মিসর- ১৯৮৪।

৬ষ্ঠ শিক্ষা

কানের রোযা

কান শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কানের মাধ্যমে বাইরের উদ্দীপক ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নবজাত ভূমিষ্ঠ শিশু প্রথমে কানে শুনে। চোখ থাকা সত্ত্বেও সে কিছু দেখতে পায় না। অবশ্য ২/১ দিন পর কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শিশুর চোখে দেখার কাজ শুরু হয়। সম্ভবতঃ কোরআন নিম্নোক্ত আয়াতে চোখের আগে কানের উল্লেখ করে এই সৃষ্টি রহস্য এবং কানের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

অর্থ ঃ 'নিশ্চই কান, চোখ ও অন্তরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)

এই আয়াতে প্রথমে কান ও পরে চোখ এবং অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর দায়-দায়িত্বের বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর কথাও বলা হয়েছে।

তাই কানের রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। কান যা শুনে সে জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জওয়াব দিতে হবে। কান দিয়ে ভাল জিনিস শুনতে হবে এবং খারাপ জিনিস থেকে কানকে দূরে রাখতে হবে।

কানের রোযা বলতে কি বুঝায় ?

কানের রোযা হচ্ছে, বাজে গান-বাজনা না শুনা এবং মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কথা যেন কানে প্রবেশ না করে সে জন্য চেষ্টা করা। নেক লোকেরা ভাল কথা ভালভাবে শুনেন এবং খারাপ কথা কিংবা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকথা তারা শুনেন না। কেউ যদি গুনাহ ও পাপের কথা কানে প্রবেশ করায় তাহলে তা তার অন্তরে ঘর, সদিচ্ছার প্রাসাদ ও জ্ঞানের বাগানকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্ নেক লোকদের কানের একটি সৎ গুণ সম্পর্কে কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

অর্থ ঃ 'তারা যখন অতিক্রম করে তখন ভদ্র ভাবে অতিক্রম করে।' অর্থাৎ তারা খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক্য না শুনে ভদ্র ভাবে চলে যায়। (সূরা ফোরকান-৭২)

আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ.

অর্থ ঃ 'তারা যখন বেহুদা কথা শোনে তখন তারা তা এড়িয়ে যায়।' (সূরা আল-কিসাস-৫৫)

অপরদিকে, যারা পাপী ও গুনাহগার তারা মন্দ ও অশ্লীল কথা, গালি, গান-বাজনাসহ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো শোনে এবং আল্লাহ প্রদত্ত শ্রবণ শক্তিকে নষ্ট করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ بِهَا. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا. اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ.

অর্থ ঃ 'আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ তৈরি করেছি যাদের অন্তর আছে কিন্তু বুঝে না, চোখ আছে দেখে না এবং কান আছে, শুনে না। তারা হচ্ছে পশু কিংবা এর চাইতেও নিকৃষ্ট। তারা হচ্ছে উদাসীন।' (সূরা আরাফ-১৭৯)

এই আয়াতে কান, চোখ ও অন্তরের নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে, রোযার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এগুলো ঠিক রাখা যায়। একজন মোমিন মুসলমান রোযা রেখে কোরআন শুনবে এবং ঈমান, হেদায়াত ও কল্যাণের বাণী শিখবে। কোরআন শুনলে অন্তরে প্রশান্তি নাযিল হয় এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচা যায়। কানের খাদ্য হলো, আল্লাহর যিকির, উপকারী জ্ঞান, ভাল ওয়াজ নসীহত, সুন্দর কথা, ইসলামী কবিতা, গান ও নাটক ইত্যাদি শুনার মাধ্যমেই কানের সঠিক রোযা রাখা সম্ভব।

৭ম শিক্ষা

চোখের রোযা

চোখের রোযা আছে। আর তা হচ্ছে হারাম, অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে চোখকে ফিরিয়ে রাখা। এর বিপরীত অবস্থা হলো, ভাল ও নেক কাজের প্রতি চোখ খুলে রাখা এবং তা দেখা। আল্লাহ অনেক কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার আগে চোখ দেখে ও পরে মন প্রলুব্ধ হয়। এর ফলে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজটি করে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অ-মোহরম স্ত্রী লোকের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করলে শেষ পর্যন্ত তা অবৈধ যৌন আচরণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। অথচ এই দুটো কাজই হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

অর্থ ঃ 'হে নবী! আপনি মোমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজের চোখকে অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। হে নবী! আপনি মোমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।' (সূরা নূর-৩০-৩১)

হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দৃষ্টিদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন, "তোমার চোখ অবনত রাখ।' (মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাঊদ)।

এক নেক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন, একবার আমি আমার চোখ একটি হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করি, ফলে ৪০ বছর যাবত আমার অন্তর থেকে কোরআনকে মিটিয়ে দেয়া হয়। এটা হচ্ছে শাস্তি।

যে নিজের চোখ অবনত রাখে না কিংবা নিষিদ্ধ জিনিসের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে না সে ৪টি ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. লাগামহীন দৃষ্টির কারণে তার অন্তর প্রতিটি উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন থাকে এবং প্রতিটি ভূখণ্ডে বিক্ষিপ্ত থাকে। অন্তর শান্তি পায় না এবং মন হয় আহত ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ। চোখ হচ্ছে বিষাক্ত ছুরি। সেই ছুরির আঘাতে মন ব্যথিত, অশান্ত ও অস্থির থাকে।

২. যা চোখে দেখল, তা না পাওয়ার কারণে মন কষ্ট পায় এবং সর্বদা আফসোস, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটায়।

৩. আল্লাহর এবাদতের স্পৃহা চলে যায়, আনুগত্যের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং খারাপ কাজের প্রতি উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

৪. নিষিদ্ধ বস্তু দেখা ও ইজ্জত-আবরু লংঘনের দায়ে বিরাট গুনাহ হয়। এখানেই শেষ নয়, শেষ পর্যন্ত আরো কঠোর পাপে লিপ্ত হয়। পরকালে এই খোলা চোখের উপর শিশা ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে।

চোখ হচ্ছে উত্তম শিকারী। তাকে খোলা বা অনিয়ন্ত্রিত রাখলে সে যে কোন সময় পাপের বস্তু শিকার করবে এবং অন্তর ও ঈমানকে নষ্ট করে দেবে।

অপরদিকে, চোখ অবনত রাখলে এবং নিষিদ্ধ জিনিসের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলে ৫টি উপকার হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. চোখ আল্লাহর নেয়ামত। একে অবনত রাখলে তাঁর আনুগত্য হয়। আল্লাহর আনুগত্য বিরাট নেক কাজ।

২. মন নিরাপদ থাকে এবং যে কোন সময় অন্যায় কাজে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মনে বিরাজ করে শান্তি ও স্থিতি।

৩. ফেতনা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বিপদ থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায় এবং গুনাহ থেকে বাঁচা যায়।

৪. তাকওয়ার অনুসরণের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর অন্তরে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নেক কাজের তাওফীক সৃষ্টি হয়।

৫. মোমিনের অন্তরে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সত্যবাদীদের মনে নূর বা আলো সৃষ্টি হয়। এটা চোখ বন্ধ রাখার করণেই আল্লাহ দান করে থাকেন। যারা চোখ খোলা রাখে তাদের ঈমানী অন্তর মরে যায় এবং সে অন্তরে পাপের আগাছা-পরগাছা জন্মে।

রমযান হচ্ছে চোখের প্রশিক্ষণের মাস। এই মাসে চোখকে ঠিক রাখতে পারলে তা মোমিনের পরবর্তী মাসসমূহে দিশারী হিসাবে কাজ করবে। উল্টো দিকে, কেউ পানাহার থেকে বিরত থেকে চোখ খোলা রেখে হারাম জিনিস উপভোগ করলে রোযার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। তাই চোখের রোযার প্রয়োজনও অনেক বেশী।

৮ম শিক্ষা

রোযা রাখুন, সুস্থ থাকুন ঃ রমযান ও স্বাস্থ্য

রমযানের ফরজ রোযা ছাড়াও আরো রোযা আছে। যেমন, মান্নতের ওয়াজিব রোযা এবং সুন্নত ও নফল রোযা। রোযা রাখলে ক্ষুধা-পিপাসার কারণে শারীরিক কষ্ট হয়। এ কষ্টের বিনিময় আছে। রোযার লক্ষ্য হলো, আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এতো গেল রোযার পরলৌকিক কল্যাণ। রোযার জাগতিক কল্যাণও অপরিসীম। এর মধ্যে সুস্বাস্থ্য লাভ অন্যতম দিক। রোযা ও স্বাস্থ্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রোযার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপকার হয় এবং বহু রোগ-ব্যধির প্রতিরোধক ও আরোগ্যমূলক চিকিৎসা লাভ করা যায়। আজকের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে। কিন্তু ১৪০০ বছর আগে রোযার এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যার চিন্তাও করা সম্ভব ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃতির বহু আগে রোযা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে চালু হয়েছে। তাহলে এটা কিসের প্রমান দেয় ? ইসলাম যে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, এটাই তার প্রমাণ।

এ পর্যন্ত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রোযার মাধ্যমে ২১ প্রকার রোগের চিকিৎসা লাভ করা যায়। আমরা এ অধ্যায়ে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যাতে করে সকলেই রোযার পারলৌকিক সাফল্যের সাথে জাগতিক সাফল্য সম্পর্কেও জেনে উপকৃত হতে পারেন। প্রবাদ আছে, 'বিধির-বিধান মানুষের কল্যাণ।' রোযা একটি কষ্টকর এবাদত হলেও তাতে কল্যাণ রয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ صُوْمُوْا تَصِحُّوْا 'রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে।' (মোসনাদে আহমদ, তাবরানী, আবু নায়ী'ম)

এটি একটি ছোট হাদীস। এর কাছে আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান নতি স্বীকার করেছে। কেননা রোযা সুখ ও স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার হিসেবে প্রমাণিত। এ হাদীসে রোযাকে সুস্বাস্থ্যের কারণ বলা হয়েছে। যারা রোযা রাখে না, তারা রোযার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের ফায়দা পায় না। রোযার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ২১টি রোগের প্রতিকারের রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে। জার্মানীর এক স্বাস্থ্য ক্লিনিকের গেইটে লেখা আছে 'রোযা রাখো, স্বাস্থ্যবান হবে।' এর নিচে লেখা আছে 'মোহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ।' খৃষ্টান

জার্মানীসহ অন্যান্য খৃস্টান চিকিৎসকেরাও রোযার উপকারিতার বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেছেন। বিশ্বের অনেক দেশে রোযার মাধ্যমে “চিকিৎসা ক্লিনিক” খোলা হয়েছে। এর মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ হল জার্মানীর ডঃ হেজিগ ব্রাহমার ক্লিনিক, ডঃ ব্রাশরাবজ ও ডঃ ওয়ালারের ক্লিনিক।[১]

রোযা কম খাওয়ার ট্রেনিং। কিন্তু রোযা ছাড়াও ইসলাম কম খাওয়াকে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ‘পেট ভর্তি করে খাওয়া অপেক্ষা মানুষের জন্য মন্দ দ্বিতীয় কোন কাজ নেই। আদম সন্তানের টিকে থাকার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। যদি তা না করে (অর্থাৎ বেশী খেতে চায়) তাহলে, পেটের এক তৃতীয় অংশ খাবার, এক তৃতীয় অংশ পানি এবং অপর তৃতীয় অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখা দরকার।’ (আহমদ, ইবনে, মাজাহ, হাকেম)।

সীরাতে হালাবীয়াতে বর্ণিত, মিসর সম্রাট মুকাউকাস মুসলমানদের চিকিৎসার জন্য এক জন চিকিৎসক পাঠান। নবী (সা) এই বলে চিকিৎসককে ফেরত পাঠান, (কেউ কেউ বলেন, এটা কোন সাহাবী বা তাবেঈর বক্তব্য) ঃ

نَحْنُ قَوْمٌ لاَ نَأْكُلُ حَتّٰى نَجُوْعَ وَاِذَا اَكَلْنَا فَلاَ نَشْبَعُ.

‘আমরা এমন এক জাতি, যারা ক্ষুধা না লাগলে খাই না, আর খেলেও ক্ষুধা বাকী থাকতে খাওয়া ত্যাগ করি। তাই আমাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই।’ এ বর্ণনা থেকে দেখা যায়, বাঁচার জন্য যেমন খাবার দরকার, আবার বেশী খাদ্য রোগের ভাণ্ডার।

মানুষ সাধারণতঃ ১২/১৪ ঘণ্টা খাদ্য থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে তেমন কোন কষ্ট ও দুর্বলতা অনুভব করে না। এ সময় টুকু রাত্রের ঘুমের সমপরিমাণ। রাত্রের ৭/৮ টায় এশার সময় খেলে পরের দিন সকাল ৭/৮টায় নাস্তা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সময় না খেয়েই কেটে যায়। রোযার মধ্যে সময় আরো ২/১ ঘণ্টা বেশী যোগ হয় ফলে, সেটা স্বাভাবিক। শরীরে যে পরিমাণ ক্যালরি মওজুদ থাকে তা ১২/১৬ ঘন্টা পর্যন্ত যথেষ্ট।

রোযা রাখলে এবং খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ চলে। ১. গ্লাইকোজেন ঃ শরীরের ভেতরে পুঞ্জীভূত স্নেহ এবং ধমনীতে মওজুদ চর্বিকে কাজে লাগায়। ফলে, প্রথমে পুঞ্জীভূত গ্লাইকোজেনের মওজুদে প্রভাব পড়ে। এটা শেষ হলে পুঞ্জীভূত স্নেহের প্রভাব পড়ে। ২. শরীরের ভেতরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সক্রিভাবে সুপ্ত রোগ গুলোর চিকিৎসা শুরু করে।

---

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৮, রিয়াদ, সৌদী আরব।

রোযার ফলে কি কি রোগের চিকিৎসা হয় এবং কিভাবে একজন মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে, আমরা এ বিষয়ে উল্লেখিত হাদীসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করবো।

প্রতিবছর বিরতিহীন ভাবে একমাস রোযা রাখলে মানব শরীরের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। রোযা শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বিরাট।

১. জৈব বিষ (Toxin) ধ্বংস হয় ঃ সারা বছর দেহের ভেতরে যে জৈব বিষ জমা হয়, রোযার দাবদাহে তা জ্বলে যায় এবং রক্ত বিশুদ্ধ হয়। শরীরে জৈব বিষ বেশী থাকা ক্ষতিকর। জৈব বিষের কারণে বিভিন্ন রোগ-শোক দেখা দেয়।

২. শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ঃ মিসরের জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রের প্রাণ রসায়নের শিক্ষক ডঃ আবদুল বাসেত মোহাম্মাদ সাইয়েদ বলেন, যারা ভাবেন যে, রোযা রাখলে শরীর দুর্বল হয় এবং তাদের নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করা জরুরী, এটি একটি ভুল ধারণা।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, রোযা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে শরীরে বহু রোগ হতে পারে না। প্রতিরোধ ক্ষমতা আলফা-১, আলফা-২, বিটা-২ ও গামা নামক প্রোটিন থেকে সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে, রোযার ফলে এ প্রোটিনগুলো বৃদ্ধি পায়। ২৭শে রমযান এগুলো চূড়ান্ত সীমায় পৌছে, তা থেকে নীচে নামে না, বরং স্থায়ী হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্বিতীয় সেলটিও চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায়, যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ এবং ক্যান্সার সেলকে প্রতিহত করে। এছাড়াও এর ফলে আরেকটি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সেটি হলো রক্তের শ্বেত কনিকা। তিনি বলেন, রোযার ফলে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা ৩-৫ গুণ বাড়ে।[১]

ডঃ আবদুল বাসেত আরো বলেন, দ্বীনি ও ধর্মীয় আবেগ বাদ দিয়ে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাকাই, তাহলে রোযা ছাড়া আর কোন উপায়ে সার্বিক ও আংশিক প্রতিরোধ কিংবা প্রোটিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না। এমনকি প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক ওষুধ দিয়ে এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু তা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবস্থার মতো নয়।

৩. ওজন ও মেদ-ভুঁড়ি কমে এবং এযেইমার্স (ALZHEIMER'S) রোগ থেকে বাঁচা যায় ঃ এক সপ্তাহ রোযা রাখলে ২/১ কেজি ওজন কমে। রোযার মাধ্যমে শরীরের মেদ-ভুঁড়ি কমানোর বিষয়টি শুধু ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপেও স্বীকৃত সত্য। যেখানে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর

---

১. সাপ্তাহিক আদদাওয়াহ-২১শে নভেম্বর- ২০০২, রিয়াদ।

জন্য রোগীকে উপবাস রাখা হয়। বিশ্বব্যাপী এটা জানা কথা যে, বছরে শরীরে ৫০ হাজার কিলো ক্যালরী জমা হয় যা স্নেহ বা চর্বি আকারে বিদ্যামান থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর ক্যাম ফোর্ড 'সাইন্স কল ফর ফাষ্টিং' গ্রন্থে লিখেছেন, চিকিৎসকদের মতে, রোযা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, শরীরের পরিপাক ও হজম প্রক্রিয়ায় এবং শারীরিক সুস্থতা বিধানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমরা সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার মধ্যে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যসমূহ শরীরে সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্রান্ত হতে শোষিত হয়ে গ্লুকোজ আকারে পোর্টালোশিয়া দিয়ে কলিজার মধ্যে প্রবাহিত হয়। উল্লেখ্য যে, গ্লুকোজই শরীরে তাপ ও শক্তি যোগায়।

আমাদের দেহে যতটা গ্লুকোজ তৈরি হয় তার সবটাই প্রতিদিন খরচ হয় না। কলিজা হতে কিছু গ্লুকোজ রক্তে প্রবাহিত হয়ে দেহের চালিকা শক্তিকে কর্মক্ষম রাখে। বাকী অংশ গ্লাইকোজেনরূপে কলিজা ও মাংশপেশীতে জমা হয়। কিছু অংশ অবশ্য চর্বি জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়ে দুই কিডনী, হৃদযন্ত্র Artery এবং চামড়ার নীচে ও দেহের অন্য স্থানে জমা থাকে। এ সঞ্চিত গ্লুকোজ ও চর্বি জাতীয় পদার্থ উপবাসের সময় পুনরায় গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়। দেহে সেই রূপান্তরিত গ্লুকোজের তাপ ও শক্তি উৎপাদনে ক্ষমতা দ্বিগুণ।

রোযা পালনের ফলে গ্লাইকোজেন ও চর্বি প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ হতে থাকে। ফলে দেহের সবলতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, চর্বি জমতে পারে না এবং মেদ কমে যায়। শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, রমযান মাসে প্রথম ২/৩ দিন রোযাদার শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করলেও পরবর্তীতে সে বেশ স্বাভাবিক ও সবল বোধ করে। এমনকি প্রতিদিন দুপুরের দিকে রোযাদার কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও বিকেলের দিকে বেশ সুস্থতা বোধ করে। কারণ, সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ যথা সময়ে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে।[১]

চর্বি জমে মেদ বাড়লে মানুষ মোটা হয়ে যায়। এ কারণে এযেইমার্স রোগ হয়। এযেইমার্স রোগে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলে। কোরআন আমাদেরকে এযেইমার্স রোগের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে বলেছে ঃ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَىْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا.

'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানতো সে জানা বিষয় সম্পর্কে তাদের আর জ্ঞান থাকে না।' (সূরা নহল-৭০)

---

১. সৌজন্যে– মাসিক মদীনা, নভেম্বর-২০০৩, ঢাকা।

বিজ্ঞান বলে, মানুষের শরীরের প্রতিটি সেল প্রতি ৭ বছর অন্তর নবায়ন হয়, কিন্তু মস্তিষ্কের সেল এর ব্যতিক্রম। কেননা, এর দু'টো অংশ রয়েছে। একটি চিন্তা করে এবং দ্বিতীয়টি তথ্য জমা করে। যদি এগুলোর নবায়ন হয় তাহলে মানুষ অতীত বিহীন হয়ে যাবে। প্রতি ৭ বছরে মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, হাড়-হাড্ডি সব কিছুর নবায়ন হয়। প্রতি মিনিটে শরীরের ২.৫ মিলিয়ন লাল রক্ত কণিকা মরে যায় এবং এর পরিবর্তে নূতন রক্ত কণিকা জন্ম নেয়। মূল কথা, প্রতি ৭ বছরে মানুষ নূতন করে আরেকটি মানুষ হয়।

ইউরোপে শরীরের ভেতরে পুঞ্জিভূত ৫০ হাজার কিলোক্যালরী কমানোর জন্য ৩০ দিন গড়ে ১২ ঘণ্টা করে রোযার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। যারা কেবল সবজি খায়, তাদের শরীরে এই ক্যালরী অনেক কম। আমেরিকা ও ইউরোপে এই সমস্যা প্রকট। মুসলিম দেশগুলোতে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান নাই। তবে শরীরের স্নেহ ও চর্বি কমানোর জন্য ইউরোপে উপরোক্ত চিকিৎসার পাশাপাশি দৈনিক এক ঘন্টা হাঁটার পরামর্শ দেয়া হয়। আল্লাহ কোরআন মজীদে মানুষকে হাঁটার কথাও বলেছেন। তিনি বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِه.

অর্থ ঃ 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার চতুর্দিকে হাঁট ও চলাফেরা কর এবং তাঁর দেয়া রিজিক খাও।' (সূরা মুলক-১৫)

এই সূরায় হাটাহাটি করার কথা বলা হয়েছে। অলস ও ধনী লোকেরা হাঁটে না। যারা হাড়-হাড্ডির দুর্বলতাজনিত রোগে আক্রান্ত তারা হলো অলস লোক। আরাম বাড়ার সাথে সাথে তাদের অলসতা বেড়ে যায়।

অর্ধ সাপ্তাহিক রোযা ও আইয়ামে বীদের রোযার তাৎপর্য

রমযানের রোযা ছাড়াও নবী করিম (সা) প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, 'এ দু'দিন আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। সে জন্য আমি চাই যে, রোযা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।'

এ ছাড়াও তিনি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখে, পিপাসার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাকে পানি পান করানো আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যাবে।'

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পূর্ণিমার সময় চাঁদ যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন নদী ও সাগরে জোয়ার-ভাটা দেখা দেয়। সাগরের এই জোয়ার-ভাটার সাথে শুধু মানুষ নয়, বরং সকল জীবিত প্রাণীর জীবনের সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
'আমরা পানি দ্বারা সকল জিনিসকে জীবিত রেখেছি।' (সূরা আম্বিয়া-৩০)

জোয়ার-ভাটার সময় মানুষের শরীরও প্রভাবিত হয়। কেননা, মানুষের গঠন প্রক্রিয়ায় ৫০-৬০ ভাগ পানি। তাই নবী করিম (সা) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সেই প্রভাবকে কাটিয়ে তোলার জন্য রোযা রাখতেন।

প্রতি সপ্তাহে ২ দিন এবং মাসের মাঝখানে ৩ দিন করে রোযা রাখলে ৪ সপ্তাহে ৮ দিন এবং আরো ৩ দিন অর্থাৎ মাসে গড়ে ১০-১১টি রোযা হয়। রমযান ছাড়াও অন্য মাসের এক তৃতীয়াংশ রোযা রাখার এ বিধান যে কত বিজ্ঞান সম্মত, সেটা আল্লাহর রাসূল হিসেবে মহানবী (সা) যথার্থই জানতেন। সোবহানআল্লাহ! কেউ প্রতি মাসে ১০টি রোযা রাখলে বহু রোগ থেকে বেঁচে যাবে।

৪. রোযার ফলে হজম ও পরিপাক যন্ত্রগুলো বিশ্রাম লাভ করে পতিত জমির মতো নূতন শক্তি অর্জন করে ঃ এর ফলে রোযাদার ব্যক্তি পেটের পীড়া, অজীর্ণ ও বদহজমীসহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পায়। রোযার মাধ্যমে কলিজায় পুঞ্জিভূত চর্বিগুলো ব্যবহারের ফলে তা কমতে থাকে। চর্বি বেশী থাকলে হজম দেরীতে হয়, ২ ঘন্টার টা ৪ ঘন্টায় হজম হয়। তখন ব্যক্তি নিজেকে ভারী মনে করে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।

রোযা কলিজার পাশে জড় হওয়া চর্বিগুলোকে উজাড় করে দেয় এবং হজম ও পরিপাক ক্রিয়া দ্রুত করে। রোযা রাখলে মাথায় চক্কর দেয়া কিংবা দিনে ঘুমের প্রকোপ বেশী হয় বলে যারা মনে করেন, সেটা ভুল। কেননা, রোযার মধ্যে দিনে খাদ্য গ্রহণ না করলেও শরীরের ভেতর মওজুদ খাদ্য ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

রোযার মধ্যে যা বন্ধ থাকে তা হলো, হজম ও চুষে নেয়ার প্রক্রিয়া। ফলে শরীরের পুঞ্জিভূত চর্বি ও অতিরিক্ত ৫০ হাজার কিলো ক্যালরীর ব্যবহার হয় এবং তা থেকে শরীর মুক্ত হয়। অনেকে রোযার অজুহাতে কাজ করতে চায় না। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আমরা যদি শেষ রাতে ৪ টার দিকে সেহরী খাই, তাহলে হজম ও চুষে নেয়ার প্রক্রিয়া ৬ ঘন্টা ব্যাপী অব্যাহত থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে ৮ ঘন্টা সময়ও লাগতে পারে। এরপর রোযাদার সেহরী থেকে চুষে নেয়া ক্যালরীর উপর আরো ৪/৫ ঘন্টা নির্ভর করতে পারে। দুপুর ২টার পর থেকে শরীরের মধ্যে পুঞ্জিভূত ক্যালরীর ব্যবহার শুরু হয়। ফলে শরীরের খাদ্য ক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

যারা কাজ করে না তাদের খাদ্য দেরীতে হজম হয়। ফলে সে রোযার আকাংখিত

দৈহিক ফলাফল লাভ করতে পারে না। বরং রোযার মধ্যে কাজ আরো বেশী করতে হবে। তাই তো দেখা যায়, ইসলামের বড় বড় জিহাদগুলো যেমন বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় রমযান মাসেই সংঘঠিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রেখে যুদ্ধ করেছেন। তারা তো দুর্বল হননি। বরং আরো শক্তি লাভ করেছেন।

৫. রোযা কিডনীতে পাথর সৃষ্টিতে বাধা দেয় ঃ রোযার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে তা ক্যালসিয়ামকে জমতে বাধা দেয়। ক্যালসিয়াম জমেই পাথর সৃষ্টি হয়। কিডনীর পাথর সর্বদা প্রোটিনের কণাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রমযানের দিনে তা গঠিত হতে পারে না। রোযার কারণে কিডনী তার দায়িত্ব ভাল ও সুসংগঠিত ভাবে পালন করে। রোযার মাধ্যমে কিডনীর Infection ভাল হয়। মূল কথা হলো, রোযা সারা বছরে বিভিন্ন সেলে জমে থাকা জৈব বিষ দূর করে। সারা বছর শরীরও তা দূর করার প্রক্রিয়া অব্যহত রাখে এবং তারই অংশ হিসেবে চামড়ার নীচে জমা রাখে। কলিজা সে জৈবিক বিষ দূর করে সাধ্যমত শরীরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা চালায়। ঘাম এবং পেশাব-পায়খানাসহ বিভিন্ন উপায়ে তা শরীর থেকে বের হয়। রোযাও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তাই করে।

৬. চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ঃ রোযার কারণে দিনে শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায়। ফলে, চামড়াতেও পানির অংশ কম থাকে। এর ফলে চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যাদের মুখে ব্রণ উঠে, রোযার কারণে তা সেরে যায়। ডঃ রবার্টের মতে, রোযা সে সকল মাইক্রোব ধ্বংস করে যা বিভিন্ন সেলকে আক্রমন করে। ফলে তা নূতন করে গঠিত হয়।

চিকিৎসা বিশ্বকোষে 'খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা' অধ্যায়ে আছে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বলা হয় যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন, মাসে এক সপ্তাহ এবং বছরে এক মাস রোযা রাখা উত্তম। চিকিৎসা ও সার্জারীতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ আলেকসিস কারিল, তার 'মানুষ ঃ অজ্ঞাত' নামক বইতে লিখেছেন, অধিক খাদ্য গ্রহণ মানব জাতির অস্তিত্বের ধ্বংসের একটি বড় কারণ। মানুষের শরীরের গঠন হলো কম খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। ভোজন কমানোর জন্য অতীত ইতিহাসে লোকেরা উপবাস থাকত। দুর্ভিক্ষ না থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের উপর কম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে।[১]

৭. বাত রোগের চিকিৎসা ঃ আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ ম্যাক ভাডন বলেন,[২] রোযার কারণে বাত রোগের আরোগ্য হয়। অন্যান্যদের মতে, শরীরের

---

১. সাপ্তাহিক আদ্-দাওয়াহ, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯৮, রিয়াদ, সৌদি আরব। ২. প্রাগুক্ত।

বিভিন্ন জোড়ার সংক্রামক রোগেরও আরোগ্য হয়। কলিজার Infectionও সেরে যায়। পাকিস্তানের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনেরও এই একই মত।

৮. রক্তে কোলেস্টেরল কমায় ঃ যাদের রক্তে চর্বির হার বেশী, এক সপ্তাহ রোযা রাখলে কোলেস্টেরল কমে আসবে। কেননা, রোযার মাধ্যমে চর্বি ক্ষয় হয় এবং শরীর থেকে চর্বি কমে গেলে রক্তেও তা কমে যায় ফলে তা হৃদরোগ ও উচ্চ রক্ত চাপের রোগের জন্য খুবই আরামপ্রদ। তবে সেহরী ও ইফতারে বেশী ও সমৃদ্ধ খাবার খেলে রক্তে কোলেস্টেরল না কমে আরো বাড়তে পারে। উচ্চ রক্ত চাপের অন্যান্য কারণও আছে। যেমন, মানসিক দুশ্চিন্তা, চাপ, পেরেশানী ইত্যাদি। কিন্তু রমযানের রূহানী ও আত্মিক নির্মল পরিবেশের কারণে সে সকল জিনিসও কমে আসে। ফলে, এ জাতীয় রোগীরা আরামে থাকে। সব কোলেস্টেরলই ক্ষতিকর নয়। প্রধানতঃ দুই প্রকারের কোলেস্টেরল আছে- (ক) উপকারী কোলেস্টেরল যেমন, HDL (high density lipoprotein) এবং (খ) ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল যেমন, LDL (Low density Lipoprotein). অতিরিক্ত LDL হৃদরোগ সৃষ্টি করে। বেশী HDL হৃদরোগ থেকে হেফাজত করে। মোটকথা, রোযার সার্বিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় মেদবহুলতা কমে যায় এবং LDL ও HDL এর সুস্থ্য ভারসাম্য বজায় থাকে।"[১]

এক মাসের সিয়াম সাধনায় লিপিড প্রোফাইল ইতিবাচক দিকে মোড় নেয়। ভাল কোলেস্টেরল অর্থাৎ HDL এর মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল অর্থাৎ LDL এর মাত্রা কমে যায়। লিপিড প্রোফাইল নেতিবাচক দিকে মোড় নিলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুকি বেড়ে যায়।

৯. রক্ত স্বল্পতা ও রক্ত শূন্যতা দূর হয় ঃ রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার অনুভূতি সৃষ্টি হলে শরীরে সঞ্চিত লৌহ জাতীয় পদার্থ নির্গত হয় এবং তা রক্তের স্বল্পতা বা রক্ত শূন্যতা পূরণ করে।

১০. কঠোর স্নায়ু ব্যথার উপশম হয় ঃ মাত্র তিন সপ্তাহ রোযা দ্বারা কঠিন স্নায়ু ব্যথার আরোগ্য হয়।

১১. ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে ঃ রোযা ডায়াবেটিস রোগের জন্য বিরাট রহমত। কম খাদ্য গ্রহণ এবং দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করায় রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে আসে। ফলে, রোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। ঔষুধ সেবনকারী রোগীদের

---

১. (Lipid and Lipid Disorders by Michael D. Feher William Richmond)

অনেকেরই ঔষুধ সেবনের দরকার হয় না। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে রোযা রেখে হাঁটলে ডায়াবেটিস আরো নিয়ন্ত্রিত থাকে।

যে সমস্ত ডায়াবেটিস রোগী Diet Control-এ সুস্থ্ আছেন তাদের জন্য রোযা এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু যে সমস্ত রোগী ট্যাবলেট ব্যবহার করেন তাদেরকে রোযা রাখার আগে ডাক্তারের পরমর্শ নিতে হবে। আর যারা ইনসুলিন ব্যবহার করেন তাদেরকেও রোযার সময় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তার তাদেরকে ইনসুলিনের ধরন ও মাত্রা ঠিক করে দেবেন। তবে ইনসুলিন নির্ভর রোগীর রোযা ঝুঁকিমুক্ত নয়।

১২. রোযা সকল Infection এবং টিউমারের জন্য প্রতিরোধক ঃ নারীদের বিভিন্ন রোগের Infection-কেও প্রতিহত করে। মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে গর্ভের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। রোযার কারণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সে কারণে আরোগ্য লাভ করা যায়।

১৩. হায়াত বাড়ে ও বার্ধক্য দেরীতে আসে ঃ ইঁদুর ও খরগোশের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, রোযা পালনকারী প্রাণীটিকে অল্প খাবার দেয়ায় সে বেশী খাবার গ্রহণকারী প্রাণীর তুলনায় তিন গুণ বেশী বয়স পেয়েছে।[১]

সম্প্রতি ৮০ বছর বয়স্ক ২৫০০ নারী-পুরুষের উপর জৈবিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সে পরীক্ষার ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এতে দেখা যায় যে, মানুষের বয়স আরো ৫০ বছর বেড়ে যেতে পারে।[২]

ইসলাম বার্ধক্যের কোন সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং বৃদ্ধের অন্তর যুবকের অন্তরের মতই সমানভাবে পেতে চায়। নবী করিম (সা) বলেন ঃ

قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فِى اِثْنَتَيْنِ، طُوْلُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ.

'বৃদ্ধের মন, বয়স বৃদ্ধি ও সম্পদের প্রাচুর্য লাভের আগ্রহের ব্যাপারে যুবক।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

لاَ زَالَ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ، حُبُّ الدُّنْيَا وَطُوْلُ الاَمَلِ.

'দুনিয়াপ্রীতি ও লম্বা আশার ব্যাপারে বয়স্কদের হৃদয় অব্যাহতভাবে যুবক।' (বোখারী)

---

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

২. সাপ্তাহিক আল-আলম ইসলামী, ৩রা নভেম্বর-২০০৩, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মোকাররমা।

১৪. পুরুষ হরমোন বৃদ্ধি পায় ঃ ১৯৮৬ সনে পুরুষ হরমোন বিষয়ক ম্যাগাজিন Archieves of Andrology-তে জেদ্দার বাদশাহ্ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও হাসপাতালে নারী রোগ, ডেলীভারী ও বন্ধাত্য দূরকরণ বিষয়ক কনসালটেন্ট ডঃ সামীর আব্বাস ও ডঃ আবদুল্লাহ বাসালামার একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারা ২১ জন রোগীর উপর গবেষণা চালান। এদের মধ্যে ১০ জনের শুক্রকীট ঘটিত সমস্যা, তিন জনের অন্ডকোষ বিলকুল শুক্রকীট শূন্য এবং ১০ জন সুস্থ্ লোক। রমযান এবং রমযানের আগে-পরে অর্থাৎ শাবান ও শাওয়ালসহ তিন মাসে তাদের রক্ত ও বীর্যের নমুনা দেওয়া হয়। তারা তাতে Testosteron, Prolactin, FSH ও LH, হরমোনের মাত্রা জানার চেষ্টা করেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, রমযান মাসে FSH এবং LH হরমোন অনেক বেড়ে গেছে। তারা স্বাভাবিক লোকদের থেকে নেয়া নমুনায় Testosteron নামক পুরুষ হরমোনের উত্তম কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন। তারা রমযান পরবর্তী শাওয়াল মাসে নারীর গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধিও দেখতে পেয়েছেন। তাদের মতে রোযা পুরুষ হরমোন গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্য আরেক গবেষণায় বলা হয়েছে, রোযার ফলে হরমোনের বাড়তি-ঘাটতি কোনটাই হয় না।

১৫. দাঁত ও মাড়ির উপকার হয় ঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ হ্যামিলটন ও তার সাথীরা ১ হাজার নারী-পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। তারা সবাই স্বেচ্ছায় সপ্তাহে একদিন উপবাস করে। ফলে, তাদের দাঁতের অবস্থার উন্নতি হয়। কেননা, খাদ্য থেকে বিরত থাকার কারণে দাঁতও বিরতি লাভ করে। সপ্তাহে একদিন দাঁতের গোড়ায় খাদ্যের অবশিষ্ট কণা না থাকায় এর ভূমিকা উন্নত হয়। এছাড়াও একদিন খাদ্য গ্রহণ না করায় পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম লাভ করে এবং স্নায়ুগুলো শীতল হয়ে আসে। ফলে, পেটের অসুখসহ মাংশ পেশীর ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়।

১৬. পেপটিক আলসার হ্রাস পায় ঃ লন্ডন থেকে লেউইস এন্ড কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ এফ. এম. গ্রিমীর লিখিত 'প্র্যাকটিস অব সার্জারী' বইতে উল্লেখ আছে যে, পাকস্থলীতে প্যারাইটাল কোষের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ কোটি। এই কোষ হতে প্রতিনিয়ত আইসাটনিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়। যে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জন্য পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডিনাল আলসার হয়, সেই এসিড সাধারণতঃ

আহারের পরপরই বেশী নির্গত হয়। অপর দিকে পাকস্থলী খালি থাকলে ঐ এসিড কম নির্গত হয়।

১৯৬৭ সালে, করাচির এক প্যাথলজি ল্যাবরেটরীতে গ্যাস্ট্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা প্রমাণীত হয়। পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেহরী খাওয়ানো হয়। তারপর তাকে ১০ ঘন্টা উপবাস রাখা হয়। গ্যাষ্ট্রিক পরীক্ষা করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রোযা অবস্থায় পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সবচাইতে কম পাওয়া যায়। সুতরাং রোযায় এসিড কমে, বাড়ে না। যারা পেপটিক আলসারের কথা বলে রোযা না রাখার বাহানা করে, তাদের সে বাহানা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

মূলতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই একথা লেখা নেই যে, পেপটিক আলসারের যতগুলো কারণ আছে, রোযা বা উপবাস তার অন্যতম। বরং পেপটিক আলসারের রোগীকে অস্ত্রোপচারের আগে উপবাস রাখা হয়।[১] Gastritis এবং IBS ইত্যাদি রোগের জন্য রোযা উপকারী।

সিলেট মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডাঃ গোলাম মুয়ায্‌যাম ১৯৬০ সালে 'মানব শরীরের উপর রোযার প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা চালান। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, রোযা দ্বারা শরীরের ওজন সামান্য হ্রাস পায় বটে, তবে তা শরীরের কোন ক্ষতি করে না, বরং তা শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোর ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা বেশী কার্যকর। তিনি আরো বলেন, রোযা রাখলে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে না। বরং এসিড কমে যায়। খাদ্য গ্রহণে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে।[২]

তবে যাদের Active peptic ulcer অথবা Bleeding peptic ulcer আছে, তাদের জন্য রোযা না রাখার শরয়ী' ওজর গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এ জাতীয় রোগী রোযা ভাংতে পারে।

১৭. তারাবীহর নামায মেরুদণ্ডের Flexibility বাড়ায় ঃ মিশরের হালওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ডঃ সালওয়া রুশদী ৬০ বছর বয়সোর্ধ নারী ও পুরুষের উপর ৪ বছর ব্যাপী প্রতি বছরে একমাস করে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, তারাবীহর নামায হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরের মাংশ পেশীকে শক্তিশালী করে। মেরুদণ্ডসহ অন্যান্য জোড়াগুলোকে নমনীয় করে এবং রক্ত প্রবাহকে অধিক ক্রিয়াশীল করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের Muscle pain ও Joint pain আছে, রমযানের পর তাদের ব্যথা অনেক কমে গেছে। তিনি বলেন, রোযা ও তারাবীহ আল্লাহর বিধান হওয়ায় তা

১. সৌজন্যে মাসিক মদীনা- নভেম্বর ২০০৩, ঢাকা। ২. প্রাগুক্ত।

পৃথিবীর অন্য কোন Physio Therapy অপেক্ষা উত্তম। তিনি বলেন, নামাযে শরীরের সকল জয়েন্ট এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট মাংশপেশীগুলো দাঁড়ানো, রুকু, সাজদা ও বসার মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। ফলে রক্ত চলাচলে ও শ্বাস গ্রহণ প্রক্রিয়ার মান বৃদ্ধি পায়। গবেষক বলেছেন, পিঠে, জয়েন্টে এবং মাংশপেশীতে যত ব্যথা বেদনাই থাকুক, প্রত্যেকের উচিত তারাবীহর নামায পড়া। রুকু ও সাজদায় গেলে মাথা ও মগজে রক্ত দ্রুত প্রবাহিত হয়। ফলে, সচেতনতা ও একাগ্রতা বাড়ে।

১৮. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ঃ ডঃ সালওয়া রুশদী তার গবেষণায় আরো বলেছেন, কেউ যদি বিভিন্ন কারণে ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয় এবং তাতে যদি মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে, পুরো এক মাস তারাবীহর নামায পড়ার পর তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। রমযান রূহানী পরিবেশ, তাহাজ্জুদের নামায ও নেক কাজের মওসুম বিধায়, বেহেশতী পরিবেশ বিরাজ করে এবং বুঝে অধিক কোরআন পড়ার কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রত্যাশিত। রোযা ইচ্ছা শক্তিকে শক্তিশালী করে যা মানসিক রোগীর চিকিৎসায় সহায়ক। পানাহারের ইচ্ছা থেকে বিরত থাকায় তা শক্তিশালী হয়। রমযান সম্পর্কে অধ্যক্ষ ডি. এফ. ফোর্ডের মত হলো, রোযা আত্মশুদ্ধি ও সংযমের অন্যতম উপায়। এর মধ্যে স্রষ্টাকে পাওয়া যায় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। হিংসা-বিদ্বেষ ও মন্দ স্বভাব হতে দূরে থাকা যায় এবং কুপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করা যায়। (সাইন্স ফর ফার্স্টি বই দ্রষ্টব্য)

১৯. যৌন রোগ থেকে বাঁচা যায় ঃ রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অর্জন করে। ফলে, তারা যেনা-ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে। যেনা-ব্যভিচারের ফলেই আজ এইডস রোগের বিশাল আক্রমণ। তাই দেখা যায়, ১০ম ও ১১শ খৃষ্টাব্দে, মুসলিম চিকিৎসকরা সিফিলিস রোগের চিকিৎসার জন্য রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর দখলের পর হাসপাতাল গুলোতে যৌন রোগের চিকিৎসার জন্য রোযার হুকুম দিয়েছিলেন। মুসলমান ডাক্তাররা বসন্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তিন সপ্তাহ রোযা রাখার কথা বলেছেন। প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা যে কোন পুরাতন রোগ থেকে মুক্তির জন্য রোযা রাখার কথা বলতেন।

২০. স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে ঃ রোযার মধ্যে দিনে ধুমপান চা ও কফির মতো উত্তেজক জিনিস সেবন না করায় স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে। ফলে, ব্যক্তির মন মেজাজ ভাল থাকে এবং গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ বেশী পায়। উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে অনেক সময় আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২১. রমযান মাসে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যার পরিমাণ হ্রাস পায় ঃ রহমত ও বরকতের মাসের আধ্যাত্মিক ফসল হিসেবে লোকেরা আত্মহত্যা করার চিন্তা করে না। এ মাসে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে কিংবা ব্রেইন ষ্ট্রোক করে মৃত্যুর হারও বাড়ে না।

যাদের রোযা রাখলে ক্ষতি হবে বলে চিকিৎসকরা বলেন, তাদের রোযা রাখা ঠিক নয়। এর ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। যেমন, যাদের উচ্চ রক্তচাপ খুব বেশী, যাদের প্রতিষ্ঠিত হৃদরোগ আছে, বাইপাস সার্জারী করা হয়েছে, কিংবা পেসমেকার সংযুক্ত আছে, তাদের রোযা না রাখাই উত্তম। তবে যাদের সহনীয় রক্তচাপ ও মেদ আছে তাদের জন্য রোযা খুবই উপকারী। ১ কেজি বাড়তি ওজন কমাতে পারলে প্রায় দেড় মিলিমিটার অফ মার্কারী Diastolic Pressure কমানো যায়।

ডাইরিয়াজনিত রোগে রোযা না রাখাই উত্তম। কেননা, এর ফলে পানি শূন্যতার মারাত্মক অসুবিধে হতে পারে। দুশ্চিন্তাজনিত মাথা ব্যথার রোগীর জন্য রোযা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। রক্তে শর্করা কমলে মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পাবে। মাগ্রেনজনিত মাথা ব্যথা হলে রোযা না রাখা উত্তম। শারীরিক ও মানসিক চাপে বেশী Catecholanine নিঃসরণে মাথা ব্যথা বাড়তে পারে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের রোযার কারণে সমস্যা হলে রোযা ভাংতে পারবে এবং পরে তারা কাযা রোযা করলেই হবে। বয়ঃবৃদ্ধের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন ফকীর মিসকীনকে দিনে দু'বেলা করে খাবার দিলেই চলবে। তাদের রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। শরীরের কোন ক্ষতি না হলে কোন বৃদ্ধ লোকও রোযা রাখতে পারবেন।

১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে রাশিয়ার চিকিৎসকরা রোযার মাধ্যমে রক্তের ক্যান্সার, চোখের অসুখ, দাঁতের মাড়ি ফুলে যাওয়া ও রক্তক্ষরণ এবং আলসারের চিকিৎসা করতেন। ১৭৬৯ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ পিটার ভেনিয়ামিনভ এক রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে অসুখের সময় রোগীদেরকে খাদ্য থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তার যুক্তি ছিল, রোযার কারণে পরিপাকতন্ত্র একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশ্রাম পায়। ফলে, সুস্থ হওয়ার পর তা ঠিকমত হজম কাজ চালাতে পারে।

এরপর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ডঃ পি. জি স্পাসকী বলেন, রোযার মাধ্যমে কালোজ্বর এবং শরীরের ভেতরের অন্যান্য পুরাতন রোগ বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভাল হতে পারে।

ইটালীর নেপল শহরের ডাঃ লোদভীক কারনারো ৮৩ বছর বয়সে নিজে রোযা রেখে রোযার উপকারীতার উপর এক গবেষণায় বলেছেন, হে অসহায় ইটালী, তুমি কি দেখ না, তোমার দেশের নাগরিকরা খাওয়ার চাহিদা ও আগ্রহ পুরা করতে গিয়ে অন্য যে কোন সংক্রামক রোগ কিংবা যুদ্ধ অপেক্ষা আরো বেশী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ? বেশী খাদ্য গ্রহণ মারাত্মক যুদ্ধের ফলাফল অপেক্ষাও বেশী ধ্বংসাত্মক। শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন এবং উপযোগী ততটুকুর বেশী খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। আমরা বেশী ভোজনে আনন্দ লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত এর বিরাট মূল্য আদায় করতে হবে। কোন কোন সময় সে মূল্য মৃত্যুও হতে পারে।

বৃটিশ ডাঃ তাশিন (১৬৭১-১৭৪৩) বলেন, প্রোটেস্ট্যন্ট খৃস্টানরা বেশী ভোজন করে। তিনি রোযার মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, যেসব ডাক্তাররা রোগীকে অধিক খাদ্য গ্রহণের কুফলের বিরুদ্ধে সতর্ক করে না তাদেরকে কি সমাজ এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে না ?

জার্মানীর ডাক্তার ফেডারিক হভম্যান (১৬৬০-১৭২৪) বলেন, রোযার মাধ্যমে মৃগীরোগ ও আলসারের চিকিৎসা করা যায়।

রোযার উপকারিতা যারা ডাক্তার নয় তারাও বুঝতে পারে। বিশেষ করে পেটের অসুখ, অজীর্ণ, বদহজমী ও গ্যাস্ট্রিকের রোগীরাতো পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারে।

আমরা দেখেছি, ভারতের নেহেরু গান্ধী গোটা জীবন রোযায় অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে বলেন, রোযার মাধ্যমে আত্মসংযম বাড়ে এবং মানবাত্মা পবিত্রতা অর্জন করে।

ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী মাইকেল এংলো ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ৯০ বছর বয়স পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্মক্ষম ও কর্মঠ ছিলেন। তাকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমি বহু আগ থেকেই মাঝে মাঝে রোযা রেখে আসছি। আমি প্রত্যেক বছর ১ মাস, প্রত্যেক মাসে ১ সপ্তাহ রোযা রাখছি এবং দিনে তিন বেলার পরিবর্তে দু'বেলা খাবার খাই।

আমেরিকার চিন্তাবিদ গ্রেগরি ইউনিভার্সিটি কলেজ ও ক্লাবে এবং টেলিভিশনে তার শ্রোতাদেরকে বলেন, রোযার মাধ্যমে শরীরের পবিত্রতা অর্জন হয় এবং শরীরের ক্ষতিকর জিনিসগুলো দূর হয়।

মস্কোর মানসিক রোগ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ডঃ নিকোলাইড বিগত ৫০ বছরে মাসে মাসে রোযা রাখতেন। তাকে বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্পর্কে

প্রশ্ন করা হয় যে, মঙ্গোলিয়ায় ডাইনোসরের ডিম প্রাপ্তি, সৌরশক্তির মাধ্যমে ঘড়ি চালানো, টেলিভিশন, পরমাণু শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ? তিনি উত্তরে বলেন, সেটা হলো রোযার মাধ্যমে বয়স্ক লোকদেরকে যুবকের শারীরিক বুদ্ধি-বিবেক ও আত্মিক শক্তি ফিরিয়ে দেয়া এবং বার্ধক্যের উপকরণগুলোকে বাধাগ্রস্থ করা। আমি ৮৫ বছর বয়সেও নিজ মাথার উপর সহজে দাঁড়াতে পারি, আমার চাইতে কম বয়সের লোকেরাও এ কঠিন ব্যায়ামে অপারগ।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের রোথাকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক উইলিয়াম এম বলেন, আমি বহু বছর যাবত মাসে মাসে রোযা রাখি, যদিও আমার বয়স বেশী হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার জীবনের সোনালী দিনগুলো নষ্ট হয়নি। আমি খুবই সুস্থ্ জীবন-যাপন করছি।

কলাম্বিয়ার সাংবাদিক স্কুলের টার্ন ব্রাঞ্জ বলেন, রোযায় শারীরিক ফায়দা অপেক্ষা আত্মিক ফায়দা বেশী। আমি যদিও শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য রোযা রাখি, কিন্তু আমি দেখি যে, রোযা আমার চিন্তার জন্য উপকারী। আমি নতুন নতুন চিন্তা করতে পারি কোন জিনিসকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

চিকিৎসা বিষয়ক রোযার উপর গবেষণাকারী মার্কিন চিকিৎসক ডঃ এলানকোর্ট বলেন, মস্কোর মানসিক রোগ চিকিৎসক ইনস্টিটিউটের রোযা ইউনিটের পরিচালক ইউরি নিকোলায়েভ বলেছেন, শহরে গাড়ীর ধূঁয়া ও কল-কারখানার বাষ্প ও ধূঁয়ার পরিবেশ দূষণে বসবাসকারীদের জন্য রোযা খুবই মৌলিক চিকিৎসা। ডঃ এলানকোট এবং তার অন্য ডাক্তার সঙ্গী কন্টিকাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মারশাল মন্ডেল এবং তার মেসাসুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উইলিয়াম বিলপোট শিশুদেরকে মস্তিষ্ক বিষয়ক এলার্জির জন্য রোযার মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। শরীরের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বাঁচানোর জন্য তারা ঐ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।[১]

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ রোযার উপর গবেষণার সংখ্যা খুবই কম। মুসলিম ডাক্তারদেরকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং আল্লাহর বিধান যে বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের জন্য উপকারী তা প্রমাণ করে দিতে হবে।

---

১. সাপ্তাহিক আল আলম ইসলামী, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা, ১০ই নভেম্বর ২০০৩।

৯ম শিক্ষা

রমযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস

আল্লাহ মোমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ 'তোমাদের জন্য রাসূলের (সা) চরিত্রে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব ঃ ২১)

রমযানে রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা করেছেন, আমাদেরও তাই করা উচিত। এতে করেই উত্তম চরিত্রের আদর্শ আমাদের রোযাকে আলোকিত করবে। কেননা, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমাকে উন্নত চারিত্রিক গুণের পরিপূর্ণতার জন্য পাঠানো হয়েছে।'

তিনি রমযানে বেশী বেশী ও বহুমুখী এবাদত করতেন। রমযানে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোরআন শিক্ষা দিতেন। এরপর তিনি খুব বেশী দান করতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের মধ্যে সর্বাধিক দাতা ছিলেন। কিন্তু রমযানে যখন জিবরীল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কোরআন শিক্ষা দেন, তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে উঠেন। জিবরীল (আ) রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। জিবরীলের সাথে সাক্ষাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবাহমান বাতাসের মতো দানশীল হয়ে উঠতেন।' (আহমদ)

এই মাসে তিনি সর্বাধিক কোরআন অধ্যয়ন করতেন। স্বয়ং জিবরীল (আ) তাঁকে প্রত্যেক রাতে কোরআন শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও তিনি তারাবী ও তাহাজ্জুদে বেশী পরিমাণে আয়াত ও সূরা পাঠ করতেন। লোকদেরকেও কোরআনের সূরা ও বিভিন্ন অংশ শিক্ষা দিতেন। লোকদেরকে দিয়ে ওহী লেখানোর সময়ও তাঁকে কোরআন পড়তে হতো। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন নামায ও নফল নামাযে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এমনিতেও কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সেটা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য না বুঝে কোনদিন কোরআন তেলাওয়াত করেননি। তেলাওয়াত মানে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পড়া। সকল সাহাবায়ে কেরাম বুঝে-শুনেই কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত বুঝে-শুনে কোরআন তেলাওয়াত

করা, শুধু Reading নয়। সেজন্য মাতৃভাষাসহ বোধগম্য ভাষায় কোরআনের তাফসীর পড়া উচিত।

তিনি রমযানে এমন কিছু অতিরিক্ত এবাদত করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। তিনি কখনও বিনা বিরতিতে এবং ইফতার ও সেহরী ছাড়াই রোযা রাখতেন। এটাকে বিরতিহীন রোযা বলা হয়। দিন ও রাত্রে এবাদতের জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করার উদ্দেশ্যেই তিনি অবিরাম রোযা রাখতেন। তবে তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ নিজ উম্মাতকে বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, আপনি বিরতিহীন রোযা রাখেন অথচ আমাদেরকে নিষেধ করেন কেন ? তিনি জওয়াবে বলেন, আমি তোমাদের মতো নই। আমি আমার আল্লাহর কাছে রাত যাপন করি, তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (বোখারী, মুসলিম, মোওয়াত্তা)

বিরতিহীন রোযার মধ্যে আল্লাহ নিজ নবীকে সুক্ষ্মজ্ঞান, প্রজ্ঞা, নবুওয়াতের নূর ও রহমত-বরকত দান করেন। এখানে আল্লাহ্ কর্তৃক খাওয়ানো ও পান করানোর অর্থ এই। কেননা আল্লাহ্ নবীকে যে শক্তি-সামর্থ দান করেছেন, তা আর কাউকে করেননি। তাই অন্যদের পক্ষে বিরতিহীন রোযা রাখাও সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, নামায আমার চোখের শীতলতা। তিনি নামাযে আল্লাহর নেয়ামত ও বরকতের মধ্যে ডুবে থাকতেন । ফলে, তিনি এই পার্থিব জগতের খানা ও পান করার কথা ভুলে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের রাতকে নামাযসহ অন্যান্য এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করতেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক জিকির ও এবাদতকারী। রাত্রে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা, দয়া, রহমত ও বরকত কামনা করতেন, মুনাজাত করতেন, কান্নাকাটি করতেন, কল্যাণ হেদায়াত ও বিজয়ের জন্য দোয়া করতেন। নামাযে সুদীর্ঘ কেরাত পাঠ করতেন এবং রুকু-সেজদাহ অত্যধিক দীর্ঘ করতেন। নির্ধারিত এবাদতকে পর্যাপ্ত মনে করতেন না। তাই বেশী বেশী এবাদতের এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

অর্থঃ 'আর রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়, এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত করণীয়। তোমার রব তোমাকে সম্মানিত মর্যাদায় পৌঁছাতে পারেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৯)

তাহাজ্জুদ ছাড়াও তিনি রমযানে তারাবীর নামায অতিরিক্ত পড়তেন। এভাবে, বলতে গেলে গোটা রাত্রিই নামাযে কেটে যেত। সাথে অন্যান্য এবাদত তো আছেই।

দিনে তাঁর ব্যস্ততা ছিল অন্য রকম। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহত, শিক্ষাদান ও ফতোয়ার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। লোকদেরকে সৎ উপদেশ দেয়া এবং তাদের পরিশুদ্ধির জন্য সময় ব্যয় করতেন।

এছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য জিহাদ ছিল তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজে তাঁর ও সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশ সময়, শক্তি ও সম্পদ ব্যয় হতো। এই ক্ষেত্রে তাঁদের কোরবানী ছিল সর্বাধিক। আজ যারা জিহাদ বিমুখ তারা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের এক বিরাট অংশকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি চাঁদ দেখার নিশ্চিত খবরের উপর ভিত্তি করে রোযা রাখতেন। বেলা ডুবার সাথে সাথে দ্রুত ইফতার করতেন এবং ভোররাত্রে সর্বশেষ সময়ে সেহরী খেতেন। সেহরীর সময় গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থ ঃ 'তারা ভোর রাত্রে গুনাহ মাফ চায়।' (সূরা জারিয়াত-১৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) শুকনা পাকা খেজুর কিংবা গাছপাকা তাজা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করতেন। যেহেতু ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয় তাই তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য ইফতারের সময় দোয়া করতেন। রমযানে দূরবর্তী স্থানে সফর করলে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন। কেননা, মুসাফিরের জন্য রোযা ভাঙ্গা জয়েয আছে।

'তিনি সাহাবায়ে কেরামকেও শক্তি অর্জনের জন্য রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিতেন।' (মুসলিম, আবূ দাউদ)

'তিনি নিজে দুই রমযানে রোযা ভেঙ্গেছেন।' (তিরমিযী, আহমদ)

'রাসূলুল্লাহ (সা) সোবহে সাদিকের পর ফরয গোসল করে রোযা রাখতেন।'[১]

অবশ্য সোবহে সাদিকের আগেই তিনি সেহরী খেয়ে নিতেন। সোবহে সাদিকের পর খানা নিষেধ, ফরয গোসল নিষেধ নয়।

তিনি রমযানে রোযা অবস্থায় কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

তিনি বলেছেন 'ভুলে কেউ খেলে বা পান করলে রোযা ভাঙ্গে না। কেননা, আল্লাহই তাকে খাওয়ান ও পান করান।' (হাদীসের বিশুদ্ধ ৫টি গ্রন্থ, নাসাঈ ছাড়া)

---

১. বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। মোওয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত আছে।

'রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

এতেকাফে তিনি নিজের অন্তর আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করতেন এবং আল্লাহর কুদরতের জগতে বিচরণ করতেন। লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কমিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সাথে একাগ্রচিত্তে সান্নিধ্য কামনা করতেন। দুনিয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে পরকালের চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকতেন। তিনি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিশেষ করে অধ্যয়ন করতেন এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।

এছাড়াও হাদীসে আরও বিভিন্ন কল্যাণকর কজের কথা উল্লেখ আছে যা তিনি রমযান মাসে করতেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ রমযানসহ সকল কাজে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত, রমযানে তাঁকে অনুসরণ করা।

ঈদের দিন গরীব-দুঃখীর খুশী নিশ্চিত করার জন্য তিনি যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। এতে করে নিজ খুশীর মুহূর্তে অন্যের খুশীর কথাও তিনি মনে রাখতেন। আমরাও যেন ঈদের দিন দুঃখী-গরীব মানুষের প্রতি নজর দেই।

রমযানে রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকার

রমযান মাস সওয়াব ও কল্যাণের মাস। তাই এ মাসে বেশী বেশী এবাদত করতে হবে। প্রখ্যাত সাহাবী আবু হোরায়রা (রা) এ জিনিসটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বাজারে গিয়ে লোকদেরকে বলেন, তোমরা কেন উদাসীন? অথচ, রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকার বণ্টিত হচ্ছে। যাও, তোমাদের অংশ নাও। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কোথায়? তিনি বলেন, 'মসজিদে'। তারা তাড়াতাড়ি মসজিদে গেল এবং লোকদের বিভিন্ন দল দেখতে পেল। একদল নামায পড়ছে, একদল হাদীস পড়ছে, একদল কোরআন পড়ছে, একদল তাসবীহ পাঠ করছে এবং অন্য একদল গুনাহ মাফ চাচ্ছে। তারা সকলে আবু হোরায়রার (রা) কাছে ফিরে এসে বলল, আমরা তো রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকার বণ্টিত হতে দেখলাম না। তিনি উত্তর দেন, তোমরা মসজিদে কি দেখেছ? তারা যা যা দেখেছে, তা বলল। আবু হোরায়রা (রা) বলেন ঃ এগুলোই তো রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকার। তোমরা সেগুলো অধিকহারে অর্জনের চেষ্টা কর। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, তোমরা কি করে এ হাদীসটি ভুলে গেলে? নবীরা কোন দেরহাম-দীনার উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না। তাঁরা এলেম রেখে যান। আবু হোরায়রা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করল না, সে রাসূলুল্লাহর (সা) উত্তরাধিকারের নিজ অংশ থেকে বঞ্চিত থাকল।

১০ম শিক্ষা

তারাবীর নামায

তারাবীর নামায নারী-পুরুষ সবার জন্য সুন্নাত এবং তা শুধু রমযান মাসেই এশার নামাযের পর পড়তে হয়। এটাকে সালাতুল কেয়াম বলা হয়। সাধারণতঃ সারা বছর রাত্রের নফল ও সুন্নাত নামাযকে সালাতুল কেয়াম বলা হয়। ফলে তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সালাতুল কেয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে সালাতুল কেয়াম পড়ে আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ 'আল্লাহ তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাকে গুনাহ থেকে বাঁচান এবং গুনাহর কাজ থেকে দূরে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য রমযানের সালাতুল কেয়ামকে সুন্নাত করেছি। যে রমযান মাসে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রোযা রাখে ও সালাতুল কেয়াম আদায় করে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। নাসাঈর এক বর্ণনায় এসেছে, 'তারা সদ্য নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)

আল্লাহ কোরআনে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ - وَبِالْاَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থ ঃ 'তারা রাত্রে কমই ঘুমায় এবং ভোর রাত্রে তারা আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়।' (সূরা জারিয়াত-১৮)

কম ঘুমানোর কারণ হলো, তারা অতিরিক্ত নামায পড়ে ও অন্যান্য এবাদত করে। এর মধ্যে তারাবী ও তাহাজ্জুদ অন্যতম।

আল্লাহ্ কোরআনে মোমিনের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا -

অর্থ ঃ 'যারা রাতকে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সেজদা এবং কেয়াম অর্থাৎ নামাযে কাটিয়ে দেয়।' (আল ফোরকান-৬৪)

এই আয়াতে নিঃসন্দেহে তারাবী এবং তাহাজ্জুদ গুজার লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে।

রাত্রে অতিরিক্ত (নফল) নামায পড়া ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ তোমরা রাত্রের নামায ত্যাগ করো না, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও রাত্রের নামায ত্যাগ করতেন না। এমনকি তিনি অসুস্থ হলে কিংবা অলসতা অনুভব করলে বসে বসে হলেও নামায পড়তেন।[১]

বর্ণিত আছে, হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রা) রাত্রে ইচ্ছামত নামায পড়তেন। রাত অর্ধেক হলে তিনি নিজ পরিবারকে নামাযের জন্য জাগাতেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

অর্থ ঃ 'নিজের পরিবার-পরিজন এবং অনুসারীদেরকেও নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অটল থাকুন। (সূরা ত্বাহা-১৩২)

আল্লাহ্ কোরআনে আরো বলেছেন ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ -

অর্থ ঃ 'কিংবা যে ব্যক্তি রাত্রে সাজদা ও কেয়াম তথা নামাযের মাধ্যমে এবাদত

১. কাইফা নাঈসু রামাদ্বান-আবদুল্লাহ সালেহ, দারুল ওয়াত্বান প্রকাশনী, রিয়াদ, ১৪১১ হিঃ

করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ রবের রহমতের আশা করে।' (সূরা যুমার-৯) অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যারা আমল করে না তাদের চাইতে উত্তম।

আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ হে কাপড় আচ্ছাদনকারী। সামান্য রাত জেগে নামায পড়। অর্থাৎ আধা রাত কিংবা এর চাইতে কম অথবা বেশী সময় জেগে থেকে নামায আদায় করো এবং সুন্দর করে মার্জিতভাবে (তারতীল) সহকারে কোরআন পড়।' (সূরা মোয্‌যাম্মিল-১-৪)

আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে নামায পড়েছেন, কান্নাকাটি করেছেন এবং আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছেন। আনসার-মুহাজিররাও রাত হলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন এবং রাত্রি জেগে এবাদত করতেন। বরং সত্যি কথা বলতে কি তাদের ঘর রাত্রের অন্ধকারে কোরআনের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতো। তারা নিজেদেরকে কোরআনের প্রশিক্ষণের আলোকে দারুণভাবে গঠন করার চেষ্টা করতেন। ফলে, রাত্রের অন্ধকার ছিল তাদের ঈমান ও আমলের লালনক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, সকাল বেলায় সেই ঘর ছিল দুনিয়ার কর্মশালা এবং তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে একজন বীর- মুজাহিদ। তাদের ব্যাপারেই এই প্রবাদ চলে, 'রাত্রে বৈরাগী ও দিনে শাহ সওয়ার।'

رُهْبَانُ اللَّيْلِ وَفُرْسَانُ النَّهَارِ -

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ রাত্রে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, তখন যদি বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তাকে তা দান করেন এবং তা প্রতি রাতেই রয়েছে। (মুসলিম)

আফসোসের বিষয়, আজ মোমিনের ঘর রাত্রে-গল্প-গুজব, তাস-জুয়া, সিনেমা, টেলিভিশন ও ভিডিওসহ বিভিন্ন অপবিত্র ও অন্যায় কাজের কর্মশালায় পরিণত হয়েছে।

রাত্রের অন্ধকার কবরের অন্ধকার ও আজাবকে স্মরণ করার উত্তম হাতিয়ার। তাই রাত্রি জাগরণ কবরের আলো এবং গুনাহ ও পাপ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম উপায়। এই রাতের শেষাংশেই তো আল্লাহ মোমিনের গুনাহ মাফ করার জন্য প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তিনি গুনাহগার বান্দাদের উদ্দেশ্যে ক্ষমা ও মুক্তির আহ্বান জানান। যারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন।

তাই যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা এমন ক্ষমা, মুক্তি ও রহমতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু একথাও তো সত্য, গাফেল এবং

উদাসীনদের অন্তর রাতের অন্ধকার নামার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে এবং মরে যায়। তাই তারা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অথচ মোমিন অন্ধকারের বুক চিরে আলোর সন্ধান লাভ করে, ঠিক বিদ্যুৎ যেমনটি অন্ধকার মেঘের বুক চিরে আলোর বার্তা নিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তারাবী পড়েছেন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণও নিয়মিত তারাবী পড়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হে লোকেরা! সালামের প্রসার ঘটাও, খানা খাওয়াও, লোকেরা যখন ঘুমে তখন রাত্রে নামায পড়ো, তাহলে শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।' (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায পড়েন। তাঁর পেছনে অন্যান্য লোকেরাও জামাআতে দাঁড়িয়ে যায়। পরের রাতও তিনি নামায পড়েন এবং লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তারপর লোকেরা ৩য় কিংবা ৪র্থ রাত্রেও নামাযের জন্য একত্রিত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হননি। সকাল হলে তিনি বলেন, তোমরা যা করেছ তা আমি দেখেছি। আমি এই ভয়ে বের হইনি, না জানি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়।' (মুসলিম)

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হযরত হোজাইফা (রা) রমযানের নামায (তারাবী) পড়েন। তিনি এক রাকাতেই সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা আলে-ইমরান পড়েন। যেখানে ভয়সূচক আয়াত আসত সেখানে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। দুই রাকাত নামায শেষ হওয়া মাত্রই বেলাল (ফজরের) নামাযের আজান দেন।' (মোসনাদে আহমদ)

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি মাত্র ৪ রাকাত (তারাবী) নামায পড়েছেন।'

হযরত আবুজার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) ২৩শে রমযান রাতের এক তৃতীয়াংশ এবং ২৫শে রমযান অর্ধ রাত্রি এবং ২৭শে রমযান রাতের দুই তৃতীয়াংশ যাবত তারাবী পড়েছেন। তখন জামাআতে অংশগ্রহণকারীরা রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেন ঃ যদি আমাদেরকে নিয়ে রাতের অবশিষ্টাংশও নামায পড়তেন। তখন তিনি জওয়াবে বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে নামায সম্পূর্ণ করে, তাহলে তার জন্য রাতের নামাযের সওয়াব লেখা হয়।' (তিরমিযী,

নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ) তিরমিযী এটাকে উত্তম হাদীস বলেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ -

বোখারী শরীফে বর্ণিত কয়েকটা হাদীস দ্বারা তারাবীর নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। বর্ণনাটি হচ্ছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের রাত্রে বের হন এবং মসজিদে নববীতে নামায পড়েন। তাঁর সাথে কিছু লোক জামাআতে নামায আদায় করেন। লোকেরা এই নামায সম্পর্কে বলাবলি শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ২য় রাত্রেও বের হন এবং নামায পড়েন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়েন। লোকেরা এই নিয়ে আলোচনা করেন। ফলে, ৩য় রাত্রে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তিনি বের হন এবং সবাইকে নিয়ে নামায পড়েন। ৪র্থ রাতে লোক এত বেশী হলো যে, মসজিদে ঠাঁই নেই এবং তাতে সংকুলান হচ্ছে না। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন না। লোকেরা জোরে 'নামায-নামায' বলে আওয়াজ দিতে থাকল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন না। তিনি ফজরের সময় বের হলেন। নামায আদায় করে লোকজনের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন, গতরাতে তোমাদের ঘটনা আমার কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু আমার ভয় হয়েছিল, হয়তো তা ফরয করে দেয়া হবে। তখন তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।'

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকাল করেছেন এবং বিষয়টি ঐ রকমই রয়ে গেছে।' হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হন এবং দেখেন যে মসজিদের এক পাশে একদল লোক নামায (তারাবী) পড়ছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? তাঁকে উত্তর দেয়া হলো, এরা ঐসব লোক যারা কোরআন মুখস্থ জানে না।

উবাই বিন কা'ব তাদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায পড়ছেন এবং তারা তার পেছনে নামায আদায় করছেন। তখন নবী (সা) বললেন, তারা ঠিক করেছে এবং যা করেছে তা খুবই উত্তম।' (আবু দাউদ)

আবূ দাউদ বলেছেন, সনদের মধ্যে মুসলিম বিন খালেদ মাখযুমী দুর্বল বর্ণনাকারী। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর (রা)-ই সর্বপ্রথম উবাই বিন কাবের ইমামতিতে তারাবীর নামায প্রচলন করেন। (ফাতহুল বারী- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী)

তারাবীর নামাযের বর্তমান রূপ হযরত ওমর ফারুকের (রা) অবদান। তিনি উবাই বিন কাবের নেতৃত্বে তারাবীর নামাযের ব্যবস্থা চালু করেন। এ প্রসঙ্গে

আবদুর রহমান বিন আবদুল বারী (রা) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন ঃ আমি রমযানের এক রাতে হযরত ওমর ফারুকের (রা) সাথে বের হই। তখন দেখি লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জামাআতে তারাবীর নামায পড়ছে। কেউ একাই নামায শুরু করে দিচ্ছে। পেছনে লোক এসে জামাআতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন হযরত ওমর (রা) ভাবেন, আমি যদি তাদেরকে একজন কারীর পেছনে একত্রিত করে দিতে পারি তাহলে কতইনা ভাল হতো। তারপর তিনি উবাই বিন কাবের ইমামতিতে সবাইকে জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীর নামায আদায়ের সিদ্ধান্ত দিলেন। তারপর উবাই বিন কাবের ইমামতিতে জামাত শুরু হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অন্য আরেক রাতে হযরত ওমরের সাথে বের হলাম এবং লোকেরা উবাই বিন কাবের পেছনে নামায আদায় করছিলেন। তখন ওমর (রা) বলেন, এটা কতইনা উত্তম বেদআত (ব্যবস্থা)। যারা শেষ রাত্রে নামায পড়ে তারা রাত্রের প্রথম অংশে নামায আদায়কারীদের চাইতে উত্তম।' (বোখারী)

বর্ণিত আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আট রাকাত সালাতুল কেয়াম পড়েছেন। তুমি ঐ নামাযের দৈর্ঘ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না। তারপর তিন রাকাত বিতর পড়েছেন।[১] অর্থাৎ তিনি খুবই দীর্ঘ ও সুন্দর কেরাত সহকারে ঐ নামায পড়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে ১০ রাকাত নামায পড়েছেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। অনেক সাহাবায়ে কেরামও ১০ রাকাত নামায পড়েছেন বলে বর্ণিত আছে।[২] তবে তাদের সেই স্বল্প সংখ্যক রাকাত ছিল বিনয়, একাগ্রতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ। খুশু ও বিনয় সহকারে ৮ রাকাত নামায ২০ রাকাত বিনয়হীন নামাযের চাইতে উত্তম।

নামাযে কোরআন বেশী পড়ার উপরই গুরুত্ব বেশী। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে রাতের নামাযে ১০ আয়াত কোরআন পড়বে সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে ১শ' আয়াত পড়বে তাকে এবাদতকারীর মধ্যে গণ্য করা হবে। যে ১ হাজার আয়াত পড়বে তাকে অসংখ্য-অগণিত সওয়াব দেয়া হবে।' (আবূ দাউদ)

আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত ঃ 'কেয়ামতের দিন রোযা ও রাত্রের নামায বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিনে পানাহার থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার

---

১. আল-হাদইউন্নাবাওয়ী আস্ সহীহ ফি সালাতিত তারাবী– শেখ মোহাম্মদ আলী আস্সাবুনী, মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৮৩ খৃ। (বরাত বোখারী ও মুসলিম)। ২. প্রাগুক্ত।

৬—

ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। তারপর তাদের উভয়কে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।' (আহমদ-তাবারানী)

ইমাম আহমদ বোরাইদাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ 'কোরআনের পাঠককে কেয়ামতের দিন 'সম্মানজনক মুকুট' পরানো হবে এবং তাকে বলা হবে, কোরআন পাঠ করতে করতে বেহেশতের সিঁড়ি বেয়ে কক্ষে প্রবেশ করো।' অন্য আরেক হাদীসে আছে কোরআনের পাঠক যদি আল্লাহর ফরয আদায় ও আনুগত্য না করে, কোরআন তাকে হাতে ধরে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করবে। আর যে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ মানবে, কোরআন তাকে হাতে ধরে নিয়ে রূপালী অলংকার ও রাজ মুকুট পরাবে এবং তাকে শরাব পান করাবে।'

তারাবীর অর্থ

ইবনে মানজুর 'লিসানুল আরব' অভিধানে লিখেছেন ঃ তারাবী শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম করা। এই নামাযে দীর্ঘ কেরাত ও অধিক রাকাত আছে। তাতে বিশ্রাম নিতে হয় বলে তাকে তারাবী বলে। নামাযের মাঝে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় আবার নামায পড়তে হয়। প্রতি চার রাকাত দীর্ঘ নামাযের পর বিশ্রাম নিতে হয় বলে একে বিশ্রামের নামায বলে।

ইবনে মানজুর আরো বলেছেন ঃ আরাম হচ্ছে পরিশ্রমের বিপরীতে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَرِحْنَا بِهَا يَابِلَالُ -

অর্থ ঃ হে বেলাল! আমাদেরকে নামাযের আজান দিয়ে প্রশান্তির ব্যবস্থা করে দাও। আমরা নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবো। (আবূ দাউদ)

আল্লাহর সাথে গোপন মুনাজাতে যথেষ্ট শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'নামাযকে আমার জন্য নয়নাভিরাম করা হয়েছে।' মূলকথা, রমযানের উল্লেখিত সালাতুল কেয়ামের মধ্যে তারাবীর নামায অন্যতম।

রাকাত সংখ্যা

তারাবীর নামায ২০ রাকাত। ইমাম মালেক ছাড়া আর সকল মাযহাবের ইমামদের এটাই মত। হযরত ওমার (রা)-এর পর থেকে অতীত উম্মাহর সবাই ২০ রাকাত তারাবী ও ৩ রাকাত বিতর পড়ে আসছেন অব্যাহতভাবে। এর উপর

সাহাবায়ে কেরামের মতৈক্য বা ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বিরোধিতার অর্থ সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা।

হযরত সায়েব বিন ইয়াজিদ নামক বিখ্যাত সাহাবী বর্ণনা করেন, তাঁরা হযরত ওমর (রা)-এর সময় ২০ রাকাত তারাবীর নামায পড়েন। (বায়হাকী)

ইয়াযিদ বিন রোমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত ওমরের (রা) আমলে লোকেরা ২৩ রাকাত তারাবীর নামায পড়তেন। (মোওয়াত্তা ও বায়হাকী) অর্থাৎ ২০ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বিতর।

ইমাম মালেকের মতে, তারাবীর নামায ৩৬ রাকাত। আরো তিন রাকাত বিতরসহ মোট নামায হচ্ছে ৩৯ রাকাত। হযরত ওমার বিন আবদুল আযীযসহ মদীনাবাসীরা মোট ৩৯ রাকাত নামায পড়তেন। তারা সওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে মক্কাবাসীদের সমান হতে চায়। কেননা মক্কাবাসীরা প্রতি চার রাকাত তারাবীর পর মাঝখানে ১ বার করে মোট ৪বার সাত চক্কর বিশিষ্ট ৪টি তওয়াফ করে। তাই মদীনাবাসীরা প্রতি তওয়াফের জন্য ৪ রাকাত নামায অতিরিক্ত করে পড়ে, যাতে করে সওয়াবের দিক থেকে তারা মক্কাবাসীদের চাইতে পিছিয়ে না পড়ে। তাতে তাদের নামায ৪×৪=১৬ রাকাত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ রাকাতে দাঁড়ায়। ইমাম মালেকের অন্য মত হচ্ছে, তারাবীর নামায ২০ রাকাত। (আকরাবুল মাসালেক আলা মাজহাবিল ইমাম মালেক)

তারাবীর নামায ২ রাকাত করে মোট ২০ রাকাত ১০ সালামের সাথে পড়তে হয়। তারাবীতে কোরআন খতম করা উত্তম। তারাবীর নামাযে দীর্ঘ কেরাতও উত্তম। হযরত উবাই বিন কা'ব প্রতি রাকাতে ২শ' আয়াত পড়তেন। বেশী আয়াতে বেশী সওয়াব রয়েছে। বায়হাকী সায়েব বিন ইয়াজিদ নামক প্রখ্যাত সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা হযরত ওসমানের (রা) আমলে দীর্ঘ কেরাত ও কেয়ামের কারণে লাঠি ভর দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং মসজিদের খুঁটিগুলোর মধ্যে রশি বেঁধে তা ধরে ঝুলে থাকতেন। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুই হারাম শরীফ অর্থাৎ মক্কার মসজিদে হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীতে ২০ রাকাত তারাবী ও ৩ রাকাত বিতরের কম নামায পড়া হয়নি। বরং মদীনায় ৩৯ রাকাত পড়া হতো। হযরত ওমরের (রা) অনুকরণেই ২০ রাকাত তারাবী পড়া হয়ে থাকে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সময় বিতর ১ রাকাত পড়েছেন। কেননা, বিতর মানে বিজোড়। ১ রাকাত কিংবা ৩ রাকাত উভয়টাই বিজোড়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তারাবীর রাকাতের ব্যাপারে বলেছেন, মুসল্লীদের অবস্থার সাথে রাকাতের সম্পর্ক নির্ভরশীল। যদি রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণে ১০ রাকাত

তারাবী ও তিন রাকাত বিতর পড়া হয়, তাতে কেরাত দীর্ঘ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর যদি কেরাত দীর্ঘতর না হয় তাহলে ২০ রাকাত তারাবী পড়া উত্তম। অধিকাংশ মুসলমান এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। অতীতের নেক লোকদের মধ্যে কেউ কেউ ৪০ রাকাত তারাবী পড়েছেন।

মূলকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা সুনিদিষ্ট করেননি। তিনি নিজে বিতরসহ ১৩ কিংবা ১৬ রাকাতের বেশী পড়েননি। তবে দীর্ঘ কেরাত সহকারে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তারাবীর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু সুনির্দিষ্ট করেননি তা ফরয হওয়ার ভয়ে। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর যখন ফরয হওয়ার ভয় দূর হয়ে গেল, তখন হযরত ওমার (রা) ১৪ হিজরীতে উবাই বিন কা'বের নেতৃত্বে ২০ রাকাত নামায চালু করেন। সকল সাহাবী তা মেনে নেয়ায় তা শরীয়তের একটা বিধানে পরিণত হলো। কেননা, হযরত ওমার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাজ ও নির্দেশের অর্থ অন্যদের চাইতে খুব ভাল করেই বুঝতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ عَلَيْكُمْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ـ

'তোমাদের ওপর আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী।' (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ) আর ঐ ২০ রাকাত হচ্ছে সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদা।

ওমার (রা) কিসের ভিত্তিতে ২০ রাকাত তারাবী নিদিষ্ট করলেন, সেটা একটা জানার বিষয়। হাদীসের কিতাবগুলোতে এসেছে, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

مَا صَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ وَدَخَلَ بَيْتِيَ اِلاَّ وَصَلَّى اَرْبَعًا اَوْ سِتًّا ـ

'নবী (সা) এশার ফরয নামায পড়ার পর ৪ কিংবা ৬ রাকাত নামায পড়া ছাড়া কখনও আমার ঘরে প্রবেশ করেননি।'

আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত।

كَانَ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

'তিনি (নবী (সা)) প্রথমে দু'রাকাত হালকা নামায দ্বারা রাতের নামায শুরু করতেন।' সম্ভবতঃ ওমর (রা) তা নিম্নোক্তভাবে হিসেব করেছেন ঃ মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল কেয়াম ১৩ রাকাত + ৬ রাকাত + ২ রাকাত = ২১ রাকাত।[১]

---

১. দৈনিক আল মদীনা-জেদ্দা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তারাবী ও বিতরের নামায মিলিয়ে ১১ রাকাতের বেশী পড়েননি। তারা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানসহ অন্যান্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশী সালাতুল কেয়াম বা রাতের নামায পড়েননি।' (বোখারী ও মুসলিম)

এর উত্তরে বলা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) নিজ ঘরে রাসূলুল্লাহকে ঐ রকম নামায পড়তে দেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য সময় এর চাইতে বেশী নামায পড়েননি। কেননা, হযরত আয়েশা রাসুলুল্লাহর ৯ জন স্ত্রীর একজন এবং তিনি প্রতিদিন হযরত আয়েশার ঘরে থাকতেন না। পালাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীদের ঘরে ৮ রাত্রি যাপন করতেন। তাই এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশার ঘরের বর্ণনাই চূড়ান্ত নয়।

এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে (এশার) ফরয ব্যতীত ১৬ রাকাত নামায পড়েছেন। (আহমদ) এই হাদীসে ১১ রাকাতের বেশী নামাযের বর্ণনা আছে যা হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনার বিরোধী।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়ি। তিনি দু'দু' রাকাত করে ৬ বার নামায পড়েন। এরপর বিতর পড়েন। (বোখারী) অর্থাৎ ১২ রাকাত নামায পড়েন। পরে বিতর ১ রাকাত পড়লে মোট নামায ১৩ রাকাত, আর বিতর তিন রাকাত পড়লে মোট নামায ১৫ রাকাত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে ১৭ রাকাত নামায পড়েছেন।' (মুসলিম) ইবনে আব্বাস নিজেই তাঁর সাথে নামায পড়েছেন। যায়েদ বিন খালেদ আল-জোহানী থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) (রাত্রে) তের রাকাত নামায পড়েছেন। (মুসলিম) এই দুই বর্ণনাও হযরত আয়েশার বর্ণনার বিপরীত।

কাজী আয়াদ বলেছেন, উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো হচ্ছে হযরত আয়েশা, আব্বাস, আলী ও যায়েদ বিন খালেদ আলজোহানীর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এই নামাযের রাকাত সংখ্যার কোন সুনিদিষ্ট সীমা নেই। তাই কম ও বেশী করা যেতে পারে। যেহেতু রাত্রের নামাযে ফযীলত বেশী, তাই রাকাত বেশী হলে সওয়াবও বেশী হবে। যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের রাকাতের বর্ণনায় পার্থক্য দেখা যায়। হাফেজ ইবনে ইরাকীরও একই মত।

ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফতোয়া গ্রন্থে বলেছেন, উবাই বিন কা'ব (রা) লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বিতর পড়ায় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম সেটাকেই সুন্নাত বলেন। কেননা, তিনি আনসার ও মোহাজির সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন এবং কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সাহাবায়ে কেরাম সবাই এই বিষয়ে একমত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ১৩ রাকাত পড়েছেন কিন্তু তিনি তাতে দীর্ঘ কেরাত পড়েছেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর দেখে হযরত ওমর (রা) আরো ছোট কেরাত সহকারে ২০ রাকাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন। এতে করে বেশী রাকাতের মাধ্যমে দীর্ঘ আয়াতের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতে পারে। তাই ইমাম আহমদ বলেছেন ঃ ১১ রাকাত, ১৩ রাকাত, ১৬ রাকাত কিংবা ২০ রাকাত তারাবী তিন রাকাত বিতরসহ পড়তে পারেন।

তারাবীর নামাযের বিকাশের মোট ৮টা পর্যায় লক্ষণীয়

১. নবী করিম (সা) প্রথামে, তারাবীহর (সালাতুল কেয়াম) নামাযের জন্য উৎসাহিত করে এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

২. রোযার ফরযের সাথে তারাবীকে সুন্নাত হিসেবে মর্যাদা দান।

৩. মসজিদে নবওয়ীতে ৫/৬ জনের ভিন্ন দল বাস্তবে তা আদায় শুরু করে।

৪. নবী করিম (সা)-এর সাথে ৩/৪ দিন লোকদের তারাবীর জামাআতে অংশগ্রহণ।

৫. উবাই বিন কা'ব নিজ ঘরে আপন পরিবার কিংবা মসজিদ নবওয়ীতে কোরআন কম জানা লোকদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায পড়েন, নবী করিম (সা) সেটাকে অনুমোদন করেছেন।

৬. নবী করিম (সা) ২১, ২২ ও ২৩শে রমযানের রাত নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে ঘরে জামাআতে তারাবীর নামায পড়েন।

৭. তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭শে রমযানের রাতে মসজিদে নিজ পরিবারসহ অন্যান্য লোকদেরকে নিয়ে জামাআতে তারাবীহ পড়েন।

৮. নবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর ওমর (রা) এটাকে ২০ রাকাতের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।[১]

তারাবীর নামায জামাআত ছাড়া ঘরে একাকী পড়া উত্তম নাকি মসজিদে জামাআত সহকারে পড়া উত্তম- এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম মালেক, ইমাম আবু ইউসুফ ও কিছু সংখ্যক শাফেঈ আলেম মনে

---

১. দৈনিক আল-মদীনা-জেদ্দা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

করেন, ঘরে এবং একাকী তারাবী পড়া উত্তম। তাদের যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ -

অর্থ ঃ 'ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নফল ও সুন্নত নামায ঘরে পড়া উত্তম।'

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ এবং মালেকী মাজহাবের কিছু আলেমের মতে, মসজিদে জামাআত সহকারে তারাবী পড়া উত্তম। কেননা, তা ঈদের নামাযের মতো ইসলামের একটি দৃশ্যমান এবাদত। হযরত ওমরসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছেন এবং তা এইভাবে, মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযানের শেষ দিকে মসজিদে জামাআত সহকারে তারাবী পড়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের একটা অংশ তাঁর সাথে জামাআতে নামায আদায় করেছেন।

মুসলমানদের দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে পরে তারাবীর নামাযে কেরাতের পরিমাণ কমানোর প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা) তারাবীর জন্য তিনজন ইমাম ঠিক করেন। যিনি একটু তাড়াতাড়ি কেরাত পড়েন তাকে প্রতি রাকাতে ৩০ আয়াত, যিনি একটু মধ্যম গতিতে পড়েন তাকে ২৫ আয়াত এবং যিনি ধীর গতিতে পড়েন তাকে ২০ আয়াত পড়ার নির্দেশ দেন। তাবেঈদের যুগে এসে ৮ রাকাত তারাবীতে সূরা বাকারা পড়া হতো। ১২ রাকাতে সূরা বাকারা পড়লে এটাকে কম মনে করা হতো।

প্রখ্যাত ফকীহ এসহাক বিন রাহওয়াইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তারাবীতে কি পরিমাণ কেরাত পড়া দরকার ? তিনি প্রতি রাকাতে ২০ আয়াতের কম পড়ার অনুমতি দেননি। অনুরূপভাবে ইমাম মালেকও প্রতি রাকাতে ১০ আয়াতের কম পড়াকে অপসন্দ করেছেন। ইমাম আহমদ ও হানাফী মযহাবের কিছু আলেম বলেছেন, মুসল্লীদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কেরাত দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত করা উচিত। মূলকথা, সওয়াবের মাসে তারাবীতে বেশী কোরআন পড়া উত্তম।

রমযানের শেষ ১০ রাত দীর্ঘ কেরাত সহকারে নামায আদায়, জিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) কদরের মর্যাদা লাভ করার জন্য অনুরূপ করতেন। শেষ ১০ রাত্রে তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে জাগাতেন, বিছানা গুটিয়ে ফেলতেন, জাগ্রত থাকতেন এবং নিজে কঠোর পরিশ্রম করে এবাদত করতেন। রমযানের ১ম ২০ দিন তিনি এমনটি করতেন না। এ কারণে, মক্কা ও মদীনার দু'হারাম শরীফে তারাবীর নামায শেষে দেড়-দু'ঘন্টা বিরতির পর দীর্ঘ কেরাত, রুকু ও সাজদার মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দেশে এরূপ হলে কতইনা ভাল হতো।

১১শ শিক্ষা

সেহরী

রোযার উদ্দেশ্যে ভোর রাতের খাবারকে আরবীতে 'সুহুর,' 'সাহুর,' বা 'সাহার,' বলে।

سَحَرَ، اَلسُّحُوْرُ اَلسَّحُوْرُ ـ

সেহরী শব্দটি হচ্ছে উর্দু, যা পরে বাংলায়ও প্রচলিত হয়ে গেছে। সারাদিন রোযার উদ্দেশ্যে উপবাস থাকার জন্য শেষ রাতে পানাহার জরুরী। এতে করে পানাহার থেকে বিরত থাকার পরিমাণের মাত্রা হ্রাস করা হয়। শেষ রাতে না খেলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে শরীর অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়বে। রোযার মাধ্যমে মানুষকে এত বেশী দুর্বল করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ যেহেতু দিনে পানাহার নিষিদ্ধ করেছেন, তাই রাত্রে প্রয়োজনীয় খাবার খাওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। রমযান মাসের প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত। সেহরী গ্রহণ করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ রাতে পানাহার করতেন এবং সোবহে সাদেক থেকে রোযা রাখতেন। সেহরী খাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, রয়েছে অনেক বরকত। তাই এই সওয়াব ও বরকতের কাজটি ছাড়া ঠিক নয়। হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرْكَةً ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা শেষ রাতের খানা খাও। তাতে বরকত রয়েছে।' (বোখারী-মুসলিম)

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতারা সেহরী গ্রহণকারীর জন্য প্রার্থনা করেন। (তাবারানী ও ইবনে হিববান)

হযরত আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন

আমাদের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। আর আমাদের তো প্রভাত উদয়ের আগ পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি রয়েছে। (মুসলিম) উল্লেখ্য যে, রাত্রে শুয়ে পড়ার পর আহলে কিতাবের পানাহার নিষিদ্ধ ছিল।

অন্য এক হাদীসে সেহরী খাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ -

অর্থ ঃ তোমরা দিনে রোযার জন্য সেহরী খাবারের সাহায্য নাও এবং রাতে নামাযের জন্য দুপুরে নিদ্রাবিহীন বিশ্রাম গ্রহণ কর।' এই হাদীসে দিনে রোযা রাখার জন্য সেহরীর মাধ্যমে এবং রাত্রে তারাবী ও তাহাজ্জুদের জন্য দুপুরের হালকা বিশ্রামের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্য আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রাবী বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে দেখি তিনি শেষ রাতের খানা খাচ্ছেন। তারপর তিনি বললেন, এটা বরকতময়, আল্লাহ তোমাদের তা দান করেছেন; তোমরা তা ত্যাগ করো না।' (নাসাঈ)

হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তিন জিনিসে বরকত রয়েছে। সেগুলো হলো, জামাআত, সারীদ নামক খাবার ও সেহরী।' (তাবারানী)

সেহরীর আরো ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, খাবার হালাল হলে তিন ব্যক্তির খানার কোন হিসেব নেয়া হবে না, ইনশাআল্লাহ। ১. রোযাদার, ২. সেহরী বা শেষ রাতের খাবার গ্রহণকারী এবং ৩. আল্লাহর পথের মুজাহিদ বা সৈনিক।' (বাযযার)

সেহরী খাওয়ার সময়

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা সেই পর্যন্ত পানাহার কর যে পর্যন্ত না রাতের কালো রেখার বুক চিরে সোবহে সাদেক বা প্রভাতের সাদা রেখা পরিষ্কার ফুটে উঠে এবং রাত পর্যন্ত রোযা রাখ।' (সূরা বাকারা-১৮৭ নং আয়াত) আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ.

সেহরীর শেষ সময় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। তাদের কারুর মতে, প্রভাত বা সোবহে সাদেকের প্রাথমিক রেখা সূচিত হওয়ার সাথে সাথেই পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করেন, প্রভাতের সাদা রেখা উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত পানাহারের সুযোগ থাকে। হানাফী ফকীহদের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে, প্রথম মতটি সতর্কতামূলক আর দ্বিতীয় মতটি প্রশস্ত ও সহজ। অধিকাংশ ওলামা দ্বিতীয় মতের সমর্থক। প্রথম মতের তুলনায় দ্বিতীয় মতে কয়েক মিনিট বেশী সময় পাওয়া যায়।

নাসাঈ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে ২য় মতটির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'আমরা হোজাইফাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আপনি কোন সময় সেহরী খেতেন? তিনি বলেন, আমরা যখন সেহরী খেতাম, তখন দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ত, কেবল সূর্য উঠার বাকী থাকত।'

আবু দাউদ শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যদি তোমাদের কারুর সেহরী খাওয়ার সময় আজানের আওয়াজ কানে আসে, সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় এবং পেট ভরে পানাহার করে নেয়।'

হযরত বেলাল (রা) রমযানে লোকদেরকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য সোবহে সাদেকের অর্থাৎ প্রভাত সূচনার আগে আজান দিতেন। আর প্রভাত সূচনার সময় আরেকটি আজান দিতেন আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম নামক জনৈক অন্ধ সাহাবী। তাকে লোকেরা সোবহে সাদেকের কথা বলে দিলে তিনি আজান দিতেন।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে তিনটি ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলেছেন, এই আজান মাগরিবের আজান। কেউ বলেছেন, ফজর সূচনার আজান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে লিখেছেন, এটা হচ্ছে হযরত বেলালের আজান, কিন্তু হাদীসটিতে বর্ণিত পানাহার বিষয়ক আলোচনা তখনই অর্থবহ হতে পারে যখন রোযাদারের নিজের কাছে ভোর হয়ে যাওয়ার মজবুত ধারণা সৃষ্টি না হবে।

ঐ আজান যে প্রভাত বা সোহবে সাদেকের সূচনার আজান তা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত অপর এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রা). থেকে বর্ণিত, 'তোমাদের কেউ যখন সেহরী খাওয়া অবস্থায় আজান শুনে তখন সে যেন খাওয়া শেষ করার আগে খাওয়ার পাত্র রেখে না দেয়।' প্রভাত সূচিত হয়ে গেলে মোয়াজ্জিন ঐ আজান দিত। দুই হাদীসের রাবী এক হওয়ায় বুঝা যায় যে, শেষের হাদীসটি আগের হাদীসেরই ব্যাখ্যা। এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উপরোল্লিখিত আজান সেহরীর জন্য জাগানোর বেলালের আজান নয়। কারণ, বেলাল তো লোকদেরকে সেহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য

আজান দিতেন। ফলে তার আজানের সময় খাওয়া অবস্থায় থাকা এবং আজান শুনে তাড়াহুড়া করে খেয়ে নেয়ার অনুমতি অর্থহীন ব্যাপার। তার আজানের পর লোকেরা ঘুম থেকে উঠে আস্তে ধীরে সেহরী খেত। তাড়াহুড়া করে খাওয়ার প্রশ্ন তখন সৃষ্টি হয় যখন দ্বিতীয় আজানের সময় কারো ঘুম ভাঙ্গে কিংবা যে ব্যক্তি খুব দেরীতে সেহরী খাওয়া শুরু করেছে এবং খাওয়া শেষ না হতেই দ্বিতীয় আজান পড়েছে।

আজকাল লোকেরা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীয়ত এ দুইটি বিষয়ে সময়ের ব্যাপারে এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তার থেকে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাতকালে রাতের বুক চিরে সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে কিছু সময়ের অবকাশ আছে। ঠিক সোবহে সাদেক বা প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কারো ঘুম ভাঙ্গে, তাহলে সঙ্গতভাবেই সে উঠে তাড়াহুড়া করে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। **(তাফহীমুল কোরআন-সূরা বাকারা-১৮৪ নং আয়াত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)**

ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য উম্মাহর জন্য রহমত। তাই প্রয়োজনে যে কেউ ঐ সকল মত পার্থক্যের সুযোগ গ্রহণ করে কষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। প্রভাতের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় যে কিছু সময়ের অবকাশ আছে তা আল্লাহরই করুণা। তাতে কোন মানুষের সংকীর্ণতা বা কড়াকড়ি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

'দেরী করে সেহরী খাওয়া উত্তম। নবী করিম (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তিন কাজ পছন্দ করেন। ১. দ্রুত ইফতার করা ২. দেরী করে সেহরী খাওয়া ৩. নামাযে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে দাঁড়ানো।' (তাবারানী)

নবী (সা) আরো বলেছেন ঃ

لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَاَخَّرُوا السُّحُوْرَ.

'যে পর্যন্ত লোকেরা দ্রুত ও বিনা বিলম্বে ইফতার করবে এবং দেরী করে সেহরী খাবে, সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।'[১]

এ দু'টো হাদীসে দেরীতে সেহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা বিজ্ঞান সম্মত। কেননা, সন্ধ্যা রাত্রে ইফতারের সময় গৃহীত খাবার হজমের জন্য সময় যত বেশী পাওয়া যায়, ততোই ভাল। ফলে পাকস্থলীর নূতন খাদ্য গ্রহণ অতিরিক্ত বোঝা হবে না। বরং খাদ্য গ্রহণটা সুসংগঠিত হবে।

এছাড়াও দেরীতে সেহরী খেলে দিনে ক্ষুধা-পিপাসার অনুভূতিও কম হবে।

---

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ, ৯ই ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

১২শ শিক্ষা

ইফতার

সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা সুন্নাত। ইফতারে তাড়াতাড়ি করা এবং দেরী না করা উত্তম। এ মর্মে আবু হোরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার কাছে সে ব্যক্তি অতি প্রিয় যে তাড়াতাড়ি ইফতার করে।' (তিরমিজী, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতেন। (বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'দ্বীন ততক্ষণ জয়ী থাকবে যতকাল লোকেরা শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ দেরীতে ইফতার করে।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাহ সে পর্যন্ত ইফতারে বিষয়ে আমার সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত তারা তারকা উদয়ের অপেক্ষা না করবে।' (ইবনে হিব্বান)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত লোকেরা অবিলম্বে ও দ্রুত ইফতার করবে, সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

ইয়া'লী বিন সুররাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তিন কাজ পছন্দ করেন। ১. দ্রুত ইফতার করা, ২. দেরীতে সেহরী খাওয়া এবং ৩. নামাযে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে দাঁড়ানো।' (তাবারানী)

ইফতারের আদব হচ্ছে, সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করা, আধাপাকা খেজুর কিংবা পাকা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইতফার করা এবং মাগরিবের নামায আদায়ে দেরী না করা ও প্রয়োজনবোধে পরে অবশিষ্ট ইফতার সমাপ্ত করা।

ইফতারের চিকিৎসাগত দিক

দেরী না করে দ্রুত ইফতার করার নির্দেশের মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। পুরো দিন উপবাস থাকার কারণে ক্ষতি পূরণের জন্য অতি দ্রুত ইফতার করা দরকার। এতে করে জীবন, কাজ ও চলাফেরার গতি অব্যাহত রাখ যায়। শরীর বিভিন্ন খাবার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। সেগুলো রক্তে সুগার তৈরী করে এবং সেখান

থেকে শক্তি আসে। দেরীতে ইফতার করলে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বেশী দেখা দেয়। কেননা, তখন রক্তে সুগারের পরিমাণ ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। এছাড়াও ক্ষুধা-পিপাসার তীব্র জ্বালাতো রয়েছেই। দ্বীন ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট ও দুর্বলতাকে উৎসাহিত করে না। দ্রুত ইফতার শরীরের ফিজিওলজিক্যাল ও মনস্তাত্বিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং হজম শক্তির পরিকল্পিত উন্নয়নে সহায়তা করে।

ইফতারের খাবার

আমরা ইফতারে বহু জিনিস খাই। মনে হয়, যত বেশী খাওয়া যায় ততই ভাল। আসলে কি তাই? ইফতারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلٰى تَمَرٍ فَاِنَّهُ بَرْكَةٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ تَمَرًا فَالْمَاءُ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ -

অর্থ ঃ 'তোমরা খেজুর দিয়ে ইতফার করো, কেননা তাতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না থাকে তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করো। পানি পাক ও পবিত্র।' রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুইটি খাবারের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য কোন খাবারের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা এতে অনেক উপকার ও স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। রোযাদারের শরীরে রোযার কারণে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয়। সুগার জাতীয় খাবার শরীরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত মিশে যায় এবং শরীর পাকস্থলী কিংবা অন্ত্রণালী থেকে তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খেজুরের এই বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক। তা রক্তে সুগারের পরিমাণকে দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌছাতে পারে। ফলে, শরীরের ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়। খেজুরে রয়েছে প্রচুর সুগার। শরীরের উপর খেজুরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম। তাছাড়াও তাতে প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান রয়েছে। হাদীস অনুযায়ী খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করা উত্তম। তবে পানি যদি ফলের রস কিংবা শরবত আকারে হয় সেটাও ভাল। যাতে করে শরীর প্রয়োজনীয় সুগার গ্রহণ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইফতারীর বৈজ্ঞানিক রহস্য

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আধা-পাকা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাও না পেতেন, তাহলে কয়েক অঞ্জলি পানি দিয়ে ইফতার করতেন।'

এ হাদীসে তাঁর ইফতারের ধরন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, তিনি ইতফারের খাবারে বিনয়ী ছিলেন। দুনিয়ার খাবার ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। অল্প জিনিস দিয়ে ইফতার করেছেন। আর সে জিনিসগুলো ছিল সহজলভ্য। মাগরিবের সময় কম বিধায় তিনি খাওয়াতে বেশী মশগুল থাকা পছন্দ করতেন না।

এবারে আমরা খেজুরের বিশ্লেষণে যেতে পারি। রোতাব বা আধা-পাকা খেজুরে শুকনো খেজুরের তুলনায় পানির পরিমাণ অধিক। তাছাড়াও এতে রয়েছে সুগার, আয়রণ, লবণ, ভিটামিন ও তা আঁশযুক্ত খাদ্য। এটা দ্রুত হজম হয় এবং অল্প সময়ে কলিজায় পৌঁছে যায়। সেখান থেকে মস্তিষ্কে গ্লুকোজ পৌঁছে। ফলে রোযাদার প্রশান্তি অনুভব করে, স্নায়ুতন্ত্র ঠাণ্ডা হয় এবং কর্মতৎপরতা বাড়ে।

দ্বিতীয়ত ঃ শুকনো পাকা খেজুর বা তামার আধা-পাকা খেজুরের তুলনায় পানি কম হলেও তাতে আধা-পাকা খেজুর অপেক্ষা শক্তি বেশী। তবে তা অপেক্ষাকৃত কিছু দেরীতে হজম হয়। অন্যান্য উপাদানগুলো সবই সমান। এজন্য তিনি এটাকে ২য় পর্যায়ে রেখেছেন।

তৃতীয়ত ঃ খেজুর না পেলে পানি পান করতেন। পানিতে খনিজ পদার্থ, লবণ, সোডিয়াম রয়েছে যা মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজন। পানি পিপাসার আগুনকে নিভিয়ে দেয়। বিশেষ করে যারা রোদে কাজ করে, পানি তাদের জন্য খুবই জরুরী। তিনি প্রথমে খেজুর বা সহজপাচ্য জিনিস খেয়ে পাকস্থলীকে আরো খাবারের উপযোগী করেছেন।

নবী করিম (সা)-এর অনুসরণে আমাদেরও উচিত–

১. ইফতারে অপচয় না করা ও অল্প খাওয়া।

২. গোশত, চর্বি ইত্যাদি খাবার এড়িয়ে যাওয়া, যাদের কলেষ্টরেল বেশী কিংবা ডায়াবেটিস আছে, তাদের এ সকল খাবার না খাওয়া ভাল।

৩. কম খাওয়ার অভ্যাস করা, মেদভূড়ি ও ওজন কমানো উচিত।

খেজুর, পানি কিংবা সুগার জাতীয় খাবার দিয়ে ইফতার করার পর মাগরিবের নামায আদায় করা উত্তম। অর্থাৎ নামাযের আগে হালকা ইফতার করে নামায আদায় করা রাসূলুল্লাহর (সা) পদ্ধতি। তারপর অবশিষ্ট ইফতার সম্পূর্ণ করা উত্তম।[১]

---

১. দৈনিক আল মদীনাহ– জেদ্দা, ২৪-৯-১৪১২ হি., ডাঃ মোহাম্মদ আলী আল বার, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও কনসালট্যান্ট, বাদশাহ ফাহদ চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র, বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা।

কেননা, হালকা ইফতার গ্রহণ করে নামায পড়া শরীরের জন্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ সময়টুকুতে অন্ত্রণালী দ্রুত সুগার জাতীয় খাবার চুষে নিতে পারে। ফলে, শরীর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। অল্প ইফতার গ্রহণ করায় লালা নিঃস্বরণকারী গ্ল্যান্ড চাঙ্গা হয় এবং পরবর্তী খাবার গ্রহণের জন্য শরীর প্রস্তুত হয়। স্বল্প খাবার গ্রহণ করায় পেট ভারী অনুভূত হয় না এবং নামাযে মন বসাতে সমস্যা হয় না।

একবারে বেশী খাবার গ্রহণ করলে হজম শক্তির উপর চাপ পড়ে, যা পেটের বদহজমী এবং ওজন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া তা অলসতা ও অবসাদ সৃষ্টি করে।[১]

ইফতারে অপচয়

ইসলামে সর্বাবস্থায় অপচয় হারাম। চাই তা ইফতার হউক, বিয়ে হউক বা মেহমানদারী হউক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

অর্থ ঃ 'তোমরা অপচয় করো না, আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।' (আরাফ-৩১)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ.

'তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (বনী ইসরাঈল-২৬)

সমাজে স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারে ইফতারের প্লেটে বহু প্রকার খাবার পরিবেশন করা হয়। ইফতার ছাড়াও রমযানে বেশী খাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ ইসলামে খাওয়ার বিষয়ে সকল সময় একই মানদণ্ড কার্যকর। মওসুম বিশেষে বেশী খাওয়ার জন্য শরীরের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান জোরদার হয় না। তাই রমযানে বেশী খাওয়ার প্রবণতা অযৌক্তিক। বরং এর উল্টোটাই সত্য। অর্থাৎ কম খাওয়ার ট্রেনিং দেয়া হয় রমযান মাসেই। রোযার কারণে অন্য মাসের তুলনায়

---

১. দৈনিক আল মদীনাহ– জেদ্দা, ২৪-৯-১৪১২ হি., ডাঃ মোহাম্মদ আলী আল বার, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও কনসালট্যান্ট, বাদশাহ ফাহদ চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র, বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা।

বেশী খাওয়ার সুযোগ কম। ইফতার ও সেহরীতে প্রয়োজন মোতাবেক ও যুক্তি সঙ্গত পরিমাণ খাবার গ্রহণ দরকার। আমরা যে মুহূর্তে বেশী খাবার গ্রহণ করি, তখন ক্ষুধা ও জঠর জ্বালায় অস্থির অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের কথা স্মরণ করা দরকার এবং আমাদের সম্পদে তাদের যে হক আছে তা আদায় করা প্রয়োজন।

রমযানে অনেকে বেশী ঘুমায়। এটা হচ্ছে সময়ের অপচয়। সাধারণভাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বীকৃত ঘুমের পরিমাণের চাইতে বেশী ঘুমানো ঠিক নয়। এতে কোন কল্যাণ নেই। অনেকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষুধার তাড়না এড়াতে চায়। এটা ঠিক নয়। প্রথম প্রথম একটু দুর্বলতা ও ক্ষুধা অনুভূত হলেও কয়েকদিন পর সকল কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে। বরং রাত্রে জেগে জেগে বেশী বেশী এবাদত করা রমযানের লক্ষ্য। অনেকে আবার অধিকতর চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে রোযার ক্লান্তি ও ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চায়। আসলে রমযান হচ্ছে কাজের মাস। কাজ করলে ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকলে ক্ষুধার অনুভূতি তীব্র হয় না।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির খাবারের কোন হিসেব নেয়া হবে না, ইনশাআল্লাহ, যদি তা হালাল ও পবিত্র হয়। তারা হচ্ছেন, ১. রোযাদার, ২. সেহরীর খাবার গ্রহণকারী এবং ৩. আল্লাহর পথের মুজাহিদ।' (বাযযার)

এই হাদীসকে কেউ যেন ভূঁড়িভোজ কিংবা অপচয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করেন। এতে রমযানের কল্যাণ ও বরকতের কথা ফুটে উঠেছে এবং তাতে অবশ্যই অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় খাবারের কথা বলা হয়নি।

অন্যকে ইফতার করানোর ফযীলত

যায়েদ বিন খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তার জন্য রয়েছে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব। তবে ঐ রোযাদারের সওয়াব থেকে কোন কিছু ঘাটতি হবে না।' (আহমদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, তিরমিযী)

সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন

রোযাদারকে ইফতার করায়, তার গুনাহ্ মাফ হয় এবং দোজখ থেকে নিজ গর্দান মুক্ত হয়, তার জন্য রোযাদারের সমান সওয়াব রয়েছে। তবে রোযাদারের পুরস্কার থেকে কোন কিছু হ্রাস করা হবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ আমাদের প্রত্যেকের নেই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকেও এই সওয়াব দেবেন যিনি এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর কিংবা পানি দিয়ে কাউকে ইফতার করান। যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করায় আল্লাহ্ তাকে আমার হাউজ থেকে পানি পান করাবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। (ইবনে খোযায়মা)

এই মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসেও ইফতার করানোর উপরোক্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, কাউকে ইফতার করালে একটি রোযার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। তাই রমযানসহ অন্যান্য সময় যত বেশী রোযাদারকে ইফতার করানো যায়, ততো বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। ধনী লোকেরা যেমনি অন্যকে ইফতার করাবেন, গরীব লোকেরাও নিজ নিজ স্বল্প সামর্থ অনুযায়ী অন্য রোযাদারকে ইফতার করাবেন।

ইফতার বলতে শুধু রোযা ভাঙ্গার জন্য প্রথমে যা খাওয়া হয় তাকেই বুঝায় না। অনেকেই এ রকম মনে করেন। আসলে, রোযা ভাঙ্গার জন্য সন্ধ্যার সকল খাবারকেই ইফতার বলে। ইফতার মানে সন্ধ্যার সময় রোযা ভাঙ্গার পরবর্তী খাবার, ১ম বারের সামান্য কিছু খাবার নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি সন্ধ্যায় কাউকে ইফতারীর প্রচলিত জিনিস খাওয়ানোর পর ভাত খাওয়ায় সেটাও ইফতারীর অন্তর্ভুক্ত।

রোযাদারের কাছে মেহমান খেলে রোযাদারের সওয়াব হয়

কোন নফল কিংবা কাজা ও কাফফারা আদায়কারী রোযাদারের কাছে যদি কেউ খানা খায়, তাতেও সেই রোযাদার ব্যক্তি সওয়াব পাবে। উম্মে ওমারাহ্ আনসারী নামক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে আসেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে খাবার দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেও খাবার খেতে বলেন। ওমারাহ বলেন, আমি রোযাদার। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফেরেশতা রোযাদারের জন্য সে পর্যন্ত ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করতে থাকে যে পর্যন্ত না

মেহমানগণ খানা শেষ করেন কিংবা তৃপ্ত হন।' (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খোযায়মাহ ও ইবনে হিব্বান)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাউকে ইফতার করালে যেমন সওয়াব হয়, তেমনি রোযাদারের কাছে খানা খেলেও সওয়াব হয়। রোযার মর্যাদা কত বেশী।

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কেবলমাত্র তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং কেবলমাত্র তোমার প্রদত্ত রিজিক দ্বারাই ইফতার করছি। (আবূ দাঊদ)

ইফতারের পরের দোয়া

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ পিপাসা দূর হয়েছে, খাদ্যনালী সিক্ত হয়েছে এবং পারিশ্রমিক অর্জিত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।' (আবূ দাঊদ)

১৩শ শিক্ষা

দোয়া

দোয়া অর্থ ডাকা। আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া পাওয়াকে দোয়া বলে। আমাদের বহু প্রয়োজন আছে। সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ ঃ 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।'

আল্লাহ তার নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

অর্থ ঃ 'যখন তোমার কাছে আমার কোন বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তুমি বলো, আমি তাদের খুবই নিকটে এবং যখন কেউ আমাকে ডাকে (দোয়া করে) আমি তার ডাকে সাড়া দেই।' (সূরা বাকারা-১৮৬)

তিনি বিপদ মুসীবতের সময় দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তিনি ছাড়া আর কেউ দুঃখ-কষ্ট দূর করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ.

অর্থ ঃ অথবা কে বিপদগ্রস্থ লোকের ডাকে সাড়া দেয় এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করে? নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। তিনি দোয়া কবুল করার যে ওয়াদা করেছেন, সেই ওয়াদা পূরণ করেন। নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ ঃ দোয়াই হচ্ছে এবাদত। (আহমদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থ ঃ আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে বেশী সম্মানিত জিনিস আর কিছু নেই। (তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমি ঠিক সে রকম, যে রকম বান্দা আমার ব্যাপারে ধারণা করে; যখন সে আমার কাছে দোয়া করে তখন আমি তার সাথে থাকি। (বোখারী ও মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ

অর্থ ঃ দোয়া হচ্ছে এবাদতের সার। (তিরমিযী, হাদীসের সনদ দুর্বল)

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন দোয়া ছাড়া আর কোন কিছু তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে না। নেক কাজ ছাড়া আর কোন কিছু হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না এবং বান্দা নিজ গুনাহর কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

এই হাদীসে দোয়া ও নেক কাজকে এমন শক্তিশালী হাতিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাকদীরের লিখন পরিবর্তন ও আয়ু বৃদ্ধি করা যায়। তাই আমাদের দোয়া ও নেক কাজের অস্ত্রে বেশী বেশী সজ্জিত হওয়া দরকার।

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যার জন্য দোয়ার দরজা খোলা হয়, তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও শান্তির চাইতে অধিকতর প্রিয় দোয়া নেই।'

সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ চিরঞ্জীব ও সম্মানিত। বান্দা তার কাছে দুই হাত তুললে তিনি খালি হাতে তাকে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কোন মুসলমান যদি এমন দোয়া করে যাতে গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার অধিকার ছিন্ন করার আহ্বান নেই, তাহলে আল্লাহ তাকে তিনটার যে কোন একটি বিনিময় দান করবেন; হয় সাথে সাথে তার দোয়া কবুল করবেন; না হয় আখেরাতের জন্য তা সঞ্চিত রাখবেন অথবা এ পরিমাণ ক্ষতিকর জিনিস থেকে তাকে হেফাজত করবেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী দোয়া করবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ সর্বাধিক দাতা। (তিরমিযী, হাকেম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে আল্লাহর কাছে কিছু চায় না আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে দুঃখের সময় আল্লাহ তার দোয়া শুনবেন সে যেন সুখের সময় দোয়া করে। (তিরমিযী)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ প্রভুর কাছে প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করে। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তার জন্যও প্রার্থনা জানাবে। (তিরমিযী)

নিজের জন্য যেমন দোয়া করা দরকার, অন্য ভাইয়ের জন্যও দোয়া করা উচিত। নিজের আত্মীয়-স্বজন, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী, মামা-মামী, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, চাচা-চাচী, জেঠা-জেঠী, শালা-শালী, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীসহ দেশবাসী এবং সকল জীবিত ও মৃত মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করা দরকার। নবী, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেক লোকদের জন্যও দোয়া করা দরকার। এ মর্মে আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করলে সেই দোয়া কবুল হয়। তার মাথার কাছে নিয়োজিত ফেরেশতা আমীন বলেন এবং বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ হউক।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তিন দোয়া কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। মা-বাপের দোয়া, মজলুমের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'সবচাইতে দ্রুত যে দোয়া কবুল হয় তা হচ্ছে, কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَاِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ـ

অর্থ ঃ তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। বরং তোমরা সর্বাধিক শ্রোতা ও দ্রষ্টাকেই ডেকে থাকো, যিনি তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের চাইতেও আরো বেশী নিকটে। (বোখারী ও মুসলিম)

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَعْجِزُوْا فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ اَحَدٌ ـ

অর্থ ঃ তোমরা দোয়ায় দুর্বল হয়ো না। কেননা দোয়ার সাথে কেউ কখনও ধ্বংস হবে না। (ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ যদি নিকটে হয় তাহলে আমরা গোপনে তার কাছে চাবো আর যদি তিনি দূরে হন তাহলে আমরা আওয়াজ দিয়ে তাঁকে ডাকবো। এর জবাবে কোরআনের একটি আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলেন ঃ 'আমি তোমাদের নিকটে অবস্থান করি। তোমরা আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেবো।'

বিশেষ সময় ও মওসুমে দোয়া বেশী কবুল হয়। অনুরূপভাবে বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ লোকের দোয়াও কবুল হয়। পবিত্র রমযানে দোয়া বেশী কবুল হয়। এ ছাড়াও বিশেষ স্থান, যেমন মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা, জমজম কূপ, সাফা, মারওয়া পাহাড়, মিনা, মোযদালেফা ও আরাফাতে এবং মিনার তিন জামরাহর কাছে দোয়া কবুল হয়। বিশেষ ব্যক্তি ও অবস্থা যেমন, রোযাদার ইফতার করা পর্যন্ত, ইফতারের সময়, কাবা শরীফ দেখার সময়, ভোর রাতে, তাহাজ্জুদের সময় এবং শুক্রবারে দোয়া বেশী কবুল হয়।

রমযান ফযীলতের মাস। এই মাসে যাবতীয় ভোগ-লালসা থেকে দূরে থেকে আল্লাহ হুকুম মানার কারণে রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনি দোয়া করলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। তাই রমযানে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দোয়া করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ -

অর্থ ঃ রোযাদারের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না, অর্থাৎ কবুল করা হয়।

তাই রমযানে বেশী বেশী দোয়া করা উচিত। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণমূলক কাজের জন্য দোয়া করা দরকার। দোয়া করতে গাফলতি করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে গাফেল থাকা। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে, রাতের শেষয়াংশে আল্লাহ প্রথম আসমানে নাযিল হন এবং জিজ্ঞেস করেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি দান করবো ? কোন দোয়াকারী আছে কি যার দোয়া আমি কবুল করবো ? এবং গুনাহর জন্য কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি আমি যার গুনাহ মাফ করবো ? এই অপূর্ব সুযোগ একজন মোমিন কিভাবে হাতছাড়া করতে পারে ? আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ ـ

অর্থ ঃ ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না। তাই ইফতারের সময় সবারই উচিত বেশী বেশী করে দোয়া করা। (ইবনে মাজাহ) রাসূলুল্লাহ (সা) ইতফারের সময় বিভিন্ন ধরনের দোয়া করেছেন। মুয়াজ বিন যাহ্‌রাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইফতারের সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া নেয়ামত দিয়েই ইফতার করছি। (আবূ দাউদ)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইফতারের সময় বলতেন ঃ

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ পিপাসা দূর হয়ে গেছে, অন্ত্রনালী পানিতে ভিজেছে এবং ইনশাআল্লাহ পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (আবূ দাউদ কিতাবুস সিয়াম, নাসাঈ, হাকেম)।

আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাদ বিন মোয়াজের বাড়ীতে ইফতার করেন। ইফতারের সময় তিনি বললেন ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করেছে, নেক লোকেরা তোমাদের খাবার গ্রহণ করেছে এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য রহমত ও বরকতের দোয়া করেছে।' (ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও আবূ দাউদ)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতফারের সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি যা সকল বস্তুর উপর বিস্তৃত। তুমি আমার গুনাহ মাফ কর।' (ইবনে মাজাহ, হাকেম)

আল্লাহ দোয়া কবুল করার যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণের জন্য কিছু শর্ত আছে। তিনি কখনও নিজ ওয়াদা খেলাফ করেন না। তাই শর্তগুলো পূরণ হলে দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

দোয়া কবুলের পথে বাধাসমূহ

১. আল্লাহর নাযিল করা ফরয-ওয়াজিব লংঘন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ করা।

আল্লাহর নাযিল করা ফরয-ওয়াজিব লংঘন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ করা, দোয়া কবুলের পথে বাধা। কেননা, এর ফলে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। মানুষ ঠেকা ও বিপদে পড়ে দোয়া করে যেন বিপদমুক্ত হওয়া যায়, সুস্থ্য ও ভাল অবস্থায় দোয়া করে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "ভাল অবস্থায় তুমি আল্লাহকে চিনতে শিখ বিপদের অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে চিনবে।"

আল্লাহ নবী ইউনুস (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ "তিনি যদি পূর্বে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন তাহলে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতেন।"

আল্লাহ ফেরাউন সম্পর্কে কোরআনে বলেছেন ঃ 'যখন পানি ফেরাউনকে ডুবিয়ে দিল তখন সে বললো, আমি ঈমান আনলাম, (আল্লাহ বলেন) এখন ? এর আগে তুমি নাফরমানি করেছ এবং তুমি ছিলে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' এই দুই আয়াতে দোয়া কবুলের জন্য আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ইউনুস (আ) আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য ছিলেন এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। তাই তার দোয়া কবুল হয়েছে। পক্ষান্তরে ফেরাউন আল্লাহর অবাধ্য ছিল ও তাঁর আদেশ মানতো না। তাই তার দোয়া ও তওবা কবুল করা হয়নি।

২. হারাম খাবার ও পোশাক।

দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে হারাম আয় দ্বারা খাদ্য পানীয় ও পোশাক পরা সবচাইতে বড় বাধা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে ঃ

ذَكَرَ النَّبِيُّ (ص) الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া কবুলের উদ্দেশ্যে দূর থেকে পবিত্র স্থানে সফরাগত আওলাকেশী ধূলিমলিন লোকের কথা উল্লেখ করে বলেন, সে ব্যক্তি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে দোয়া করে। অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার রক্তমাংস তৈরি। তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে ? (মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُجَابَ الدَّعْوَةِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা খাবারকে পবিত্র করো, তাহলে তোমার দোয়া কবুল হবে।'

৩. শিরক ও বিদ্আত।

শিরক ও বিদ্আতের কারণে দোয়া কবুল হয় না। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَادْعُو اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহকে ডাক এবং তার দ্বীনকে এখলাসপূর্ণ ও একনিষ্ঠ করো।'

এখলাস এবং একনিষ্ঠতার মূল অর্থ হচ্ছে, শিরক ও বিদ্আত থেকে দূরে থাকা। যারা আল্লাহর সাথে দেবতা, কবরবাসী, নেকলোক, মাযার ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করে এবং তাদের সাহায্য চায় তাদের দোয়া কবুল হয় না।

আল্লাহ বলেন ঃ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে তোমরা ডেকো না।' কবর পূজারীরা মৃতদের উসিলায় দোয়া কবুলের আহ্বান জানায় এবং বলে, আমরা অমুকের উসিলায় কিংবা তার সম্মানের উসিলায় দোয়া কবুলের দরখাস্ত করছি। তাদের এই দোয়া শিরক ও বিদ্আত মিশ্রিত। কেননা, আল্লাহ কাউকে মাধ্যম কিংবা উসিলা বানিয়ে দোয়া করার নির্দেশ দেননি। বরং তিনি সরাসরি তার কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ 'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি কবুল করবো।'

হাদীস শরীফে নেক কাজের দোহাই দিয়ে দোয়া করার কথা উল্লেখ আছে। যেমন এক গুহায় পাথর দ্বারা অবরুদ্ধ তিন ব্যক্তি তাদের তিনটি নেক কাজের কথা উল্লেখ করে দোয়া করায় আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং গুহার মুখ অবরুদ্ধকারী পাথরটিকে সরিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেন। তাই কোন নেক ব্যক্তি নয়, বরং নেক কাজকে উসিলা হিসেবে পেশ করা যায়। তবে কোন উসিলা ছাড়াই আল্লাহ তার কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. গাফেল ও উদাস মনের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لاَهٍ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা এমনভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তা কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ গাফেল ও উদাস মনের দোয়া কবুল করেন না।' (হাকেম।)

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ না করলে দোয়া কবুল হয় না।

হযরত হোজায়ফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهَ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ -

অর্থ ঃ 'আমার প্রাণ যার হাতে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে, না হয় শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের উপর নিজ আযাব পাঠাবেন; এরপর তোমরা তাঁর কাছে দোয়া করবে, তিনি দোয়া কবুল করবেন না। (তিরমিযী)

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন ঃ মকসুদ অর্জন ও ক্ষতিকর জিনিস প্রতিরোধে দোয়া হচ্ছে শক্তিশালী উপায়। দোয়ার ফলাফল কয়েক কারণে দেখা যায় না। যদি মন্দ কাজ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য দোয়া করা হয় তাতে আল্লাহর নাফরমানী থাকায় তা আল্লাহ কবুল করেন না। দুর্বল মন ও বেপরোয়া মনের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন না। তিনি আরো বলেন, দোয়া হচ্ছে সর্বোত্তম চিকিৎসা। তা বিপদের শত্রু এবং তা নাযিলে বাধা সৃষ্টি করে কিংবা হাল্কা করতে সাহায্য করে। দোয়া মোমিনের অস্ত্র।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ ঃ 'দোয়া মোমিনের হাতিয়ার ও দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান ও জমীনের আলো।' (হাকেম)

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ.

অর্থ ঃ 'যে বিপদ নাযিল হয়েছে কিংবা এখনও নাযিল হয়নি তার জন্য দোয়া উপকারী। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা জরুরী।' (হাকেম)

৬. হাদীসে এসেছে, দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে দোয়া কবুল হয় না। (মুসলিম, তিরমিযী)

বিলম্বে দোয়া কবুল

অনেক সময় আল্লাহ দোয়াকারীর বৃহত্তর স্বার্থে দোয়া বিলম্বে কবুল করেন। তিনি যেহেতু সর্বজ্ঞানী, তিনি জানেন যে তার বান্দা যে ছোট বিষয়ে দোয়া করেছে তিনি তাকে বৃহত্তর আরেকটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিছিয়ে দেন। হতে পারে, বান্দা তখন দোয়া নাও করতে পারে কিংবা বৃহত্তর সেই স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পারছে না অথবা পরকালের বৃহত্তর বিপদে রক্ষা করা ও মুক্তির জন্য তার ঐ দোয়াকে দুনিয়ার জন্য কবুল করা হয় না। এর বিনিময়ে পরকালের তাকে উত্তম বিনিময় দেয়া হবে। এই সকল কারণে আল্লাহ্ কোন কোন সময় দোয়া বিলম্বে কবুল করেন। তাই দোয়াকারীর নিরাশ হওয়া চলবে না।

ফোদালা বিন ওবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়ারত অবস্থায় দেখলেন যে, সে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করেনি। তখন তিনি মন্তব্য করেন, 'সে তাড়াহুড়া করেছে।' তারপর তিনি তাকে ডাকেন এবং তাকে কিংবা অন্য কাউকে বলেন, 'তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে ও স্তুতি গায়। নবীর উপর দরূদ পাঠ করে এবং তারপর যা ইচ্ছা তা যেন দোয়া করে।' (তিরমিযী)

দোয়ার আদব

দোয়া কবুলের জন্য বেশ কিছু আদব আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. দোয়ার শুরু, মাঝে, শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা।

যেমন ঃ আলহামদু লিল্লাহ বলা।

২. রাসূলুল্লাহর (সা) উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি ?

তিনি বললেন, এর অর্থ হলো, এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘক্ষণ থেকে দোয়া করছি, অথচ এখন পর্যন্ত কবুল হলো না। অতপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। (মুসলিম ও তিরমিযী)।

৩. দোয়া কবুলের সময় দোয়া করা।

যেমন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, সেজদা, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়, নামাযের পর। জুম'আর দিন আসরের পরবর্তী সময়, আরাফাতের দিন এবং ইফতারের সময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) সেজদার ব্যাপারে বলেছেন ঃ ঐ সময় বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটে থাকে বলে তার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। (মুসলিম)

৪. সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দোয়া করা।

দোয়াকে অনির্দিষ্ট করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা এরূপ বলো না যে, আল্লাহ যদি তুমি চাও, আমাকে মাফ কর। বরং চাওয়াকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।' (মুসলিম)

৫. কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা।

কোন সময় দাঁড়িয়ে সামষ্টিকভাবে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করার কথাও বর্ণিত আছে।

৬. দোয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম।

অজু সহকারে দোয়া করলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করবেন।

৭. দোয়ার মধ্যে এসমে আজম বা আল্লাহর মহান নাম পাঠ।

এ মর্মে আনাস রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসা ছিলাম। তখন একজন লোক নামায পড়ছিল। সে বলল ঃ

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اَسْأَلُكَ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তুমি স্নেহ ও দয়া দানকারী, আসমান ও

জমীনের স্রষ্টা, হে সম্মান ও শ্রদ্ধার মালিক! হে চিরঞ্জীব ও চির অবস্থানকারী। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'সে এস্‌মে আজম সহকারে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে। এস্‌মে আজম সহকারে দোয়া করলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।' (তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

দোয়ায় এস্‌মে আজমের ব্যাপারে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মাছের পেটে থাকা অবস্থায় ইউনুস (আ) নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি জালেমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।'

কোন মুসলমান এই আয়াত পড়ে দোয়া করলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।' (আহমদ, তিরমিযী) এস্‌মে আজম সম্পর্কে আসমা বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিম্নের দুটো আয়াতে আল্লাহর এস্‌মে আজম রয়েছে ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ 'তোমাদের মা'বুদ একজন, আল্লাহ রহমান ও রাহীম ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।' ২য় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ঃ

الم اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ

অর্থ ঃ 'আলিফ লাল মিম, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চির অবস্থানকারী।'

বোরাইদা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ ঃ 'তিনি বলেন, সে আল্লাহর এস্‌মে আজম সহকারে দোয়া করেছে। এইভাবে দোয়া করলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।' (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

৮. দোয়া কবুলের বিষয়ে বিনীতভাবে বারবার আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করা এবং তাঁকে রাজী করানোর জন্য বিভিন্নভাবে ও ভাষায় চেষ্টা করা।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلْحِيْنَ فِى الدُّعَاءِ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ দোয়ায় বারবার অনুনয় বিনয়কারীদেরকে ভালবাসেন।' কেননা এর মাধ্যমে বান্দা নিজের অক্ষমতা, অভাব, ভয়-ভীতি ও চাওয়া-পাওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

৯. দোয়ার সময় দু'হাত উপরে তুলতে হবে।

এটা করা উত্তম। সাহাল বিন সাদ বলেন ঃ নবী (সা) নিজ আঙ্গুল কাঁধ বরাবর তুলে দোয়া করতেন। (বায়হাকী) সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়ার সময় হাত তুলে পরে হাত মুখে মুছতেন। (বায়হাকী)

ইকরামা ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো তুমি দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত কিংবা এর কাছাকাছি উঠাবে, গুনাহ মাফের সময় তুমি তোমার একটি আঙ্গুল (শাহাদাত) দ্বারা ইশারা করবে এবং করুণভাবে কাকুতি-মিনতি করার সময় তুমি তোমার দুই হাত পূর্ণ সম্প্রসারিত করবে। (আবূ দাঊদ)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ দোয়াতে তোমাদের হাত উঠানো বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও বুক থেকে উপরে হাত তোলেননি। (আহমদ)

উবাই বিন কা'ব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কাউকে স্মরণ করে দোয়া করতেন তখন প্রথম নিজের জন্য দোয়া করতেন। (তিরমিযী)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়ার সময় হাত এতটুকু উপরে তুলতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। (বায়হাকী-দাওয়াতে কবীর) দোয়া শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল বুলিয়ে নেয়া ভাল। ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উভয় হাত দোয়ায় প্রসারিত করতেন, তখন মুখমণ্ডলে না বুলিয়ে সরাতেন না।' দোয়ার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ লোকেরা যেন দোয়ার সময় আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি দান না করে। নচেৎ তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া যাবে।

১০. নিম্ন স্বরে দোয়া করা।

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত, একবার আমরা সফর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনায় ফিরে এলাম। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তাকবীর বললেন। লোকেরাও উচ্চস্বরে তাকবীর বললো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে লোকেরা, তোমরা যাকে ডাকছ তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন। বরং তিনি তোমাদের ও তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের মাঝখানে আছেন।

আল্লাহ বলেন, নামায উচ্চস্বরেও না কিংবা চুপিসারেও পড়ো না। আয়েশা (রা) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, দোয়া সশব্দেও করো না এবং একেবারে নিঃশব্দেও না। বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

১১. দোয়ায় ছন্দ মিলানোর চেষ্টা না করা।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দোয়ায় ছন্দের মিল থেকে দূরে থাকো। তোমাদের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট। দোয়ায় কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের ভাব থাকা দরকার। ছন্দ ও কবিতা সেই বিনয়ের পথে বাধা সৃষ্টিকারী।

১২. আগ্রহ ও ভয় সহকারে দোয়া করা।

১৩. উত্তমভাবে দোয়ার শব্দাবলী তিনবার উচ্চারণ করা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলে তিনবার করতেন এবং কোন কিছু চাইলে তিনবার চাইতেন।

১৪. আল্লাহর জিকির দ্বারা দোয়া শুরু করা এবং প্রথমেই কিছু না চাওয়া।

সালমা বিন আকওয়া বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে কখনও এই কালেমা না বলে দোয়া শুরু করতে শুনিনি। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনা করতে চায়, তার উচিত, প্রথমে দরূদ পড়া এবং দরুদ দ্বারা দোয়া শেষ করা। কেননা, আল্লাহ উভয় দরূদ কবুল করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও তখন আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর। আল্লাহর শান এরূপ নয় যে, কেউ তাঁর কাছে দুইটি জিনিস চাইলে একটি পূর্ণ করবেন এবং অপরটি করবেন না।

১৫. তওবা করা।

আওযায়ী বলেন, লোকজন বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলো। তাদের মধ্যে বেলাল বিন সাদ দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ করার পর বললেন, উপস্থিত লোকজন,

তোমরা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার কর কিনা ? সকলেই বললো ঃ নিশ্চয়ই স্বীকার করি। তারপর বেলাল বললেন, ইলাহী! আমরা শুনেছি, তোমার কোরআন বলেছে।

নেক লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করেছি। তোমার ক্ষমা আমাদের মত লোকদের জন্যই। আমাদেরকে ক্ষমা করো, রহম করো এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। তারপর বেলাল হাত তুললেন, লোকেরাও হাত তুলল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

দোয়ার উপকারিতা

দোয়া হচ্ছে এবাদতের মগজ ও সার। বরং হাদীসে দোয়াকে সর্বমহান এবাদত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দোয়ার অনেক উপকারিতা আছে। সেগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং তার প্রতি আস্থা, আশা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সকল এবাদতের এটাই মূল লক্ষ্য।

২. বিলম্বিত কবুল দ্বারা আল্লাহর কাছে বান্দার সওয়াব ও কল্যাণ জমা হয় এবং এটা তার জন্য সওয়াবের সহায়তা হিসেবে কাজে আসে।

৩. দোয়া উপলক্ষে বান্দা শিরক থেকে মুক্ত হয়। নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদাকে মজবুত ও দৃঢ় করতে পারে। এতে করে অন্য মানুষ ও দেবতা থেকে তার প্রত্যাশা দূর হয় এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়া-পাওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

দোয়া না করা হচ্ছে, গর্ব-অহংকার অন্তরের কঠোরতা এবং আল্লাহ বিমুখতার প্রকাশ ও দোজখে প্রবেশের কারণ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থ ঃ 'তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাক আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যারা আমার এবাদত বিমুখ হয়ে গর্ব-অহংকার করে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় দোজখে প্রবেশ করবে।' পক্ষান্তরে দোয়া হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশের উপায়।

১৪শ শিক্ষা

কদরের রাত

কদর শব্দের দুইটি অর্থ আছে। একটি হচ্ছে, ভাগ্য বা তাকদীর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ - فِیْهَا یُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ - (اَلدُّخَانُ : ٤-٣)

অর্থ ঃ 'আমরা এই কোরআনকে এক বরকতময় ও মর্যাদাসম্পন্ন রাত্রে নাযিল করেছি। কারণ আমরা লোকদেরকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। এই রাতে সকল বিজ্ঞ ও হেকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়।' (সূরা আদ দুখান ঃ ৩-৪)

এই আয়াতে রাত বলতে কদরের রাত বুঝানো হয়েছে এবং তাতে আগামী ১ বছরের অধিক রিজিক এবং হায়াত ও মৃত্যুসহ সকল কিছুর ফয়সালা ও পরিকল্পনা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিয়ে মানুষের ভাগ্য ও তাকদীর সম্পর্কে বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিস্তারিত দায়িত্ব অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে।

২য় অর্থ হচ্ছে, মর্যাদা ও সম্মানের রাত্রি। এই রাতের এবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার অনেক বেশী। এই রাত্রের এবাদতকে হাজার মাসের চাইতেও উত্তম বলা হয়েছে। হাজার মাস হচ্ছে ৮৩ বছর ১০ দিনের সমান।

'কি সৌভাগ্যের বিষয় যে এক রাত একজন মানুষের গোটা জীবনের সমান! অর্থাৎ একজন লোক বড় জোর ৮০/৯০ বছর জীবন লাভ করতে পারে। কদরের এক রাতের এবাদত তার গোটা জিন্দেগীর এবাদতের সমান। তাই এ রাতের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন ঃ 'আমরা কদরের রাতে এই কোরআনকে নাযিল করেছি। তুমি কি জান কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম। এই রাতে আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতা ও জিবরীল (আ) দুনিয়ায় সকল কল্যাণকর জিনিস নিয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সারা রাত ব্যাপী শান্তি ও রহমত বিদ্যমান থাকে।' (সূরা কদর)

রাসূলুল্লাহ (সা) আগের উম্মাহর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সে ১ হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় তালোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছে। তিনি নিজ উম্মাহর বয়সের স্বল্পতা অনুভব করায় এই সূরাটি নাযিল হয়। এখানে কদরের রাতকে হাজার মাসের এবাদতের চাইতেও উত্তম বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ 'হাজার' শব্দটিকে কেন নির্দিষ্ট করলেন ? এটা দ্বারা কি হুবহু হাজার মাস বুঝানো হয়েছে না তা কোন প্রতীকী শব্দ। এর জওয়াবে বলা যায় , এটি প্রতীকী শব্দ। আল্লাহ আরব জাতির জ্ঞানের পরিধি মোতাবেক বক্তব্য পেশ করেছেন। আরবরা 'হাজার'কে সর্বশেষ ও সর্বাধিক সংখ্যা মনে করত। তারা বর্তমান যুগের মিলিয়ন ও বিলিয়নের সাথে পরিচিত ছিল না। তাই তারা 'হাজার' সংখ্যাকে শীর্ষ সংখ্যা বিবেচনা করতো। এই প্রেক্ষিতে, আয়াতের অর্থ হলো, কদরের রাত সংখ্যার মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ সংখ্যার চাইতেও উত্তম। তাহলে, এর সঠিক অর্থ দাঁড়ায়, কদরের রাত সকল সময় ও কাল থেকে উত্তম এবং সেই সময় বা কাল যত দীর্ঘই হউক না কেন। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কদরের রাতে পৃথিবীতে ফেরেশতার সংখ্যা পাথর কণার চাইতেও বেশী হয়ে থাকে। ফলে জমীনে শয়তানের রাজত্ব বাতিল হয়ে যায় এবং সেই রাতে লোকেরা শয়তানের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।'

কদরের রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ সূরায় এটি বছরের কোন মাসে তা বলা হয়নি। এটি কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ রযমান মাসেই কোরআন নাযিল করা হয়েছে, তাতে রয়েছে মানুষের হেদায়াত এবং এর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ। এটি হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। (সূরা বাকারা-১৮৪)

কদরের রাত ভাগ্য ও মর্যাদার রাত। তাই সকল মুসলমানের কাছে এর গুরুত্ব সর্বাধিক।

কদর রাতের ফযীলত

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থ ঃ 'যে কদরের রাত্রে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে নামায পড়ে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' (বোখারী, মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'ভবিষ্যতের সকল গুনাহও মাফ করে দেয়া হয়।'

ওবাদাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَهَا ابْتِغَاءَهَا ثُمَّ وَقَعَتْ لَه غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ -

অর্থ ঃ 'যে কদরের রাত্রের অন্বেষণে সেই রাতে নামায পড়ে এবং তা পেয়ে যায়, তার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' (নাসাঈ)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রমযানের শেষ দশক শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (সা) কদরের রাত লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং নিজ পরিবারকে জাগাতেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের শেষ দশকে এত বেশী পরিশ্রম ও এবাদত করতেন যা অন্য সময় করতেন না। তিনি রমযানের শেষ দশককে এমন কিছু নেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট করতেন যা মাসের অবশিষ্টাংশের জন্য করতেন না। এর মধ্যে রাত্রি জাগরণ অন্যতম।' (মুসলিম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) ২০শে রমযান পর্যন্ত রাত্রে নামায ও ঘুমকে একত্রিত করতেন। কিন্তু রমযানের শেষ দশকে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন এবং নিজ স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন। (মোসনাদে আহমদ)

অন্যদিকে, তিনি রমযানের শেষ দশকে ঘুমাতেন না। কঠোর ও লাগাতার এবাদতে মশগুল থাকতেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বিছানা উঠিয়ে ফেলতেন, নিজ স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন এবং ভোর রাত্রে সেহরীর সময় সন্ধ্যাবেলার খাবার খেতেন। (তাবারানী)

অর্থাৎ তিনি এক বেলা খেতেন এবং ভোর রাত্রে ইফতার ও সেহরী এক সাথে করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, অব্যাহত রোযা রাখার ব্যাপারে তোমরা কেউ আমার সমকক্ষ হতে পার না। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদ্য ও পানীয় দেয়া হয়। তবে তিনি উম্মতের জন্য অব্যাহত রোযা নিষিদ্ধ করেছেন। তাই তিনি সূর্যাস্তের পর ইফতার করা ও ভোররাত্রে সোবহে সাদেকের আগে সেহরী খাওয়ার সুন্নত চালু করে গেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা যে জিনিষটি প্রমাণিত হয় সেটা হচ্ছে, কদরের রাত লাভ করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এক মিনিট সময়ও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

কদরের রাতের করণীয়

কদরের রাত্রের মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিবগুলো পালন করতে হবে এবং অন্যান্য সুন্নত, নফল ও মোস্তাহাব কাজগুলো আদায় করতে হবে। এর মধ্যে মাগরিব ও এশার নামায জামাআতে আদায় করতে হবে এবং তারাবী, তাহাজ্জুদ, বিতর, কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, তাওবা এস্তেগফার ও দোয়া করতে হবে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে এবং পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবাদত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ فِىْ جَمَاعَةٍ فِى رَمَضَانَ فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ -

অর্থ ঃ 'যে রমযানে এশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে সে কদরের রাতের ফযীলত লাভ করে।' (আবুশ শেখ ইসপাহানী)

আমাদের পরিবার-পরিজনকেও রাত্রে জাগাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের শেষ দশকে নিজ পরিবারকে জাগাতেন। তিনি নামায পড়ার জন্য হযরত আলী (রা) এবং ফাতেমা (রা)-কে জাগাতেন যেন তারাও এবাদত করে। তিনি তাহাজ্জুদ শেষে বিতর পড়ার আগে আয়েশা (রা)-কেও জাগাতেন।

আরেক মোরসাল হাদীসে এসেছে, আবু জাফর মোহাম্মদ বিন আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কোন সুস্থ্য মুসলমানের কাছে রমযান উপস্থিত হলে সে যদি রোযা রাখে, রাত্রের এক অংশে নামায পড়ে, নিজ চোখ অবনত রাখে, হাত পা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, জামাআত সহকারে নামায পড়ে এবং জুম'আর নামাযে তাড়াতাড়ি হাজির হয়, তাহলে সে রমযানের রোযা রেখেছে, পূর্ণ পারিশ্রমিক পেয়েছে, কদরের রাত পেয়েছে এবং আল্লাহর পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছে।[১]

অবশ্য হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ কদরের রাত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর দিকে তাকান এবং তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করেন। তবে চার ব্যক্তি এ দয়ার আওতায় পড়ে না।[২]

১. মদ পানকারী, ২. মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী, ৩. হিংসুক-নিন্দুক, এবং ৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

---

১. ওজায়েফ শাহার রামাদান আল মোয়াজ্জাম– হাফেজ ইবনে রজব। ২. প্রাগুক্ত।

শরীয়তসম্মত ওজর আপত্তির কারণে যারা কদরের রাতে এবাদত করতে পারেনি তারাও সওয়াব পাবে বলে আল্লামা দাহ্হাক মন্তব্য করেছেন। তিনি যে সকল মহিলার হায়েজ নেফাস হয়েছে কিংবা মুসাফির অথবা যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারেনি তাদের সওয়াবের ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ যাদের আমল কবুল করেন, তাদেরকে কদর রাত থেকে তাদের অংশ দান করবেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'রমযানে এমন এক রাত আছে যার এবাদত হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। যে এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে অবশ্য বঞ্চিতের কাতারে আছে।' (নাসাঈ ও মুসনাদ)

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত, কদরের রাত্রে কি দোয়া পড়া উচিত এ মর্মে আয়েশা (রা)-এর এক প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'এই দোয়া পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ কর। সুতরাং আমাকে ক্ষমা ও মাফ করে দাও।'

সময় ও দেশ ভেদে কদরের রাত্রি

ঊর্ধ্ব জগতে সময় এক ও অভিন্ন। সেখানে সবই বর্তমান কাল। আল্লাহর কাছে অতীত ও ভবিষ্যত কাল বলতে কিছু নেই, সবই বর্তমান। পক্ষান্তরে পৃথিবীর মানুষের কাছে কাল তিন প্রকার। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। তাই কালের ও ভৌগোলিক পার্থক্য কদরের রাত্রের মূল সময়ের বিরুদ্ধে কোন বাধা নয়। কদরের রাত মূল সময়ের সূতার সাথে গাঁথা। তাই যে ভূখণ্ডে যখন কদরের রাত উপনীত হয়, সে ভূখণ্ডে আল্লাহ্ কদরের মর্যাদা বিতরণ করেন। এতে ভৌগোলিক পার্থক্য সূচিত হলেও মূল সময়ের কোন পার্থক্য হয় না। কেননা সময় এক ও অবিভাজ্য।

এই কারণে বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক পার্থক্যের দরুন লাইলাতুল কদর বিভিন্ন সময়ে উপনীত হতে পারে এবং মুসলমানরা নির্দ্বিধায় এর ফজীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন। এমনকি গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা যদি একই দিন ধর্মীয় দিবসগুলো পালন করে এবং মক্কা শরীফের চাঁদের তারিখ অনুসরণ করে তাহলেও কদরের রাত্রের মর্যাদা লাভের পথে কোন বাধা নেই। কেননা, আল্লাহ্ মূল সময়ের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে সেই মর্যাদা দান করবেন। উল্লেখ্য যে, জেদ্দা ভিত্তিক 'ইসলামী ফেকাহ্ একাডেমী' এই মর্মে একটি ফতোয়া জারি করে বলেছেন ঃ দুনিয়ার সকল দেশে একই দিনে মুসলমানরা ধর্মীয় দিবসগুলো পালন করতে পারে। যেমন, আশুরা, রমযান, লাইলাতুল কদর এবং দুই ঈদ।

কদরের রাত নির্ধারণ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানের মাঝের দশকে এতেকাফ করেছেন। একবার ২১শে রমযানের সকালে তাঁর এতেকাফ থেকে বের হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি বের হয়ে বললেন, যারা আমার সাথে রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতে চায় তারা যেন তা করে। আমি স্বপ্নে কদরের সুনির্দিষ্ট রাত দেখেছি এবং পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, কদরের রাত্রের পরবর্তী ভোরে আমি পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করছি, তোমরা রমযানের শেষ দশকে কদরের রাত তালাশ করো এবং প্রত্যেক বেজোড় রাত্রে তা অন্বেষণ করো। সেই (একুশে রমযানের) রাত্রেই বৃষ্টি হয়। মসজিদের চাল ছিল খেজুর পাতা ও শাখা দ্বারা তৈরি। চাল থেকে পানি পড়ে মসজিদ কর্দমাক্ত হয়ে যায়। আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কপালে ২১শে রমযানের সকালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।' (বোখারী ও মুসলিম)

নবীর স্বপ্ন অহী এবং তা অবশ্যই সত্য। তাই স্বপ্নের লক্ষণ মোতাবেক ২১শে রমযানেই কদরের রাত সংঘটিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা ১৭ই রমযান, ২১শে রমযান এবং ২৩শে রমযানে কদরের রাত তালাশ কর। এরপর তিনি চুপ রইলেন।' (আবূ দাঊদ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯শে রযমানে কদরের রাত তালাশ করো।' (তাবারানী)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রযমানের শেষ ৭ দিনে কদরের রাতকে স্বপ্নে দেখেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমিও তোমাদের মতো রমযানের শেষ ৭ দিনের মধ্যে কদরের রাতকে স্বপ্নে দেখেছি। কেউ কদরের রাত তালাশ করতে চাইলে সে যেন শেষ ৭ দিনের মধ্যে তা করে।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা রমযানের শেষ দশকে কদরের রাত তালাশ করো। তোমাদের কেউ যদি দুর্বল ও অক্ষম হয় তা যেন শেষ ৭ দিনের উপর প্রভাব বিস্তার না করে।' (মুসিলম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা রমযানের শেষ দশকে কদরের রাত তালাশ করো।' (বোখারী ও মুসলিম) বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে ঃ 'শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে কদরের রাত অন্বেষণ করো।' আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের ২৯, ২৭ ও ২৫ তারিখে কদরের রাত তালাশ করো।' (বোখারী)

আবুজার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে কদরের রাত সম্পর্কে (অতিরিক্ত কিছু) জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করিনি ? আল্লাহ যদি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে জানানোর জন্য আমাকে অনুমতি দেন, আমি অবশ্যই তা জানাবো। আমার বিশ্বাস যে তা রমযানের শেষ ৭ দিনের মধ্যে নিহিত আছে। (ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কদরের রাত্রের ভোরে পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করছি। তিনি ২৩শে রমযানের ভোরে নামায শেষে প্রত্যাবর্তন করলে তার কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখা যায়। (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন বৃদ্ধ ও অসুস্থ্য ব্যক্তি। আমার জন্য রাত্রের নামায খুব কষ্টকর। আমাকে এমন এক রাতের আদেশ দিন যে রাত হবে কদরের রাত। তিনি বলেন, তুমি ২৭শে রমযানের রাতকে আঁকড়ে ধরো।' (মুসনাদে আহমদ) ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কদরের রাত তালাশ করে সে যেন ২৭শে রমযানে তা তালাশ করে। (আহমদ)

কেউ কেউ বলেছেন ঃ সূরা কদরে মোট ৩০টি শব্দ আছে।

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

هِيَ -এর মধ্যে ২৭তম শব্দ। অর্থ ঃ সেটি কদরের রাত। আবার কেউ কেউ বলেছেন - اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - এই আয়াতটি সূরা কদরে ৩ বার এসেছে। প্রতি আয়াতে ৯টা করে অক্ষর আছে। ফলে ৩×৯=২৭ হচ্ছে কদরের রাত। এটা হচ্ছে, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কদরের রাতটি রহস্যময়। আল্লাহ প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা জানিয়ে দেন এবং পরে আবার তাকে ভুলিয়ে দেন। এটি গোপন রাখার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানগণ যেন তা লাভ করার জন্য যারপর নাই চেষ্টা সাধনা করেন।

ওবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কদরের রাত সম্পর্কে বলতে বের হন। তখন মসজিদে দুইজন লোক ঝগড়া করছিল। এর ফলে আল্লাহ তাঁর অন্তর থেকে কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখটি মুছে দেন। ফলে তিনি তারিখটি ভুলে যান। (বোখারী) ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কদরের রাত্রের বিষয়ে বিরাট

মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে আল্লামা শাওকানী আল ফাতাহ কিতাবের বহু বক্তব্য থেকে ৪৫টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

এক মত অনুযায়ী প্রতি বছর রমযানে ভিন্ন ভিন্ন রাতে কদর আসে। অর্থাৎ প্রতি বছর একই রাত বা নির্দিষ্ট তারিখে আসে না। এটি ইমাম মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক বিন রাহওয়াইর মত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ২১শে রমযান হচ্ছে অগ্রাধিকারযোগ্য।

ইবনে মাসউদের বর্ণনা অনুযায়ী ২য় মত হচ্ছে এটি রমযান কিংবা বছরের যে কোন রাত হতে পারে। হাদীসে এর কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ নেই। এটি ইমাম হানিফার মত। আল্লামা সাবকী এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৩য় মত হচ্ছে, এটি রমযানের দ্বিতীয়ার্ধে। এটি ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের মত। ৪র্থ মত হচ্ছে বদরের রাতেই কদরের রাত হয়। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ তা ১৭ই রমযান। আবার অন্য কেউ বলেছেন ১৯শে রমযান।

তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ দশকে। হাসান বসরী ও ইমাম মালেক বলেছেন, শেষ দশকের প্রতি রাত্রেই লাইলাতুল কদর তালাশ করতে হবে। জোড় বেজোড় সকল রাত্রিই সমান। মাস ৩০ দিনে হলে, বেজোড় রাত্রিতে তালাশ করতে হবে। কিন্তু মাস ২৯ দিনে হলে জোড় রাত্রিগুলো থেকে বিশ পর্যন্ত ১০ দিন হিসেব করতে হবে। তখন জোড় রাত্রে কদর হবে। মাস ৩০ হবে না ২৯ হবে তা অগ্রিম জানার উপায় নেই। তাই সকল রাত্রেই কদর তালাশ করতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ওলামা জোড় রাত্রের চাইতে বেজোড় রাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন, বেজোড় রাত্রেই কদর তালাশ করা দরকার। ২১ ও ২৩শে রমযানে কদরের আগমন সম্পর্কে দুটো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও বেজোড়। তবে ২৭শে রমযানে কদরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এছাড়াও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বেজোড় রাত্রে কদর তালাশ করার কথা বলা হয়েছে।

সকল বর্ণনা ও মতভেদগুলোকে সামনে রেখে ২টা ভিত্তি গ্রহণ করলে কিছুটা সুরাহা হয়। প্রথমটা হচ্ছে, লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশকে। কদরের অন্বেষণেই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম প্রথম রমযানের ১লা দশকে ও পরে ২য় দশকে এতেকাফ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি স্থায়ীভাবে শেষ দশকে এতেকাফ করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কদর শেষ দশকে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, শেষ দশকে প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন দিনে কদর হয়। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে কদর অন্বেষণের

বিষয়ে রাসূলুল্লাহর হাদীসগুলোর একটা সমন্বয় সাধন করা যায়। যেহেতু, হাদীসে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর তালাশ করা এবং তা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ আছে।

কদর রাত্রির আলামত প্রসঙ্গে ওবাদাহ্ বিন সামেত (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঐ রাতে আকাশ থেকে কোন উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় না। এর আরো লক্ষণ হলো, ঐদিন ভোরে সূর্যের আলো প্রখর থাকে না। বরং পূর্ণিমার চাঁদের মতো স্নিগ্ধ আলো থাকে। ঐদিন শয়তানের বের হওয়ার অনুমতি নেই।' (মুসনাদে আহমদ)

তাবারানী ওয়াসেলা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সুয়ূতি এটাকে উত্তম হাদীস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কদরের রাত আলোকোজ্জ্বল থাকে এবং না ঠাণ্ডা না গরম। ঐ রাতে আকাশে কোন মেঘ থাকে না এবং ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয় না। আকাশ থেকে কোন উল্কাপিণ্ড পড়ে না এবং সকাল বেলায় সূর্যের আলোর তেজ থাকে না।

শাফেঈ মাযহাবের মতে, কদরের রাতে গম ও ঠাণ্ডা কোনটাই থাকবে না। সকাল বেলায় সাদা সূর্য উদিত হবে এবং তার আলো বেশী থাকবে না। সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত ঐ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে। এর রহস্য হলো, অধিক পরিমাণ ফেরেশতার উঠা-নামার কারণে সূর্যের আলোক রশ্মির উপর তাদের সূক্ষ্ম দেহ ও পাখার ছায়া পড়ে। রাত শেষে কদরের ঐ লক্ষণ জানার ফায়দা হচ্ছে, দিনেও বেশী বেশী এবাদত করা এবং তা সুন্নাহ। আগামী বছরও কদরকে এই রাত অপরিবর্তনীয় মনে করে এবাদত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

যাহরাহ্ বিন মা'বাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি শত্রুর ভূখণ্ডে ছিলাম। তখন আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমি ২৩শে রমযানে সাগরে অবস্থান করছিলাম। আমি গোসল করতে গিয়ে সাগরে পড়ে যাই। তখন দেখি পানি মিষ্টি। আমি আমার সাথীদেরকে জানাই যে, আমি মিষ্টি পানির মধ্যে আছি।'[১] সাগরের পানি সর্বদা লবণাক্ত থাকে। কিন্তু কদরের উসিলায় আল্লাহ সেদিন তা মিষ্টি পানিতে রূপান্তর করে দিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন ঃ মদীনাবাসীদের কাছে ঐ রাত 'জোহানী রাত' নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ্ বিন উমাইস জোহানীকে ঐ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কদরের রাতের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ পূর্ব থেকে জানার উপায় নেই। তাই মোমিনকে তা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে ও পেরেশানীর সাথে অপেক্ষা করতে হবে।

---

১. ওজায়েফ শাহার রামাদান আল মোয়াজ্জাম– হাফেজ ইবনে রজব।

১৫শ শিক্ষা

এতেকাফ

এতেকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা এবং এর উপর নিজ সত্তা ও আত্মাকে আটকে রাখা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মসজিদে বাস ও অবস্থান করা। সকল সময় এতেকাফ জায়েয। তবে রমযান মাসে উত্তম এবং রমযানের শেষ দশকে কদরের উদ্দেশ্যে তা সর্বোত্তম।

এতেকাফ এমন এক বৈধ নির্জনতা যেখানে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত, জিকির ও আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নিজের আত্মা ও সত্তাকে একান্তভাবে নিয়োজিত করে এবং নামায, রোযা, কোরআন তেলাওয়াত, ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখে। একই কারণে তিনি দুনিয়ার সকল কাজ ও ব্যস্ততা থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দূরে থাকেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথে যেন কোন দুনিয়াবী চিন্তা ও কাজ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। এতেকাফ কিছুতেই বৈরাগ্যবাদ নয়। বৈরাগ্যবাদ স্থায়ী জিনিস আর এতেকাফ হচ্ছে সাময়িক।

এতেকাফের হেকমত

আল্লামা হাফেজ ইবনে রজব বলেছেন ঃ 'এতেকাফের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা। আল্লাহর সাথে পরিচয় যত গভীর হবে, সম্পর্ক ও ভালবাসা ততো গভীর হবে এবং তা বান্দাকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে।'[১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে যাত্রা অব্যাহত রাখা নির্ভর করে যোগ্য ও সঠিক মনের উপর। মন শতধা বিচ্ছিন্ন থাকলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সে জন্যই মনকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করা দরকার। অথচ অতিরিক্ত পানাহার, মানুষের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা, বেহুদা ও বেশী কথাবার্তা এবং অতিরিক্ত ঘুম মনকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে রাখে এবং ব্যক্তিকে

---

১. লাতায়েফুল মা'আরেফ।

সকল উপত্যকায় বিচরণ করায়। সে জন্য আল্লাহর পথে যাত্রা বাধা প্রাপ্ত হয় কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মেহেরবান আল্লাহ রোযার মাধ্যমে অতিরিক্ত পানাহার ও যৌন কামনাকে রোযার বিধানের মাধ্যমে দূর করার ব্যবস্থা করেছেন। আর এতেকাফের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ব্যাপারে মন নিবিষ্ট করা, তাঁর সাথে নির্জনে বাস করা এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি থেকে দূরে অবস্থান করা যাতে করে তার চিন্তা ও ভালবাসা মনে স্থান করে নিতে পারে।

এতেকাফের ফযীলত

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَه وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ كُلَّ خَنْدَقٍ اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি ও দোজখের মধ্যে ৩ খন্দক পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করেন।' (তাবারানী ও হাকেম) প্রত্যেক খন্দক পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চাইতে আরো বহুদূর।'

আলী বিন হোসাইন নিজ পিতা থেকে র্বননা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِيْ رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ.

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি রমযানে ১০ দিন এতেকাফ করে, তা দুই হজ্জ ও দুই ওমরার সওয়াবের সমান।' (বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এতেকাফকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'এতেকাফকারী গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাকে সকল নেক কাজের কর্মী বিবেচনা করে বহু সওয়াব দেয়া হবে।' (ইবনে মাজাহ)

এতেকাফের হুকুম

এতেকাফ সুন্নত। রমযানের শেষ দশ রাত্রে কদরের রাত্রির অন্বেষণে এতেকাফ করার বিধান চালু হয়েছে। কিন্তু এতেকাফের মান্নত করলে তা পালন করা ওয়াজিব হবে। রমযান ছাড়াও যে কোন সময় মসজিদে অনির্ধারিত সময় ব্যাপী এতেকাফ করা যায়। পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আমার ঘরকে তাওয়াফ ও এতেকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।' কোরআনেও এতেকাফের গুরুত্বের উল্লেখ আছে।

এতেকাফ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানে ১০ দিন এতেকাফ করতেন কিন্তু ইন্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন এতেকাফ করেন।' (বোখারী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) আমৃত্যু রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

এতেকাফের মান্নত করে তা আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দুইটি হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ.

অর্থ ঃ 'কারুর মান্নত যদি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য হয়, তা যেন পূরণ করা হয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করেন, আমি জাহেলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার নিয়ত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার মান্নত পূরণ করো।'

এতেকাফের শর্ত

১. মুসলমান হওয়া

২. পাগল না হওয়া

৩. বালেগ হওয়া

৪. নিয়ত করা

৫. ফরজ গোসলসহ হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া

৬. মসজিদে এতেকাফ করা।

জামে মসজিদে এতেকাফ করা উত্তম। এটা ইমাম মালেকের মত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে, 'যে মসজিদে জামাআত সহকারে নামায হয় না, সে মসজিদে এতেকাফ জায়েয নেই।' আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ.

'যে মসজিদে জামাআত হয় সে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না।' (আবূ দাউদ) হযরত হোজাইফা ও ইবনুল মোসাইয়েব বলেছেন, তিন মসজিদ ছাড়া এতেকাফ জায়েয নেই। সেগুলো হচ্ছে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা। আতা বিন আবি রেবাহর মতে, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী ছাড়া এতেকাফ বিশুদ্ধ হবে না।

৭. রোযা রাখা। তবে রোযার শর্তের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে রোযা ছাড়া এতেকাফ জায়েয আছে। ইমাম আহমদের মতও তাই। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে, রোযা ছাড়া এতেকাফ জায়েয নেই। ইমাম আহমদের মতও তাই। (ওজায়েফ শাহরি রামাদাল আল- মোআজ্জাম– হাফেজ ইবনে রজব)

মসজিদে এতেকাফের শর্ত এ জন্য যেন নামাযের জামাআত হারিয়ে না যায়। ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে, রাত্রে তারাবীর নামায পড়ে, তবে জামাআতে নামায আদায় করে না এবং জুম'আর নামায পড়ে না। তিনি উত্তরে বললেন, সে জাহান্নামে যাবে।

মূলকথা, এতেকাফ যত নির্জন হয় এবং লোকজনের সাথে মেলামেশা যত কম হয় ততই ভাল। এতেকাফকারী আল্লাহর কাছে নীরবে একাকী দোয়া ও কান্নাকাটি করবে এবং এবাদত করবে। সে জন্য ইমাম আহমদ বলেছেন ঃ এতেকাফের সময় কাউকে এলেম ও কোরআন শিক্ষা না দেয়াই উত্তম।

এতেকাফের মোস্তাহাব বিষয়

১. বেশী বেশী নামায পড়া, কোরআন তেলাওয়াত, অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ তাফসীর পড়া এবং ইসলামী সাহিত্য ও বই পুস্তক পড়া, অর্থাৎ দ্বীনী এলেম অর্জন করা।

২. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। ঝগড়া ঝাটি এবং গাল-মন্দ না করা।

৩. মসজিদের একটি অংশে অবস্থান করা।

নাফে (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'আবদুল্লাহ বিন ওমর আমাকে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহর (সা) এতেকাফের সুনির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়েছেন।' (মুসলিম)

এতেকাফকারীর জন্য যা যা করা জায়েয

১. জরুরী কাজের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এতেকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযায় অংশ গ্রহণ না করা, স্ত্রী স্পর্শ না করা এবং সহবাস না করা এবং খুব বেশী প্রয়োজন না হলে মসজিদ থেকে বের না হওয়া। (আবূ দাঊদ)

২. মসজিদে পানাহার ও ঘুমানো। তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৩. জায়েয কথা বলা ও প্রয়োজন হলে অন্যের সাথে কথা বলা।

৪. চুলের সিঁথি কাটা, নখ কাটা, শরীর পরিষ্কার করা, ভাল কাপড় পরা এবং সুগন্ধ মাখা। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে এতেকাফ করতেন। তিনি হুজরার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আমি মাথায় সিঁথি করে দিতাম।' (বোখারী ও মুসলিম)

৫. নিজ পরিবারের লোকদেরকে বিদায় জানানোর জন্য বের হওয়া। হযরত সফিয়া থেকে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ ঘটনা জানা যায়।

এতেকাফকারীর জন্য যা মাকরূহ

১. বেচাকেনা,

২. যে কথায় গুনাহ হয়,

৩. চুপ থাকাকে এবাদত মনে করে কোন কথা না বলা।

যেসব কাজ দ্বারা এতেকাফ ভঙ্গ হয়

১. বিনা কাজে স্বেচ্ছায় অল্প সময়ের জন্য হলেও মসজিদ থেকে বের হওয়া।

২. সহবাস করা, আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ.

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করো না যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফে থাকো।' (সূরা বাকারা-১৮৭)

৩. পাগল হওয়া,

৪. স্ত্রীলোকের হায়েজ-নেফাস হওয়া,

৫. ধর্মত্যাগী (মোরতাদ) হওয়া।

এতেকাফে প্রবেশ ও তা শেষ হওয়ার সময়কাল

কোন ব্যক্তি এতেকাফের নিয়তে যে সময় মসজিদে প্রবেশ করবে সেটাই তার এতেকাফের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। এরপর যখন শেষ করার নিয়তে বের হয়ে পড়বে তখনই এতেকাফ শেষ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ রমযানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ করতে চাইলে সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং রমযানের সবশেষ দিন সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবে।

বিবিধ বিষয়

১. সুন্নত এতেকাফ শুরু করার পর তা কোন কারণে পূর্ণ করতে না পারলে পরবর্তীতে কাজা আদায় করা উত্তম। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) শাওয়াল মাসে তা কাযা করেন।

২. মহিলাদের এতেকাফের স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঘরে এতেকাফ করাই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদে নিরাপদ হলে সেখানেও এতেকাফ করা যায়। তবে শর্ত হলো, স্বামীর অনুমতি নিয়ে এতেকাফে বসতে হবে। বিনা অনুমতিতে বসলে স্ত্রীকে এতেকাফ থেকে সরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর আছে।

যারা মসজিদ ছাড়া এতেকাফ করা জায়েয নেই বলেন, তাদের যুক্তি হলো ঃ আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেন,

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ.

'তোমরা মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করো না।' (সূরা বাকারা-১৮৭)

এ আয়াতে মসজিদেই কেবল এতেকাফের কথা বলা হয়েছে। ঘরকে মসজিদ বলা হয় না। তাই মহিলারা ঘরে এতেকাফ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। নারী হোক আর পুরুষ হোক, সকলেরই মসজিদে এতেকাফ করা উচিত। তাই নবী পত্নীরাও মসজিদেই এতেকাফ করেছেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে মসজিদে জামাআতে নামায অনুষ্ঠিত হয় না, সে মসজিদেও মহিলারা এতেকাফ করতে পারবে।

রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ স্ত্রীদেরকে জাগাতেন এবং রাত্রি জাগরণে সাথে অংশগ্রহণ করাতেন। তিনি যখন মসজিদে এতেকাফ করেন তখন তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে বেশী বেশী দেখতে আসেন ও উৎসাহ দেন। এমনকি কদরের বরকত লাভের জন্য কখনও কখনও তাঁরা এতেকাফ করেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তারা তাঁর সাথে মসজিদে এতেকাফের বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তখন তিনি তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকারের আশংকা করেন এবং একবার মসজিদ থেকে তাদের এতেকাফের তাঁবু সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন। তারপর তাঁর স্ত্রীরাও এতেকাফ করতেন। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, তিনি এতেকাফ করার জন্য মসজিদে তাঁবু টানানোর নির্দেশ দেন। তাঁবু নির্মাণ করা হলো। তাঁর স্ত্রী যয়নবসহ অন্যান্য স্ত্রীরাও তাঁবু টানানোর নির্দেশ দেন। ফজরের সময় তিনি এতো তাঁবু দেখে বললেন, কল্যাণ নেমে এসেছে। তারপর তিনি তাঁবুগুলো সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজেও সেই বছর রমযানে এতেকাফ ছেড়ে দেন ও শাওয়াল মাসের প্রথম ১০ দিন এতেকাফ করেন। (মুসলিম)

ইমাম নওয়ী কাদী আয়াজের বরাত দিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আশংকা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাঁর নৈকট্য লাভ করতে চান। ফলে তাঁকে মসজিদে থাকা সত্ত্বেও যেন নিজ ঘরের পরিবেশে থাকতে হবে। অথচ পরিবার পরিজন থেকে দূরে নিরিবিল পরিবেশে এবাদত করার জন্যই এতেকাফ করতে হয়। ইমাম নওয়ী বলেন, মহিলাদের এতেকাফের পক্ষে এই হাদীস একটি প্রমাণ। যদিও সাময়িক কারণে তা বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে তা বন্ধ করা হয়নি।

এতেকাফের বিরাট সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করার জন্য সবারই সচেষ্ট হওয়া দরকার। বিশেষ করে তা মসজিদে, রমযানে এবং রমযানের শেষ দশকে হওয়ার কারণে এর মর্যাদা বহু বহু গুণ বেশী।

১৬শ শিক্ষা

রমযান কোরআনের মাস

কোরআন হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর নাযিলকৃত আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব ও বিধান। কোরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ। এর মাধ্যমেই তিনি মানুষকে আইন ও জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই, আল্লাহর জমীনে কোরআন যে মাসে নাযিল হয়েছে সে মাসটিও সর্বাধিক মূল্যবান মাস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অর্থ ঃ 'রমযান মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে রয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াত এবং পথ চলার নির্দেশিকা ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ।' (সূরা বাকারা-১৮৫)

এই আয়াতে রমযান মাসে কোরআন নাযিল করার কথা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, এ হচ্ছে মানুষের জীবন বিধান ও পথ চলার নির্দেশিকা। কোরআন না পড়ে কিংবা না বুঝে একে শুধু চুমু খেলে অথবা সুন্দর গেলাফ পরিয়ে ভাল তাকে সাজিয়ে রেখে দিলে হেদায়াত পাওয়া যাবে না। কোরআনকে বুঝতে হবে এবং তা থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান খুঁজে নিতে হবে।

সূরা কদরে বলা হয়েছে ঃ 'আমি এই কোরআন কদরের রাত্রে নাযিল করেছি।' আর কদরের রাত হচ্ছে রমযান মাসে। ওবায়েদ বিন ওমাইর (রা) থেকে বর্ণিত, 'হেরা গুহায় যেদিন প্রথম কোরআন নাযিল হয় সেদিন এবং মাসটিও ছিল রমযান।'

বোখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ 'জিবরীল (আ) রমযান মাসে প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোরআন শিক্ষা দিতেন।' হযরত ফাতেমা (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে ঃ 'হযরত জিবরীল (আ) প্রতি বছর রমযানে একবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কোরআন অবতীর্ণ করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর দুইবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কোরআন পেশ করেন।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রমযানের কদরের রাত্রে কোরআন নাযিল করার অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহর ২৩ বছরের নবুওতের জিন্দেগীর বিভিন্ন সময়ে কোরআন নাযিল হয়েছে বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আয়াতের শানে নজুল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দু'টি মত রয়েছে। একটি হচ্ছে, ইবনে আব্বাসের মত। তিনি বলেন, কোরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকে কদরের রাত্রে দুনিয়ার আসমানে পূর্ণ কোরআন নাযিল করা হয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মোতাবেক আয়াত ও সূরা নাযিল হয়েছে। অন্য মত হচ্ছে, প্রতি রমযানের কদরের রাত্রে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পুরো কোরআন নাযিল করেন এবং তাঁর ইন্তেকালের বছর এরকম ২ বার করেন। উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরে কোরআনকে বদ্ধমূল করে দেয়া। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মোতাবেক সূরা ও আয়াত নাযিল করা হতো।

যাই হোক, সর্বাবস্থায় দেখা যায়, রমযান হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মাসে ভাল করে কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেন, কোরআনের শিক্ষা ও এর আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ করতেন এবং কোরআন নিয়ে সর্বাধিক ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কোরআন মুখস্থ করতেন ও মুখস্থ করা অংশ পুনরায় পড়তেন এবং স্মরণ শক্তিকে তাজা রাখতেন। জিবরীল (আ) রাত্রে কোরআন শিক্ষা দিতেন এবং কদরের দিনের পরিবর্তে রাত্রে কোরআন নাযিল হওয়ার কারণ হলো, রাত্রে সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল পরিবেশে একাগ্রচিত্তে কোরআন পড়া, চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ ও গবেষণা করা বেশী সুবিধাজনক। দিনে সেই সুবিধা নেই।

কোরআনের কারণে যেমন রমযানের মর্যাদা, তেমনি অন্যান্য কয়েকটা আসমানী কিতাবও এই রমযান মাসেই নাযিল হয়েছে, এদিক থেকে রমযানের মর্যাদার উৎস একাধিক।

মুসনাদে ওয়াসেল বিন আসকা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ রমযানের ১ম রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা, ৬ই রমযান হযরত মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত, ১৩ই রমযান হযরত ঈসা (আ)-এর ইঞ্জিল এবং ২৪শে রমযান (দিবাগত রাত) কোরআন নাযিল হয়েছে।' কথিত আছে যে, ১৮ই রমযান হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট যাবুর কিতাব নাযিল হয়েছে।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবুজার গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা

রমযানে, তাওরাত ৬ই রমযানে, ইঞ্জিল ১৩ই রমযানে, যবুর ১৮ই রমযানে এবং কোরআন ২০শে রমযানে নাযিল হয়েছে। (মাজহারী)

এই রমযান মাসেই অতীতের উম্মতগুলোর কাছেও আল্লাহর হেদায়াতের বাণী এসেছিল। এদিক থেকে রমযান হচ্ছে, মহা কল্যাণ, পুরস্কার ও হেদায়াতে ভরা মওসুম। তাইতো রমযানে কোরআন পড়া ও শেখা আরো বেশী উত্তম। কোরআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِقْرَءُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা কোরআন পড়। হাশরের দিন কোরআন নিজ সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

হযরত ওবাদাহ বিন সামেত থেকে বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদীসের এক অংশে বলা হয়েছে ঃ 'কোরআন কবরে তার সাথীর কাছে এসে বলবে, আমি তোমাকে রাত্রি জাগরণ ও দিনে পিপাসার্ত রেখেছি, তোমাকে যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রেখেছি এবং তোমার কান ও চোখকে সংযত রেখেছি। সুতরাং এখন তুমি আমাকে তোমার সত্যিকার বন্ধু হিসেবে পাবে। তারপর কোরআন উপরে উঠবে এবং বিছানা ও চাদর কামনা করবে। তখন তাকে বেহেশতের বিছানা, বাতি ও ইয়াসমিন ফুল দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর কেবলার দিকে কোরআনকে ধাক্কা দিয়ে আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু পর্যন্ত কবরকে সম্প্রসারিত করবেন।'[১]

উপরে বর্ণিত আলোচনায় দেখা যায়, রমযানের সাথে কোরআনের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কোরআন ও রমযান যেন একাকার হয়ে আছে। মূলতঃ এর প্রয়োজনও আছে। কেননা, এমন একটি পবিত্র ও নেক মওসুম ছাড়া এ মহান গ্রন্থ পড়া ও বুঝার জন্য এতো নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া যাবে না।

আমরা কোরআন পড়া বলতে বুঝি শুধু তেলাওয়াত করা। অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার কোন প্রয়োজন অনুভব করি না। অথচ সাধারণ যুক্তিতেও দেখা যায় যে, আমরা যে কোন ভাষায় কোন কিছু পড়ি তা বুঝার জন্যই পড়ি। না বুঝার জন্য কেউ কোন কিছু পড়ি না। না বুঝে পড়লে তাকে পাগলামী ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। অথচ এ ক্ষেত্রে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন পড়ার ক্ষেত্রে অসহায় ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ি। আমরা এ জন্য নিজেদের শক্তি-সামর্থের সদ্ব্যবহার করি না। এ কথা ঠিক যে, কোরআন না বুঝে পড়লেও সওয়াব হবে। কিন্তু কোরআনের

---

১. ওজায়েফ শাহরি রামাদান– হাফেজ যায়নুদ্দিন আবুল ফারাজ।

প্রতি এই জুলুম কেন ? কেন আমরা কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি না এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সাথে সরাসরি পরিচিত হই না ? দেখা যাক, এ ব্যাপারে কোরআন আমাদেরকে কি বলে ?

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ ঃ 'আমরা আপনার নিকট যে কিতাব নাযিল করেছি তা বরকতপূর্ণ। লোকেরা যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী লোকেরা যেন অবশ্যই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআনের অর্থ না বুঝলে এর ব্যাখ্যা বুঝবে কিভাবে এবং কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে কিংবা গবেষণা করবে ? যারা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না আল্লাহ তাদেরকে কঠোর ভাষায় প্রশ্ন করেছেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

অর্থ ঃ 'তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে ?' (সূরা মোহাম্মদ-২৪)

কোরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা না করা বদ্ধ অন্তর কিংবা তালাযুক্ত অন্তরের পরিচায়ক। অর্থ না বুঝে তেলাওয়াতকারীরা কি এই আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নের সম্মুখীন নয় ? আল্লাহ আমাদের অন্তরকে খুলে দিন ও তালামুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ ـ

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কোরআন শিখে ও শিক্ষা দেয়।' (বোখারী)

এখানেও শেখা কিংবা শিক্ষা দেয়ার অর্থ শুধু Reading নয়, বরং আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই শিক্ষা বলতে শুধু কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না।

কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ 'যদি আমি এই কোরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে বিনীত হতো ও ফেটে চৌচির হয়ে যেতো।' (সূরা হাশর)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যারা কোরআন পড়ি তাদের অবস্থা কি বিনয়ী পাহাড়ের মতো হয় ? কেন হয় না ? নাকি আমাদের অন্তর পাথর কিংবা এর চাইতেও আরো বেশী কঠোর ? কোরআন পাঠ করলে যদি আমাদের অন্তরে আকাংখিত ভয়-ভীতি ও আশাবাদ না জাগে তাহলে কোরআন পাঠের পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে দেখতে হবে।

কোরআন এসেছে মানুষকে সহজ-সরল পথ দেখাতে। কোরআন হচ্ছে অন্তরের চিকিৎসা ও আলো এবং জ্ঞান ও দলীল। কোরআন হচ্ছে সৌভাগ্য ও সওয়াবের বিষয়। কোরআন হচ্ছে আল্লাহর শিক্ষা ও চিরন্তন শাসনতন্ত্র। তাই এ কোরআনকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ ও অনুধাবনের চেষ্টা চালাতে হবে।

রমযানে কোরআন বুঝার জন্য আমাদের অতীত নেক পূর্ব পুরুষরা যা করে গেছেন তা এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উৎসাহের কারণ হতে পারে।

হযরত ওসমান (রা) প্রতিদিন একবার কোরআন খতম দিতেন। ইমাম মালেক (র) রমযান আসলে কোরআন পড়া ছাড়া বাকী সব কাজ বন্ধ করে দিতেন। তিনি শিক্ষা দান, ফতোয়া ও লোকজনের সাথে বসা বন্ধ করে দিয়ে বলতেন এটা হচ্ছে কোরআনের মাস।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) রমযানে তারাবীর নামায ছাড়াই ৬০ বার কোরআন খতম করতেন। আবু হানিফা (র) রমযানে শুধু কোরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি দিনে এক খতম এক রাত্রে এক খতম করতেন। রমযানে খুব কমই কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে পারতো। রমযান এলে ইমাম যোহরী বলতেন ঃ 'রমযান হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত ও খানা খাওয়ানোর মাস।' ইমাম মালেক (র) রমযান এলে হাদীস অধ্যয়ণ ও জ্ঞানীদের আসর ত্যাগ করতেন এবং শুধু কোরআন অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা এই মাসকে 'সৃষ্টির সাথে বয়কট এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের মাস' বলে অভিহিত করতেন। প্রখ্যাত মোফাসসির ও মোহাদ্দিস কাতাদাহ প্রতি সাত রাতে একবার, রমযানে প্রতি রাত্রে একবার এবং রমযানের শেষ ১০ রাত্রের প্রতি রাতে ১ বার করে কোরআন খতম করতেন। ইবরাহীম নাখঈ রমযানে প্রতি তিন রাতে ১ বার এবং রমযানের শেষ ১০ দিনে প্রতি দুই রাতে ১ বার কোরআন খতম করতেন। আল্লামা আসওয়াদ প্রতি দুই

রাতে ১ বার কোরআন খতম করতেন। আল্লামা সুফিয়ান সাওরী রমযান এলে অন্যান্য সকল এবাদত বন্ধ করে শুধুমাত্র কোরআন পাঠে বসে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করে এবাদত করতেন। সোবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং সূর্যোদয়ের পর ঘুমিয়ে পড়তেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ 'কোরআন তেলাওয়াতকারীর উচিত যখন রাত্রে লোকেরা ঘুমায় ও দিনে খায় তখন কোরআন তেলাওয়াত করা। লোকেরা যখন হাসে তখন কাঁদা, যখন লোকেরা কথায় ব্যস্ত তখন চুপ থাকা, লোকেরা যখন চাতুরী করে তখন বিনীত হওয়া এবং তারা যখন আনন্দ করে তখন তার পেরেশান হওয়া।'[১] অবশ্য তিন দিনের কম সময়ে একবার কোরআন খতম করা ঠিক নয় এবং তা নিষিদ্ধ।[২] কিন্তু রমযানসহ পবিত্র মাস কিংবা মক্কার মতো পবিত্র স্থানে গেলে যত বেশী কোরআন পড়া যায় ততই ভাল। এতে তিন দিনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নয়। স্থান ও মওসুমের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। ইমাম আহমদ এবং ইসহাক রাহওয়াই এই মত পোষণ করেন এবং উপরে বর্ণিত তথ্য দ্বারা অন্যান্য আলেমদেরও এই একই মত বলে বুঝা যায়।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের পূর্বের নেক পুরুষরা রমযান আসলে কোরআন সম্পর্কে কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। সন্দেহ নেই যে, তাঁরা বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অবশ্যই না বুঝে না শুনে তোতাপাখীর বুলি আওড়াননি। তাদের অনুসরণে আমাদেরকে কোরআন পড়া ও বুঝার দৈনিক কর্মসূচী নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা কাজ করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে, কোরআন পাঠ শেখা, তাজবীদ শেখা এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য একটা তাফসীর পূর্ণ পাঠ করা। পরিবারের ছোট ও বড় সদস্যদের জন্যও অনুরূপ কর্মসূচী নেয়া যায়। রমযানে কোরআন মুখস্থ করা এবং বেশী বেশী করে খতম দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। অন্যদেরকে শিক্ষা দানের জন্য মসজিদ, ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থার অফিস কিংবা মাঠে-ময়দানে দারসে কোরআন ও তাফসীর মাহফিল, তাজবীদ শিক্ষার আসর বসানো যেতে পারে। মোটকথা, কোরআনের ব্যাপক কর্মসূচী নিতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মসূচী কমিয়ে ফেলতে হবে।

---

১. ওজায়েফ শাহার রামাদান আল মোয়াজ্জাম–হাফেজ আবুল ফারাজ ইবনে রজব। ২. প্রাগুক্ত।

যেভাবে কোরআন পড়া উচিত

কোরআন বুঝে-শুনে পড়া দরকার। কোরআন ভাল করে বুঝতে হলে আরবী ভাষা শেখা প্রয়োজন। তাহলে, কোরআন মজীদের গভীর মর্ম উদ্ধার করা যাবে। আরবী শেখা না থাকলেও কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করা উচিত। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত তাফসীরগুলো এক্ষেত্রে সহায়ক। আমাদের সলফে সালেহীন বা নেক পূর্বসূরীরা এক সঙ্গে ১০টি আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা বুঝে এবং এলেম অর্জন করে এর উপর আমল করা ব্যতীত অধিক আয়াত তেলাওয়াত করতেন না। কোরআন না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করার চেষ্টা উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। বরং যদ্দুর তেলাওয়াত করবে, ততটুকু বুঝার চেষ্টা করবে। কোরআন আমাদেরকে জাগায়, হুঁশিয়ার করে, কিন্তু আমরা উদাসীনতার মধ্যে ডুবে আছি।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابُ اِلاَّ اَمَانِىَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ.

অর্থ ঃ 'তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে, তারা মিথ্যা আকাংখা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের কিছুই জানে না। তারা শুধু কল্পনাই করে।' (সূরা বাকারা-৭৮)

আল্লামা মোহাম্মদ বিন আলী শাওকানী (র) বলেন, এখানে 'মিথ্যা আকাংখা' বলতে শুধুমাত্র তেলাওয়াত করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝে কেবল তেলাওয়াত করা।[১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাব বিকৃতিকারী এবং ঐ সকল নিরক্ষরদেরকে মন্দ বলেছেন যারা শুধু তেলাওয়াত করে, কিন্তু কোরআন বুঝার চেষ্টা করে না। আর সেটাকেই কোরআন মিথ্যা আকাংখা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[২]

নিম্নোক্ত ঘটনাবলী থেকেও আমরা কোরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব বুঝতে পারি। সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তিন দিনের কমে কোরআন খতম দেয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেন ঃ 'তিন দিনের কমে কোরআন খতম করলে কোরআন বুঝা হবে না।' এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কোরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য তেলাওয়াত নয়, বরং কোরআন বুঝা।

---

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ- ৯ই জুন, ২০০৫, রিয়াদ, সৌদী আরব। ২. প্রাগুক্ত।

হোজাইফা (রা) এক রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কেয়ামুল লাইল নামায পড়েন। তিনি ধীরে-সুস্থে কেরাত পড়েন। কোন আয়াতে তাসবীহ থাকলে তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন, দোয়ার কথা থাকলে দোয়া করতেন, পানাহ্ চাওয়ার কথা থাকলে পানাহ চাইতেন।

এভাবে কোরআন পড়লেই নবী করিম (সা)-এর সত্যিকার কোরআন তেলাওয়াতের অনুসরণ হবে। আল্লাহ্ কোরআন মজীদে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ـ

অর্থ ঃ 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যথাযথভাবে তা তেলাওয়াত করে।' (সূরা বাকারা-১২১)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ করে বলছি, এ আয়াতে বর্ণিত 'যথার্থ তেলাওয়াত' বলতে বুঝায় কোরআনের হালালকে হালাল জানা ও হারামকে হারাম জানা। অর্থাৎ কোরআন বুঝে পড়তে হবে।

আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রা) বলেন, এ উম্মাহর পূর্বসূরীদের যারা যতটুকু কোরআন মুখস্থ করতেন, ততটুকুর উপর আমল করতেন। কিন্তু শেষ যুগের উম্মতের মধ্যে অন্ধ এবং শিশু পর্যন্ত কোরআন পড়ে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না। এ কারণে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমাদের জন্য কোরআন মুখস্থ করা কঠিন, কিন্তু আমল করা সহজ; কিন্তু আমাদের পরবর্তীদের জন্য কোরআন মুখস্থ করা সহজ এবং আমল করা কঠিন। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা) ১০টি আয়াতের জ্ঞান অর্জন ও আমল করা ব্যতীত এক সাথে বেশী আয়াত পড়তেন না। আবু আবদুর রহমান সোলামী ওসমান, ইবনে মাসউদ ও উবাই বিন কাব থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে ১০ আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন। তারা সেগুলো বুঝতেন এবং তাতে কি করণীয় তা শিখার আগ পর্যন্ত অন্য ১০ আয়াত তেলাওয়াত করতেন না। ফলে, আমরা একযোগে কোরআন শিখতাম ও আমল করতাম।'

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে তেলাওয়াত ও তাফসীর একই সাথে শিখতেন। তিনি তাদেরকে কোরআনের শব্দ যেমন শিক্ষা দিতেন, তেমনি অর্থও শিক্ষা দিতেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

অর্থ ঃ 'আমরা আপনার কাছে কোরআন নাযিল করেছি যেন আপনি লোকদের

কাছে তাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত কিতাবটি ব্যাখ্যা করেন।' (সূরা নাহল-৪৪) এখানে ব্যাখ্যা বলতে শব্দ ও অর্থ দু'টোকেই বুঝানো হয়েছে।

কোরআন মানব জাতির রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা। তাই তা না বুঝলে চিকিৎসার প্রেসক্রিপসন পাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ 'হে লোকেরা, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা, হেদায়েত এবং মোমেনদের জন্য রহমত এসেছে।' (সূরা ইউনুস-৫৭)

কোরআনই মানুষকে সত্যিকার সৌভাগ্য দান করতে পারে। পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারেনি। উন্নয়নের নামে বহু কিছু করলেও এবং জাগতিক উন্নতি হলেও মানবিক উন্নতি হয়নি, বরং অধোগতি হয়েছে। সে সমাজে মানুষ অপেক্ষা পশুর মূল্য বেশী।

ইমাম নওয়ী (র) বলেন, আমাদের পূর্বসূরীদের একটি দল কোরআনের একটি মাত্র আয়াত নিয়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন। তারা ঐ আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাত তাহাজ্জুদের নামাযে নিম্নোক্ত আয়াতটি বারবার পড়ে রাত কাটিয়ে দেন। আয়াতটি হলো ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থ ঃ 'আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তারা আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, আপনি জবরদস্ত বিজ্ঞ। (সূরা মায়দা-১১৮)

তামীম বিন আউস আদ-দারী সারারাত নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে তাহাজ্জুদের নামায শেষ করেন।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ - سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ ঃ 'যারা মন্দ কাজ করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেবো, যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে ? তাদের ফয়সালা কত মন্দ!' (সূরা জাসিয়া-২১) তিনি নিজের নেক কাজ অপেক্ষা গুনাহ্‌র ভয়ে এরূপ করেন।

সাঈদ বিন জোবায়েরও এক রাত তাহাজ্জুদের নামাযে কেবল নিম্নোক্ত আয়াতটিই বারবার পড়েন ঃ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।' (সূরা ইয়াসিন-৫৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরেক রাত তাহাজ্জুদের নামাযের নিয়ত করে- اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ আয়াতটি পড়তে থাকেন, যে পর্যন্ত না ভোর রাত্রে মোআজ্জিন আজান দেন। আয়াতটির অর্থ হল ঃ 'যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে।' (সূরা ইনফিতার)

আ'মের বিন আবদে কায়েস রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাযে সূরা আল মোমিন পড়েন। নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছে সে আয়াতটি ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত বারবার পড়েন ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন (কেয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এবং দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে।' (সূরা আল মোমিন-১৮)

আরেক রাত তিনি কেয়ামুল লাইল নামাযে নিম্নোক্ত আয়াতটি ভোর হওয়া পর্যন্ত বারবার পড়তে থাকেন ও কাঁদেন।

فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'তারা বলবে ঃ কতই না ভাল হতো, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম, তাহলে আমরা আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' (সূরা আনআম-২৭)

এক রাতে হাসান বসরী (র) তাহাজ্জুদের নামাযে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে থাকেন যে পর্যন্ত ভোর হয়ে যায় ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তাহলে শেষ করতে পারবে না।' (সূরা নহল-১৮)

মোহাম্মদ বিন আল মোনকাদের আবু হাযেমকে সারা রাতব্যাপী কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটিই আমাকে কাঁদায় ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۔

অর্থ ঃ 'তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করতো না।' (সূরা যুমার-৪৭)

আবু সোলায়মান দারামী বলেন, আমি কোন কোন আয়াত ছেড়ে অন্য দিকে যেতেই পারি না।[১]

এক নেককারকে প্রশ্ন করা হলো, কেরাত পড়ার সময় আপনার মন কি অন্য দিকে যায়? কোন কোন নেক লোক কোন আয়াত থেকে মন ছুটে গেলে তা পুনরায় পড়তেন।

আমাদের পূর্বসূরী নেককার মহিলাদের কাছ থেকেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ওববাদ বিন হামযাহ বলেন, আমি আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি নামাযে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ. 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন'[২] – এ আয়াতটি পড়ছেন। আমি অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি তা বারবার পড়ছেন। তিনি তা দীর্ঘায়িত করায় আমি বাজারে গেলাম, প্রয়োজন সারলাম এবং ফিরে এসে দেখি তিনি তখনও তা পুনরাবৃত্তি করছেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন।[৩]

কোরআনের শহীদ নামে খ্যাত যুবক আলী বিন ফোদায়েল বিন আয়াদ তার পিতা ফোদায়েল বিন আয়াদের পেছনে, মাগরিবের নামাযের কেরাতে সূরা তাকাসুরের শেষ আয়াত- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ 'তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখবে, শুনে মধ্যরাত পর্যন্ত বেহুঁশ ছিলেন।

আলী বিন ফোদায়েল আরেকবার ঘরের আঙ্গিনায় আগুন বলে চীৎকার দিয়ে উঠে এবং বলে ঃ কবে আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? তিনি তার পিতাকে বলেন, আপনি সে সত্তার কাছে আমাকে আখেরাতে আপনার সন্তান হিসেবে দান করার

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ- ৯ই জুন, ২০০৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

২. সূরা তূর-২৭।

৩. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ- ৯ই জুন, ২০০৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

জন্য দোয়া করুন, যিনি আমাকে দুনিয়ায় আপনার সন্তান হিসেবে পাঠিয়েছেন। পিতা একথা শুনে সন্তানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মোহাম্মদ বিন নাজিয়া বলেন ঃ একদিন ফোদায়েল ফজরের নামাযে সূরা আল-হাক্কার নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়েন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ 'তাকে ধর ও শিকল পরাও'- এটা শুনে তার ছেলে আলী নামাযে বেহুশ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মারা যান। এজন্য তাকে কোরআনের শহীদ বলা হয়।

আবু ইয়াযীদ তাইফুর বিন ঈসা আল-রোস্তমী যখন ছোট ছিলেন, তখন সূরা মোয্‌যাম্মিলের প্রথম দু'আয়াত মুখস্থ করেন। তাতে রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশ আছে। আল্লাহ বলেন ঃ قُمِ اللَّيْلَ - 'রাত জেগে নামায পড়ো। (সূরা মোয্‌যাম্মেল-২)

তিনি নিজ পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ কাকে রাত্রে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ? পিতা বলেন, নবী করিম (সা)-কে। ছেলে বলেন, তাহলে আপনিও তো নবীর মতো অনুরূপ আমল করতে পারেন। পিতা বলেন, এটা নবীর জন্যই ফরজ, অন্যদের জন্য নয়। তখন ছেলে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু ছেলে পরে সূরার ২০ নং আয়াত মুখস্থ করে। সেটি হলো ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ -

অর্থ ঃ 'আপনার রব নিশ্চিত জানেন যে, আপনি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কম, অর্ধ রাত কিংবা এক তৃতীয়াংশ জেগে নামায পড়েন এবং আপনার সঙ্গী একদল লোকও তাই করে।' (সূরা মোয্‌যাম্মেল-২০)

তখন ছেলে পিতাকে প্রশ্ন করে, সে একদল লোক কারা ? পিতা উত্তরে বলেন, তারা হলো, সাহাবায়ে কেরাম। ছেলে বলল, নবী (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি লংঘন করার মধ্যে কি লাভ ? একথা শুনে পিতা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করল।

এক রাতে আবু ইয়াযীদ জেগে নিজ পিতাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখে বলে, আমাকেও নামায পড়ার জন্য অজু ও পাক-পবিত্রতা শিক্ষা দিন। পিতা বলেন, তুমি এখনও ছোট। ছেলে বলেন ঃ যেদিন মানুষ নিজ আমল দেখার জন্য

পুনরুত্থিত হবে, সেদিন আমি আমার রবকে বলবো, আমার পিতাকে নামায পড়ার জন্য অজু শিক্ষা দিতে বলায় তিনি বলেন, তুমি এখনও ছোট, শুয়ে থাক। আপনি কি এটা পছন্দ করবেন ? তারপর পিতা তাকে অজু ও নামায শিক্ষা দেন।[১] কোরআন বুঝার কারণেই ছেলের মধ্যে এবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো কোনআন বুঝতে সহায়ক ঃ

১. তেলাওয়াতের আদব রক্ষা করা এবং স্থান ও শরীরের পবিত্রতাসহ এখলাস এবং বিসমিল্লাহ্ সহকারে তেলাওয়াত করা।

২. মনকে চিন্তামুক্ত করা এবং কেবলমাত্র কোরআনের প্রতি মনোযোগী হওয়া। একথা মনে করতে হবে যে, কোরআন তাকে সম্বোধন করে কথা বলছে।

৩. ধীরে সুস্থে চিন্তা করে কোরআন পড়া এবং যে আয়াতগুলো পড়ছে সেগুলোর গভীর অর্থ চিন্তা করা, তাড়াহুড়া করে শেষ না করা।

৪. আমাদের পূর্বসূরীরা ঐ আয়াত থেকে কি অর্থ বুঝেছেন, তা জানা।

৫. জীবনের উপর আয়াতের বাস্তব প্রভাব কি তা জানা।

৬. বাস্তবতা ভিন্ন হলেও কোরআনের আয়াতের অর্থের উপর গভীর আস্থা রাখা।

৭. উসুলে তাফসীর জানা।

এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কোরআন পড়ে সত্যিকার অর্থে উপকৃত হওয়া সম্ভব।

---

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ- ৯ই জুন, ২০০৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

১৭শ শিক্ষা

রমযান তাওবা-এস্তেগফারের মাস

'তাওবা' শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গুনাহগার বান্দা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে আল্লাহর দিকে পুনরায় ফিরে আসে। বান্দা যত গুনাহই করুক না কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা ও মাফ করেন। বান্দার গুনাহ যত বড় তাঁর রহমত এর চাইতেও বড়। তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ ঃ 'হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজের আত্মার উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। নিঃসন্দেহে, তিনি অধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা যুমার-৫৩)

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষিদ্ধ বা কুফরী।

রমযান মাস হচ্ছে, তাওবা ও ক্ষমার মওসুম– রহমত, নাজাত ও মাগফেরাতের মাস। এই মাস তাওবার জন্য মহামূল্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسَ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ (مُسْلِمْ)

অর্থ ঃ 'আল্লাহ দিনে গুনাহকারীদের গুনাহ মাফ করার জন্য রাত্রে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন এবং রাত্রে গুনাহকারীদের গুনাহ মাফ করার জন্য দিনে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন। কেয়ামতের আগে পশ্চিমে সূর্যোদয় পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।' আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফের জন্য রীতিমত অপেক্ষা করেন। বান্দা মাফ চাইলেই মাফ পেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ 'সেই ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যে রমযান পেয়েছে কিন্তু তার গুনাহ মাফ হয়নি।' (তিরমিযী, হাকেম)

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে ঃ 'আল্লাহ বলেন, হে বনি আদম! তুমি আমার কাছে যা আশা করো এবং চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম এবং এ জন্য আমি কোন পরোয়া করি না।' (তিরমিযী)

হাদীসে কুদসীতে আরো এসেছে ঃ 'আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দা! তোমরা দিনে রাতে গুনাহ্ করে থাকো, আর আমি সকল গুনাহ্ মাফ করি। তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেব।' (মুসলিম)

গুনাহ্ মাফের জন্য এর চাইতে বড় প্রতিশ্রুতি আর কি হতে পারে ? আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ -

অর্থ ঃ 'তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ্ মাফ করেন এবং তোমরা যা করো সবকিছু তিনি জানেন।' (সূরা শুরা-২৫)

তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু শর্ত হলো এখলাসের সাথে তাওবা করতে হবে এবং এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে আর সেই গুনার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা অশ্লীল কাজ করে ফেললো কিংবা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে ফেললো, নিজেদের গুনাহ্র জন্য আল্লাহকে স্মরণ করলো; আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং তারা জেনে-শুনে কৃত গুনাহ্র পুনরাবৃত্তি করে না। তাদের পুরস্কার হলো, আল্লাহ্র ক্ষমা এবং এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত– তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম! (সূরা আলে এমরান-১৩৫-১৩৬)

তাওবার পর্যায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

০ গুনার স্বীকৃতি ০ গুনার জন্য লজ্জিত হওয়া ০ তাওবা করা ও মাফ চাওয়া ০ পুনরায় সেই গুনাহ্ না করার ওয়াদা করা ০ সকল পর্যায়ে পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতা থাকা ০ ওয়াদার উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা।

রমযান আসলে বহু লোক ভাল মানুষ হয়ে যান, নেক কাজে ব্যস্ত থাকেন ও গুনার কাজ থেকে দূরে থাকেন। রীতিমত জামাআতে নামায পড়েন, তারাবী পড়েন,

রোযা রাখেন, কোরআন পড়েন, দান-সদকা করেন, ঘুষ, মিথ্যা এবং গালি-গালাজ কিংবা নিন্দা-অপবাদ থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু রমযান চলে গেলে তারা আবার রমযান-পূর্ব পশুত্বের দিকে ফিরে যান। তাহলে, তাওবা ও ক্ষমার দাবী পূরণ হলো কোথায় ? তারা যদি আবার আল্লাহর নাফরমানী ও গুনার মধ্যে লিপ্ত হন, তাহলে ক্ষমা, রহমত ও মাগফেরাত কিভাবে লাভ করবেন ? তাওবার উপর টিকে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, 'হে বনি আদম! তুমি আমার নিকট যা যা দোয়া ও প্রত্যাশা করো, আমি তোমার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবো এবং এ ব্যাপারে আমি কোন কিছুর পরোয়া করবো না। হে বনি আদম! যদি তোমার গুনাহ আকাশের মেঘমালার মতো বিপুল পরিমাণও হয়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমার সে গুনাহ্ মাফ করে দেবো এবং সে জন্য আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমীন পরিমাণ বিশাল গুনাহরাশি নিয়েও আমার দিকে ফিরে আসো এবং আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করো, তাহলে আমিও তোমার প্রতি জমীন পরিমাণ বিশাল ক্ষমা নিয়ে হাজির হবো।' (তিরমিজী)

বন্ধুগণ! ক্ষমার জন্য এর চাইতে বড় আহ্বান আর কি হতে পারে ? বোখারী শরীফে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি হলো, আগের উম্মাতের এক ব্যক্তি ৯৯টি হত্যার গুনাহ মাফ সম্ভব কিনা তা জানার জন্য একজন আলেমের কাছে যান। আলেম ব্যক্তিটি 'না' বলেন। তখন হত্যাকারী একেও হত্যা করে হত্যার সংখ্যা ১ শত পূর্ণ করেন। তারপর ১শ' হত্যার গুনাহ্ মাফ সম্ভব কিনা তা জানার জন্য আরেক আলেমের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। পথে তার মৃত্যু উপস্থিত হলে নেক ও পাপী লোকের মৃত্যুদানকারী ফেরেশতাদের মধ্যে কে তার রূহ হরণ করবে তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তার তাওবার গন্তব্যস্থল কাছে না প্রস্থান স্থল কাছে তা মাপার নির্দেশ আসে। জরীপে তাওবার স্থান নিকটবর্তী হওয়ায় নেক লোকের রূহ হরণকারী ফেরেশতারারা তার রূহ হরণ করেন। এই ঘটনা তাওবার মর্ম ও মাহাত্ম্যকে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যিকারভাবে তাওবা করার তওফীক দিন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন এবং যারা গুনাহ্ করে এমন জাতি তৈরি করতেন। তারপর তারা

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ -

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি নিজ আমলনামা দেখে খুশি হতে চায় সে যেন বেশী করে গুনাহ মাফ চায়।' (বায়হাকী-শুআ'বুল ঈমান, আলবানী একে বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَارَبِّ لاَ اَبْرَحُ اَغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ لاَ اَزَالُ اَغْفِرْ لَهُمْ مَا اَسْتَغْفَرُوْنِىْ -

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই শয়তান বলেছে, হে আমার রব, আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি আপনার বান্দাদেরকে তাদের শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত গোমরাহ করতে থাকবো। তখন রব বলেন, আমার ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করে বলছি, তারা যে পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো।' (আহমদ)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ -

অর্থ ঃ 'কেউ খারাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও মেহেরবান দেখতে পাবে।' (সূরা নিসা ঃ ১১০)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ 'যারা অশ্লীল কাজ করে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে, এরপর আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজেদের গুনাহ মাফ চায় এবং তারা জেনেশুনে কৃত গুনাহর

পুনরাবৃত্তি করে না। আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মাফ করবে?' অর্থাৎ আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। (সূরা আলে এমরান ঃ ১৩৫)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থ ঃ 'আপনি তাদের মধ্যে মওজুদ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না, যারা গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ তাদের উপরও আজাব দেন না।' (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

অর্থ ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি দিনে আল্লাহর কাছে ৭০ বারের অধিক তাওবা-এস্তেগফার করি।' (বোখারী)

নিষ্পাপ নবী দিনে ৭০ বারের বেশী তাওবা করলে পাপী উম্মাহর সদস্যদের কমপক্ষে ৭০ এবং আরো বেশী তাওবা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ وُجِدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارٌ كَثِيْرٌ -

অর্থ ঃ যার আমলনামায় অধিক এস্তেগফার থাকবে তার জন্য সুখবর।' (ইবনে মাজাহ– নাসেরুদ্দিন আলবানী হাদীসের সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا -

অর্থ ঃ 'অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টি ধারা ছেড়ে

দেবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।' (সূরা নূহ-৯-১২)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বলে ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাই, তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও ধারক এবং আমি তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। তাহলে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও সে জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসুক না কেন।' (আবূ দাউদ)

জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা কবীরা গুনাহ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে সাইয়েদুল এস্তেগফার পড়ে এবং এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই দিনে মারা যায়, সে বেহেশতবাসী হবে; আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তা পড়ে সকাল হওয়ার আগে রাত্রে মারা যায়, সেও জান্নাতবাসী হবে।

সাইয়েদুল এস্তেগফার হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোন সত্যিকারের মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, সাধ্যমত আপনার ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর টিকে রয়েছি, আমার মন্দ কাজ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই, আমার উপর আপনার নেয়ামতকে স্বীকার করি, আমার গুনাহ স্বীকার করি, আমাকে মাফ করুন, নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।' (বোখারী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মৃত্যুর আগে নবী করিম (সা) নিম্নের বাক্যটি অধিক হারে উচ্চারণ করতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাচ্ছি ও তাওবা করছি।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তার উপর ভীষণ খুশী হন। যেমন তোমাদের কারো সওয়ারী যদি মরুভূমিতে হারিয়ে যায়, এর পিঠে যদি তোমাদের খাদ্য ও পানীয় থাকে, এটাকে তালাশ করে না পেয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কোন গাছের নীচে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং তখন যদি হঠাৎ সওয়ারীটি এসে তার কাছে হাজির হয়, সে তখন এর লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলে 'হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আল্লাহ তোমাদের এই আনন্দ অপেক্ষা আরো বেশী খুশী হন। (মুসলিম)

তাই সর্বদা তাওবা-এস্তেগফার করা দরকার।

রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। 'কোন বান্দা গুনাহ করে এসে বলে, হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে, সে জেনেছে যে তার একজন পালনকর্তা আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ করেছে এবং বলেছে, হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ জবাবে বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন যিনি গুনাহ মাফ করেন। সে পুনরায় গুনাহ করেছে এবং বলেছে, হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি গুনাহ মাফ করেন। আল্লাহ বলেন, তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিলাম। (মুসলিম)

তাওবা-এস্তেগফারকারীদের জন্য স্বয়ং আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা ও এর চারপাশের ফেরেশতারা এই বলে দোয়া করে যে, 'যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আপনার প্রতিশ্রুতি চিরকাল বসবাসের জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল ও

ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য।' (সূরা মোমিন-৭, ৮, ৯)

তাওবা-এস্তেগফারের মর্যাদা আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাসহ অন্যান্য ফেরেশতাদের কাছেও অনেক বেশী। ফেরেশতারা নিষ্পাপ। তাদের দোয়া কবুল হয়। তাওবা করলে ফেরেশতারা তাওবাকারীর পরিবার ও সন্তানদেরকে বেহেশতে প্রবেশের জন্য দোয়া করেন। রমযান মোমেনের জন্য কত বড় সৌভাগ্য!

গুনাহও কল্যাণকর হতে পারে যদি নেক কাজ করা হয়

মোমেনের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। ত্রুটি করাও কল্যাণকর হতে পারে যদি মানুষ এরপর তাওবা করে বিনীত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

অর্থ ঃ "মোমেনের বিষয় আশ্চর্যজনক। তার প্রত্যেকটি জিনিসই কল্যাণকর। আর এটা মোমেন ছাড়া আর কারো জন্য নয়। সে সুখ ও আনন্দ পেলে শুকরিয়া আদায় করে, সেটা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ ও কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করে; সেটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

গুনাহ ও ত্রুটি তখন কল্যাণকর হবে, যখন তা মানুষকে অধিক অধিক সওয়াবের কাজ এবং তাওবা-এস্তেগফারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তাওবার সাথে সাথে আরো কিছু নেক কাজ করা কর্তব্য। তা সেই গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - 'নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ ও গুনাহ দূর করে দেয়।' (সূরা হূদ-১১৪)

তাই পাপ কাজ করলে নফল নামায, রোযা, দান-সদকা, মা-বাপের সেবা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা, দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ বাড়ানো, উপদেশ দান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

সওয়াবের কাজ করলে ১০ থেকে ৭শ' গুণ এবং গুনাহর কাজ করলে মাত্র ১টা গুনাহর পরিবর্তে ১টা গুনাহ লেখা হয়। তাই নেক কাজ গুনাহকে দূর করে দিতে সক্ষম। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةَ ضِعْفٍ، وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً.

অর্থ ঃ 'আমার বান্দা যখন নেক কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমল করেনি, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যদি আমল করে তাহলে, ১০ থেকে ৭শ গুণ সওয়াব লিখি। যদি গুনাহর কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখনও তা করেনি, আমি তা লিখি না। কিন্তু যদি কাজটি করে ফেলে, তাহলে, আমি কেবল ১টি গুনাহ লিখি।' (মুসলিম)

শুধু তাই নয়, সঠিক তাওবাসহ সত্যিকার ঈমান এবং নেক কাজ করলে আল্লাহ সে গুনাহকে সওয়াবে পরিণত করে দেন। তাওবার কত বিরাট সৌভাগ্য! আল্লাহ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ ঃ 'কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে নেক দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা ফোরকান-৭১)

মানুষ গুনাহ না করলে আল্লাহ অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন

গুনাহ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি কাম্য নয়। তারপরও গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। মোমেনের ঈমান ও তাকওয়া যত বেশী হোক না কেন, গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না। কেবল মাত্র নবী-রাসূলগণ ব্যতিক্রম। গুনাহ করাও ভাগ্যের লিখন। নবী করিম (সা) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ আদম সন্তানের ভাগ্যে যেনার অংশ লিখে রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িয়ে পড়বে। চোখের যেনা হলো দেখা এবং জিহ্বার যেনা হলো বলা; প্রবৃত্তি কামনা-বাসনা করে এবং যৌনাঙ্গ তাকে হয় সম্পূর্ণ সত্যায়িত করে আর না হয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।' (বোখারী-মুসলিম)

ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। গুনাহ্ করার পর গর্ব-অহংকার না করে আল্লাহ্র কাছে বিনীতভাবে গুনাহ্ মাফ চাওয়া ও তাওবা করা দরকার। তাওবা করলে আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফ করেন। বান্দা গুনাহ্ করবে, আল্লাহ্ তা জানেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এক হাদীসে এসেছে ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَسَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

অর্থ ঃ 'আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা গুনাহ্ না করলে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইবে এবং তিনি তাদেরকে মাফ করবেন।'

আনাস (রা) থেকে ভাল সনদ সহকারে আরেক হাদীসে নবী (সা) বলেন ঃ

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ اَلْعُجْبُ اَلْعُجْبُ -

অর্থ ঃ 'তোমরা গুনাহ্ না করলে তোমাদের ব্যাপারে আমার আরো বড় আশংকা হয় যে তোমরা আত্মম্ভরিতার বিরাট গুনায় নিমজ্জিত হবে।' (বায়হাকী, বাযযার) বান্দা গুনাহ্ না করলে আল্লাহ্র غَفُوْرٌ (ক্ষমাকারী) নাম অর্থহীন হয়ে যায় এবং সেটাও বড় গুনাহ্। মোটকথা, গুনার মধ্যে টিকে থাকা যাবে না। ভুল হবে, ভুল হলে ক্ষমা চাইতে হবে।

১৮শ শিক্ষা

রমযান এখলাসের মাস

সকল প্রকার এবাদত, আনুগত্য ও নেক কাজ কবুলের জন্য শর্ত হলো, এখলাস। এখলাস ছাড়া যে কোন কাজ এমনকি নেক আমলও ধ্বংস টেনে আনে।

এখলাস অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে নেক কাজ করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেক কাজ করা যাবে না। সাময়িক ও জাগতিক স্বার্থে কিংবা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সম্প্রদায়, সংস্থা ও কোন নেক লোকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করা যাবে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করলে বান্দাগণও সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। বান্দাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্ট করা যাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন মাধ্যমকে সন্তুষ্ট করার টার্গেট করা যাবে না। কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়ত ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আর কোন উসিলা নেই। কোন নেক ব্যক্তির কবর, আস্তানা, দেবতা, পুরোহিত এবং দরবেশ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে না। তাদের কাছ থেকে ইসলামের বিপরীত নয় এমন সব শিক্ষাই শুধু গ্রহণ করা যেতে পারে, এর বেশী নয়। কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত পন্থায়ই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

রমযান হচ্ছে, প্রশিক্ষণের মাস। তাই ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান ও কেবলমাত্র সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে কেবলমাত্র সওয়াবের কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, এখলাসের সাথে রোযা রাখতে হবে। সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির নিয়ত ছাড়া রোযা রাখার পেছনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেখানে এখলাস ও একনিষ্ঠতা থাকবে সেখানে 'রিয়া' বা লোক দেখানোর মনোভাব থাকতে পারবে না। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন না। রমযানের রোযা আমাদেরকে লোক দেখানোর মনোবৃত্তি দূর করার ট্রেনিং দেয়।

যে কোন এবাদত অন্য লোক দেখতে পায়। যেমন– নামায, যাকাত, হজ্জ, কোরআন পাঠ ইত্যাদি। এমনকি গোপনে দান করলেও দাতা এবং দান গ্রহীতা

কমপক্ষে দুই ব্যক্তি জানতে পারে। কিন্তু রোযার বিষয়টি বান্দা ও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। কেউ রোযার মাসে গোপনে কিছু খেলে, কিংবা পানিতে ডুব দিয়ে পানি পান করলে কারুর দেখার সাধ্য নেই। একমাত্র আল্লাহর ভয় এবং তার সন্তুষ্টির জন্যই মানুষ রোযা রাখে। সেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নয় বরং এখলাসের ভিত্তিতে পুরস্কার লাভ করাই উদ্দেশ্য।

আমাদের অতীতের নেক বান্দাগণ এখলাসের কারণে নেক কাজকে গোপন রাখতেন। হাম্মাদ বিন যায়েদ প্রখ্যাত তাবেঈ আইউব সাখাওয়ানী সম্পর্কে বলেছেন, আইউব হাদীস বর্ণনা করার সময় খুবই নরম হয়ে যেতেন এবং একদিকে মোড় নিয়ে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করতেন। তিনি বলতেন, কি কঠিন সর্দি। কান্না গোপন করার কারণেই বাহ্যিকভাবে মনে হতো যে তার সর্দি হয়েছে।[১]

মোহাম্মদ বিন ওয়াসে বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে এমন পেয়েছি যিনি তার স্ত্রীর সাথে একই বালিশে শয়ন করতেন। তার চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যেত কিন্তু স্ত্রী টেরও পেতেন না। আমি আরো এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি একই কাতারে নামায পড়ছেন, চোখের পানিতে তার গাল ভেসে গেছে কিন্তু পার্শ্বের মুসল্লী আদৌ টের পাননি। তাবেঈ আইউব সাখতিয়ানী সারা রাত জেগে এবাদত করতেন, তিনি তা গোপন করার জন্য সকাল বেলায় এমনভাবে আওয়াজ দিতেন যেন তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে জেগেছেন। ইবনে আবি আদী বর্ণনা করেছেন, দাউদ বিন আবি হিন্দ ৪০ বছর নফল রোযা রেখেছেন, তার স্ত্রী আদৌ টের পাননি। তিনি ছিলেন কর্মকার। সকাল বেলা সাথে খাবার নিয়ে যেতেন এবং রাস্তায় তা দান করে দিতেন এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে রাতের খানা খেতেন।

মোখলেস লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ 'যারা তাওবা করে, সংশোধন করে, আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের দ্বীনকে এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে, তারা মোমিনদের সাথে রয়েছে। আল্লাহ শীঘ্রই মোমিনদেরকে মহান বিনিময় দান করবেন।' (সূরা নিসা-১৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ এখলাস সহকারে নেক কাজের মহান বিনিময়ের কথা ঘোষণা করেছেন।

এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি একমাত্র ও

১. কাইফা নাঈসু রামাদান– আবদুল্লাহ সালেহ, দারুন ওয়াতান প্রকাশনী রিয়াদ, প্রকাশ-১৪১১ হিঃ।

লা-শারীক আল্লাহর উপর এখলাস, নামায কায়েম ও যাকাতের উপর দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট।' (ইবনে মাজাহ, হাকেম)

আবু ইমরান থেকে বর্ণিত, মোয়াজ (রা)-কে যখন ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় তখন মোয়াজ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার দ্বীনকে এখলাসপূর্ণ করো, তাহলে কম আমলও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।' (হাকেম)

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মোখলেস লোকদের জন্য সুসংবাদ। তারা হেদায়াতের বাতি এবং তাদের উপর থেকে সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনা কেটে যায়।

দাহহাক বিন কায়েস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের আমলকে এখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করো। আল্লাহ এখলাস ছাড়া কোন আমল কবুল করেন না।' (বাযযার)

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ এখলাস ও তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমল ছাড়া অন্য কোন আমল কবুল করেন না।' (নাসাঈ)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রা) থেকে আগের যুগের উম্মাহর গুহায় অবরুদ্ধ তিনজন লোকের এখলাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তারা তিনজন এমন এমন তিনটি নেক কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে তাদেরকে মুক্ত করার ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, যাতে এখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, এখলাস বিপদ দূর হওয়ার অন্যতম হাতিয়ার।

তাই সাহল বিন আবদুল্লাহ তাসাওরি (রা) বলেছেন ঃ এলেমের সবটুকুই হচ্ছে দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আমলের সবটুকু হচ্ছে আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এখলাস ছাড়া সকল আমল বালুর মতো বাতাসে বিলীন হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম ব্যতীত সকল মানুষ মৃত। ওলামায়ে কেরাম নেশাগ্রস্ত, আমলকারী ব্যতীত। আমলকারীরা প্রতারিত, মোখলেস লোকেরা ব্যতীত। মোখলেস লোকেরা ভীত যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু কিভাবে হয় তা জানা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখলাস ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে না, তাই এই মহান রমযান মাসে এখলাস ও একনিষ্ঠতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের সবাইকে মোখলেস হতে হবে।

১৯শ শিক্ষা

রমযান দয়া ও দান-সদকার মাস

ক. রমযান দয়ার মাস

রমযান দয়া ও করুণার মাস। এই মাসে উপবাসরত মুসলমানরা অভাবী লোকদের দুঃখ সরাসরি অনুভব করতে পারে। রোযাদার হবে সর্বাধিক দয়ালু। ক্ষুধা, পিপাসা ও কষ্টের দাবী হচ্ছে, অন্য মুসলিম ভাইয়ের অভাব দূর করা। হে রোযাদার! অগণিত মানুষ ক্ষুধা ও জঠরজ্বালায় শিকার, তাদের প্রতি নজর দাও, সহস্র লোক কাপড়হীন, তাদেরকে বস্ত্র দাও।

হাদীসে এই মাসকে রহমত, ক্ষমা ও মুক্তির মাস বলা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহই মানুষকে রহম করেন এই মাসে। তাই রোযাদারকেও অন্যের প্রতি দয়া ও রহমতের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দয়া ও রহমত হচ্ছে আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছে তার অন্তরে এই রহমত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ দয়ালু লোকের উপর রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ নিজেও দয়ালু এবং মেহেরবান। তিনি বান্দাদেরকে দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারাও যেন ধৈর্য এবং দয়ার উপদেশ দান করে।

মানুষের অন্তরে দয়া না থাকার অনেক কারণ আছে। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. অতিরিক্ত গুনাহ ও নাফরমানীর কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে। ফলে, তা কঠোর বা পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়। আল্লাহ ইহুদীদের পাপের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ 'তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে পাথরের মতো, কিংবা এর চাইতেও বেশী।' (সূরা বাকারা-৭৪)

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আমরা তাদের উপর অভিশাপ নাযিল করি এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দেই।' (সূরা মায়েদা-১৩)

২. অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণেও অন্তর শক্ত হয়ে যায়। সেই জন্যই রমযানের আগমন, যেন মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও ভোগবিলাসের উপর লাগাম দিতে পারে।

রমযানে সকল পর্যায়ের লোকের উপর দয়া ও মেহেরবানীর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের জনগণের সাথে নম্রতা ও দয়া প্রদর্শন করা উচিত। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাহর শাসনকর্তা নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের সাথে কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি কঠোরতা করো; আর যে শাসনকর্তা তাদের সাথে নরম ব্যবহার করে তুমিও তার প্রতি নরম ব্যবহার করো।' (মুসলিম)

শিক্ষক ছাত্রের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করবেন, দয়া ও মেহেরবানী প্রদর্শন করবেন। পরবর্তীতে ছাত্ররাও শিক্ষক হয়ে দয়াবান হবে। অনুরূপভাবে, নামাযের ইমাম মুসল্লীর প্রতি দয়াবান হবেন। তিনি দীর্ঘ কেরাত পড়ে তাদেরকে কষ্ট দেবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা কেউ যদি নামাযের ইমাম হও, তাহলে নামায সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে বয়োবৃদ্ধ লোক, রোগী, ছোট ও এমন ব্যক্তি যার কোন কাজ রয়েছে।' (বোখারী ও মুসলিম)

একবার মোয়াজ (রা) নামায দীর্ঘ করায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তিনবার বলেন ঃ 'হে মোয়াজ! তুমি কি ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ?' (বোখারী, মুসলিম) অনুরূপভাবে, দা'য়ীকে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে দয়া দেখাতে হবে। তিনি যেন তাদের কাউকে কষ্ট না দেন। আল্লাহ হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ 'তোমরা তার সাথে সদয় ব্যবহার ও নরম কথা বলবে। সম্ভবত সে হেদায়াত গ্রহণ ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।' (সূরা তা-হা ঃ ৪০)

পিতা সন্তানের সাথে সদয় আচরণ করবেন। তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলে এর পরিণতি খারাপ হয়। তাই নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ زَانَهُ وَمَا نَزَعَ الرِّفْقُ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ شَانَهُ -

অর্থ ঃ 'কোন জিনিসের নম্রতা তাকে সুন্দর বানায় এবং নম্রতা প্রত্যাহার করা হলে তা মন্দে পরিণত হয়।' (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

সাহাবায়ে কেরাম অভাবী ও গরীবদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) কোন ফকীর মিসকীন ছাড়া ইফতার করতেন না। তিনি ইফতারের জন্য কোন গরীব লোক না পেলে সেই রাতে না খেয়ে থাকতেন। তিনি খানা খাওয়ার সময় কোন গরীব লোক সাহায্য প্রার্থনা করলে নিজের ভাগের

খাবারটুকু দান করে দিতেন। কোন সময় ঘরে ফিরে দেখতেন যে আর কোন খাবার নেই। তখন তিনি না খেয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।

একবার ইমাম আহমদ (র) রোযা ছিলেন। তাঁর জন্য ইফতারের উদ্দেশ্যে দুটো রুটি তৈরি করা হয়। ভিক্ষুক আসায় তিনি তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেন এবং নিজে না খেয়ে রাত কাটিয়ে দেন।

খ. রমযান দান-সদকার মাস

রমযান সকল নেক কাজের জন্য অধিক সওয়াবের মাস। দান-সদকা রমযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও করণীয়। রোযার উপবাসের মাধ্যমে গরীব-দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝার পর তা দূর করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা হলো দান-সদকাহ্ করা। আর এ কারণেই নবী করিম (সা) অন্যান্য মাসে বড় দাতা হওয়া সত্ত্বেও রমযানে তিনি আরো বেশী দান করতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) এমনিতেই সর্বাধিক দানকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রমযানে জিবরীল (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর প্রবাহমান বাতাসের মতো উন্মুক্ত হস্ত ও অধিকতর দাতা হয়ে যেতেন।' (বোখারী)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ رَمَضَانَ - 'রমযানের দান-সদকাহ্ সর্বোত্তম।' (তিরমিজী)

যে কোন এবাদতের সওয়াব নীচে ১০ থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে ৭শ বা আরো অধিক সম্প্রসারিত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর পথে দানের সওয়াব নীচে ৭শ থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে আরো বেশী। ১০ থেকে শুরু হয় না। এটা দান-সদকার বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে আল্লাহ্ কোরআনে বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের অর্থ-সম্পদ দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো, যা থেকে ৭টি শিষ বা ছড়া জন্মায়। প্রত্যেকটি ছড়ায় একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বেশী দান করেন। আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা বাকারা-১৬১)

বেশী সওয়াবের আশায় রমযানে বেশী বেশী দান করা উচিত। কেননা, অন্য এবাদতে এত বেশী সওয়াব নেই। আল্লাহ বলেন ঃ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন– তা থেকে ব্যয় করো।' (সূরা হাদীদ-৭)

এ আয়াতে সম্পদের মালিক আল্লাহ মানুষকে সম্পদের প্রতিনিধি বানিয়ে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যেন সম্পদ আঁকড়ে ধরে না রাখি।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন ? তাহলে আমি দান-সদকাহ করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সূরা মোনাফেকুন-১০)

আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কর্জে হাসানা দাও, তাহলে, আল্লাহ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন, আল্লাহ শোকর গুজার ও ধৈর্যশীল।' (সূরা তাগাবুন-১৭)

এ আয়াতেও দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

দান-সদকা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ، وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

অর্থ ঃ 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান-সদকা করো, তাহলে তা কতইনা উত্তম। আর যদি তা গোপনে গরীব ও অভাবীদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ তোমাদের আমলের বেশী খবর রাখেন।' (সূরা বাকারা-২৭১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'দান-সদকাহ্ দ্বারা সম্পদ কমে না, বান্দা যখন দানের হাত বাড়ায়, তখন তা অভাবীর হাতে পড়ার আগে প্রথমে আল্লাহর হাতে পড়ে, যে অভাবমুক্ত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়, আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।' (তাবারানী)

দান করলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, না, কমে না। আল্লাহ্ তা আরো বাড়িয়ে দেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'দান-সদকাহ্ দ্বারা সম্পদ কমে না, বান্দা কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহ্ তার ইজ্জত-সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হলে, আল্লাহ্ তাকে বুলন্দ করেন।' (মুসলিম)

নবী (সা) আরো বলেন ঃ ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ - 'হাশরের দিন দান-সদকাহ্ বান্দার জন্য ছায়া হবে।' (ইবনু খোযাইমা)

সেদিন প্রখর তাপের মধ্যে ছায়ার প্রয়োজন হবে অত্যধিক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - 'তোমরা খেজুরের একটি টুকরা দান করে হলেও দোযখ থেকে বাঁচো।' (বোখারী)

দান করলে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা যায় বলে নবী করিম (সা) উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরো বলেন, اَلصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ السُّوْءِ - 'দান-সদকাহ ৭০টি মন্দের দরজা বন্ধ করে দেয়। (তাবারানী)

আমর বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ وَتَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَيُذْهِبُ اللّٰهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ -

অর্থ ঃ 'মুসলমানের দান-সদকাহ তার হায়াত বৃদ্ধি করে, খারাপ মৃত্যু প্রতিহত করে এবং আল্লাহ্ এর মাধ্যমে তার গর্ব-অহংকার দূর করেন।' (তাবারানী)

মোআজ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ـ

অর্থ ঃ 'আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাগুলো সম্পর্কে বলবো না ? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, রোযা হলো ঢালস্বরূপ। পানি যেমনি আগুন নিভায়, দান-সদকাহ তেমনি গুনাহ নিভায়।' (তিরমিজী, ইবনু হিব্বান)

এ হাদীসে দান-সদকাহ দ্বারা গুনাহ মাফ হয় বলে জানা যায়।

মাইমুনা বিনতে সা'দ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে দানের হুকুম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে তা তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করবে।' (তাবারানী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রশ্ন করেন, কোন্ দান উত্তম ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, গরীবের সামর্থ অনুযায়ী দান। তবে প্রথমে পরিবারে ব্যয় শুরু করো।' (আবূ দাউদ, ইবনু খোয়াইমা, হাকেম)

গরীবরাও দান করবে, যদিও তা সামান্যই হোক না কেন।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ : قَالَ : فَاِنَّ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ ـ (بخارى)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কার কাছে নিজের মাল-সম্পদ অপেক্ষা ওয়ারিশের মাল-সম্পদ অধিক প্রিয় ? সাহাবারা বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে আপন সম্পদ অধিকতর প্রিয় নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নিজ সম্পদ বলতে বুঝায় যা সে ব্যয় করেছে, আর যা রয়ে যাবে সেটাতো ওয়ারিশের সম্পদ।' (বোখারী)

এ হাদীসে কুক্ষিগত সম্পদকে ওয়ারিশের সম্পদ বলা হয়েছে। কেননা, ব্যক্তির মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা তার মালিক হবে, ব্যক্তি নিজে তার মালিক নয়। অথচ, মানুষ নিজের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে কম, আর সম্পদের মায়ার কারণে

রেখে যায় বেশী– যা তার কোন কাজে আসবে না। যেটা দ্বারা ওয়ারিশরাই উপকৃত হবে।

দান-সদকার মধ্যে সদকাহ জারিয়াহ উত্তম। সদকাহ জারিয়াহ হলো, যার ফলাফল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুল তৈরি ইত্যাদি।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এমন কোন সকাল হয় না যেদিন দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয় এবং একজন একথা না বলে, হে আল্লাহ, অর্থ ব্যয়কারীকে বিনিময় দিন এবং অপরজন বলে, হে আল্লাহ, কৃপণের সম্পদকে নষ্ট করে দিন।' (বোখারী ও মুসলিম)

নবী করিম (সা) বলেন, 'আমার কাছে যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে তাহলে আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করা ছাড়া আনন্দ পাবো না। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা অংশ ব্যতীত।'[১]

সাহাবী আবদুর রহমান বিন আওফ একবার মদীনার গরীব লোকদের মধ্যে ৭শ উটের বোঝাইকৃত বিশাল সম্পদ দান করেন।

খলীফা ওসমান (রা) তাবুক যুদ্ধের খরচ বহন করেন এবং রুমা কূপ কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। এতে নবী করিম (সা) অত্যন্ত খুশী হন।

রমযানে আমাদের নেককার পূর্বসূরীদের মসজিদগুলোতে পর্যাপ্ত ইফতার সরবরাহ করা হতো। তারা এর মাধ্যমে বিরাট সওয়াব লাভ করেন।

আজও আমাদের উচিত, গরীব-মিসনীকদেরকে ইফতার করানো।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে,[২] 'আল্লাহ বলেন, ব্যয় করো, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করবো। নবী (সা) বলেন, তিনটি বিষয়ে আমি শপথ করে বলছি, দান দ্বারা সম্পদ কমে না।.... এরপর বলেন, দুনিয়ায় চার ধরনের লোক আছে। ১. এক বান্দাকে আল্লাহ এলেম ও সম্পদ দিয়েছেন। সে এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তাকওয়ার অনুসরণ করে, আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করে এবং সম্পদে যাদের হক আছে সে হক আদায় করে, তার মর্যাদা সর্বোত্তম। ২. অন্য বান্দাকে আল্লাহ এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি। সে সত্য নিয়তে বলে, যদি আমার সম্পদ থাকতো, তাহলে, আমি অমুক অমুক নেক কাজ করতাম। তার

---

১. সাপ্তাহিক দাওয়াহ-২১শে নভেম্বর-২০০২, রিয়াদ। ২. প্রাগুক্ত।

নিয়তের কারণে উভয়ের মর্যাদা সমান হবে। ৩. আরেক বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু এলেম দেননি, সে এলেম না থাকার কারণে সম্পদের মধ্যে ডুবে আছে, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার আছে তা পূরণ করে না। এ ব্যক্তি হলো সর্বনিকৃষ্ট। ৪. এক বান্দাকে আল্লাহ অর্থ ও এলেম কিছুই দেননি। সে বলে, যদি আমার অর্থ-সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুক (গুনাহর) কাজ করতাম। তার নিয়তের কারণে উভয় ব্যক্তির সমান গুহান হবে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সে দান উত্তম, যখন তুমি সুস্থ এবং সম্পদ কামনা করো ও দারিদ্র্যের ভয় করো। মৃত্যু ওষ্ঠাগত অবস্থা পর্যন্ত দেরী করো না; তখন যেন এরূপ না বলতে হয় যে, অমুকের জন্য এটা, অমুকের জন্য সেটা এবং অমুকের জন্য ওটা।' (বোখারী ও মুসলিম)

মোটকথা, দানের বহু উপকারিতা আছে। এতে গুনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বাড়ে, জাহান্নাম থেকে আড়াল হয়, সম্পদ বাড়ে ও বরকত নাযিল হয়, হাশরের ময়দানে ছায়া হবে, অমঙ্গলের দরজা বন্ধ হয়, খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচা যায়। দান করলে ফেরেশতারা বিনিময়ের জন্য দোয়া করে ইত্যাদি। তাছাড়া দানের মাধ্যমে সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায় যা আর কোন এবাদতে নেই। দানের সর্বনিম্ন সওয়াব হল ৭শ গুণ। দানের দ্বারা অভাবী মানুষ তৃপ্ত হয় এবং তারা দাতার জন্য দোয়া করে। ফেরেশতারা পর্যন্ত দোয়া করে। দানের কি অসীম মর্যাদা!

২০শ শিক্ষা

রমযান ধৈর্য ও সংযমের মাস

বাস্তব জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন অনেক বেশী। তাই আল্লাহ রমযানকে ধৈর্যের একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মাঝে মাঝে ধৈর্য কমে যায়। তখন পানাহার ও যৌন চাহিদা থেকে দীর্ঘ এক মাস বিরত রাখার মাধ্যমে তাকে মজবুত করা হয়। দাওয়াতে দ্বীন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কষ্ট সহ্য করার জন্য ধৈর্যের ভীষণ প্রয়োজন। শত্রুরা কিংবা অজ্ঞ লোকেরা গালি-গালাজ ও হাসি-ঠাট্টা করবে। ধৈর্যের সাথে এর মোকাবিলা করে হেকমতের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। জিহাদে জান-মালের কোরবানীর জন্য সর্বাধিক ধৈর্য ধারণ না করে উপায় কি ? কিন্তু তা কত কঠিন! ধৈর্য ধারণ করতে পারলে তাদের জন্য আল্লাহ পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

অর্থ ঃ 'সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দিন যারা বিপদগ্রস্ত হলে বলে, অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা)

কোন কিছু হারিয়ে গেলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। অভাব-অনটন ও দারিদ্র দেখা দিলে হারাম আয়ের প্রাচুর্যের দিকে না গিয়ে সীমিত হালাল রোজগারের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ যারা আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং এমনভাবে রিজিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।' (কোরআন)

বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদে ধৈর্যের প্রয়োজন। যার ধৈর্য বেশী, তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি বেশী। তিনি সবার কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত হবেন। পক্ষান্তরে, যার ধৈর্য কম তিনি সবার কাছে অপ্রিয়, খিটখিটে মেজাজ কিংবা বদমেজাজী বলে পরিচিত হবেন। লোকেরা তার কাছ থেকে দূরে সরতে চাইবে।

একজন মুসলমান থেকে যদি অন্যরা দূরে সরে যায় তাহলে তিনি কিভাবে দাওয়াতী কাজ ও সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন ?

ধৈর্য মোমিনের সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই প্রবাদ আছে, 'ধৈর্য প্রশস্ততার চাবিকাঠি।' রোযার অপর নাম হচ্ছে সবর। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ـ

অর্থ ঃ 'রমযান হচ্ছে, ধৈর্য ও সংযমের মাস। আর সবরের পুরস্কার হচ্ছে, বেহেশত।' (ইবনে খোযাইমাহ)

এই হাদীসে রমযানকে ধৈর্য ও সংযমের মাস বলা হয়েছে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ـ

অর্থ ঃ 'রোযা ধৈর্যের অর্ধেক।' (তিরমিজী)

এই হাদীসেও রোযাকে সবরের অর্ধেক বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, রমযানের সাথে ধৈর্যের মূল অর্থ ও তাৎপর্যের বিরাট মিল রয়েছে। রোযায় আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরহেজ করে চলতে হয়। এটা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক। অপর অর্ধেক হচ্ছে তাঁর আনুগত্য বা এবাদত করা। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থ ঃ 'ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিনা হিসেবে তাদের পুরস্কার দেয়া হবে।' (সূরা যুমার-২)

ধৈর্যের পুরস্কার কত বিরাট আমরা সহজেই তা অনুমান করতে পারি। আল্লাহ তাদেরকে বেহিসাবে পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা)

ধৈর্যের সাথে রমযানের সম্পর্ক কি তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। ধৈর্য তিন প্রকার। (১) আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতের কষ্ট স্বীকারের ধৈর্য, (২) আল্লাহর নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে কষ্ট হয় সে ব্যাপারে ধৈর্য, (৩) তাকদীর বা ভাগ্যের কষ্টদায়ক জিনিসের মোকাবিলায়ও ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

রমযানের মধ্যে এই তিন ধরনের ধৈর্যই পাওয়া যায়। কেননা, রমযানে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার কষ্ট আছে। এছাড়াও ক্ষুধা-পিপাসা, শারীরিক দুর্বলতাসহ ভাগ্যলিপির যন্ত্রণা এবং কষ্টও রয়েছে। এ জন্য রমযানকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। তাই এ মাসে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং পরবর্তীতে তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

ধৈর্যের আরো অনেক ফজীলত আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে সবর করে আল্লাহ তাকে সবর ধারণে সাহায্য করেন। আল্লাহ সবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ততা কাউকে দান করেন না।' (বোখারী, মুসলিম)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করি, কোন লোকের উপর সর্বাধিক বিপদ নাযিল হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ প্রথম আম্বিয়ায়ে কেরাম, তারপর ক্রমানুসারে অন্যান্য নেক বান্দাগণ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দ্বীনদারীর অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। কেউ যদি দৃঢ় ও শক্ত ঈমানদার হয়, তার পরীক্ষাও শক্ত এবং কঠোর হবে। কারুর দ্বীনদারী হালকা-পাতলা হলে, তার পরীক্ষাও সে রকমেরই হবে।' (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

বিপদ আসলে সবরের প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই বিপদে মোমিনকে ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিতে হয়।

মাহমুদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যারা সবর করে তাদের জন্য সবর এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য ভীতি নির্ধারিত হয়।' (আহমদ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার সাথে রয়েছে। আল্লাহ যদি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তাহলে তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা পরীক্ষায় রাজী থাকে, তাদের জন্য সন্তুষ্টি এবং যারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।' (ইবনে মাজাহ, তিরমিজী)

সকল পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে সবরের প্রশ্ন জড়িত।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হলে, আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ করে দেন। এমনকি একটা কাঁটা ফুঁড়লেও।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে রয়েছে ধৈর্যের উত্তম নমুনা। তিনি যখন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে গিয়ে প্রহৃত হন, তখন তাদের জন্য অধৈর্য হয়ে বদদোয়া করেননি। বরং বলেছেন, হে আল্লাহ! তারা অজ্ঞ, তারা জানে না, আপনি তাদেরকে হেদায়াত করুন।

হিজরতের গোপন অভিযানের সময় এক পাহাড় কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বদদোয়ার একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারিত হয়নি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে। শুধু ধৈর্য দিয়েই তিনি এ সকল কঠোর পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

অনুরূপভাবে, মক্কায় তাঁকে যাদুকর, গণক ও পাগল বলে গালি-গালাজের ঝড়ের মুখে অটল পাহাড়ের মতো ধৈর্য ধারণ করেছেন।

নবী ইবরাহীম (আ)-কে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় তাঁর কোন পেরেশানী ছিল না। সন্তুষ্টচিত্তে ও হাসিমুখে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

খাব্বাব বিন আদী (রা)-কে মক্কার কোরাইশরা যখন হত্যার উদ্দেশ্যে শূলে চড়ানোর প্রস্তুতি নেয় তখন চরম ধৈর্য ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কোন শব্দ ও পেশোনী উচ্চারিত হয়নি।

একদিন হযরত ওমর (রা) মসজিদে হাঁটার সময় তাঁর পা এক শোয়া ব্যক্তির গায়ে লাগে। লোকটি বললো, তুমি কি পাগল? ওমর (রা) উত্তর দিলেন, 'না'। খলীফা ওমরের রক্ষীরা বললেন, হে আমীরুল মোমিনীন! এই বে'আদব লোকটিকে শাস্তি দেয়া দরকার। খলীফা বললেন, সে জিজ্ঞেস করেছে আমি পগল কিনা, আমি উত্তর দিয়েছি, 'না'। এরপর আর শাস্তির কি থাকতে পারে?

ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনকে সুখী ও উত্তেজনামুক্ত রাখার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আর রমযান এ ধৈর্যের সওগাত নিয়েই বছরে একবার আমাদের দুয়ারে হাজিরা দেয়।

২১শ শিক্ষা

রমযান কঠোর শ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস

রমযান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম ও শ্রম সাধনার প্রশিক্ষণের মাস। পরবর্তী এগার মাসে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য এই মাসে বার্ষিক প্রশিক্ষণের ৩০ দিনব্যাপী দীর্ঘ কোর্স সমাপ্ত করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স। আমরা জানি, যে কোন কাজের জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। লেখা-পড়ায় পরিশ্রম আছে। রুজি-রোজগারেও পরিশ্রম আছে। কৃষিকাজ, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ, যুদ্ধ, সন্ধি, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীনি আন্দোলন ও জিহাদ ইত্যাদি কাজে পরিশ্রম রয়েছে। বরং যে যত বেশী পরিশ্রম করবে তার সাফল্যও ততবেশী হবে। গোটা বছরের এবাদত তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য ইসলামী দায়িত্ব পালনেও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। রোযা মানুষকে কিভাবে এই কঠোর শ্রমের ট্রেনিং দেয় ?

দুনিয়ায় মানুষের চেষ্টা-তদবীরকে দুইভাবে ভাগ করা যায়।

১. ভোগ-বিলাসের জন্য কামাই-রোজগারের চেষ্টা।

২. পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির জন্য আল্লাহর এবাদতের চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

মানুষ সাধারণতঃ প্রথমোক্ত কাজেই নিজের বেশীরভাগ সময়, মেধা ও যোগ্যতাকে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য হলো, গাড়ী-বাড়ি ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের প্রাচুর্য অর্জন করা। আর এ সকল কিছুর মূলে হচ্ছে, ভালভাবে পানাহার করা, সুস্বাদু ও ভাল খাবার গ্রহণ করা এবং নিজের রসনা পূর্ণ করা ও ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করা। কিন্তু রোযা মানুষের এই সর্বাধিক প্রিয় চাহিদার লাগাম টেনে ধরে পুরো দিন সুস্বাদু খাবার থেকে বিরত থাকতে বলে।

যেই খাবারের জন্য গোটা দুনিয়ায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে এবং লড়াই-ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত রয়েছে, সেই মানুষকে খাবার থেকে পুরো দিন বিরত রাখা যে কি কষ্ট তা আমরা অন্য মাসে তুলনা করে বুঝতে পারবো। অন্য মাসে সকালের

নাস্তা কিংবা দুপুরের খাবার যদি নির্ধারিত সময়ের চাইতে ১/২ ঘন্টা দেরী হয় তখন আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং আর কাজ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করি। তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও আমরা খাওয়ার কথা বলে বিরতি নিতে পারি। একবেলা খাওয়া বন্ধের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা দেরীতে খাবারের ক্লান্তি ও দুর্বলতার মানসিকতা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। অথচ রমযানে একাধারে দুই বেলা খাওয়া বন্ধ রাখা হয়। এতে অবশ্যই কষ্ট আছে। কিন্তু সেই কষ্ট ২ দিন, ৪ দিন কিংবা ১ সপ্তাহ পর্যন্ত হলেও মনকে শান্ত্বনা দেয়া যেত। কিন্তু দীর্ঘ ১টি মাস এভাবে পরিশ্রম করতে হয়।

পানির পিপাসার কষ্ট তো খাবারের চাইতেও মারাত্মক। কোন পরিশ্রম বা কাজ করে আসার পর খানা একটু দেরীতে হলেও চলে। কিন্তু পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যায়। রোদ থেকে আসলে তো আরো ভয়াবহ অবস্থা! কিন্তু রোযার মধ্যে তো দিনে খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ। দীর্ঘ ৩০ দিন যাবত একটানা এত কঠোর পরিশ্রম। এ ছাড়াও রয়েছে মানুষের পরবর্তী প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় যৌন বাসনা পূরণ করা। কিন্তু রোযার মধ্যে দিনে তা নিষিদ্ধ। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর তুলে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করা হয় দীর্ঘ এক মাসব্যাপী এই রমযানে।

সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার। কিন্তু শরীরের অবস্থা হচ্ছে খুবই দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত। তখন যদি ইফতারের পর শুয়ে আরাম করা যেত, কতইনা ভাল হতো! কিন্তু সামান্য পরেই একামতে বলা হচ্ছে, 'কাদ কামাতিস সালাহ' অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্তির দাবী ছিল, মাগরিব না পড়া ও রমযানে তা মাফ করে দেয়া কিন্তু তাতো হয়নি। উল্টো আরো বলা হচ্ছে, রমযানের এক ফরয অন্য সময়ের ৭০ ফরযের সমান এবং এক রাকাত নফল নামায অন্য সময়ের এক রাকাত ফরয নামাযের সমান।

মাগরিব থেকে আসার পর শরীরের দাবী হচ্ছে, পূর্ণ বিশ্রাম তথা ঘুম। কিন্তু একটু পরেই রয়েছে, এশা ও তারাবীর নামাযের আহ্বান। অবসাদগ্রস্ত শরীরের যেখানে এশা পড়াই দায়, সেখানে আবার রয়েছে তারাবীর মতো অতিরিক্ত নামাযের ব্যবস্থা। তাও যদি ২/৪ রাকাত হতো, তাহলে কোন রকম চলতো। কিন্তু তা কমপক্ষে ৮/১০ রাকাত থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত। যদি তা সংক্ষিপ্ত সূরার মাধ্যমে শেষ করা হতো, তাহলেও বাঁচা যেত। কিন্তু তাতেও আবার খতমে কোরআন উত্তম। বলতে গেলে পরিশ্রমের উপর পরিশ্রম এবং কষ্টের উপর কষ্ট। যাকে বলে শাঁকের উপর আঁটির বোঝা।

তারাবীর নামায শেষ করে ফিরে এসে ফজর পর্যন্ত একটানা শুয়ে থাকা হচ্ছে ক্লান্ত শরীরের অনিবার্য দাবী, কিন্তু তাও পূরণ করা যাচ্ছে না। ভোর রাত্রে উঠে সেহরী খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সারা রাত জেগে জেগে এবাদত ও তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ। এর দ্বারা কি এ কথা বুঝা যায় না যে, রমযানে আরামের সর্বশেষ চিহ্নটুকুকেও মুছে দেয়ার চেষ্টা কার্যকর আছে ? পরিশ্রমের উত্তম কর্মসূচী এর চাইতে আর কি হতে পারে ? দীর্ঘ একমাস একটানা এই কঠোর শ্রম-সাধনার পেছনে আল্লাহর যে ইচ্ছা কাজ করে, তা হলো, মুসলিম মিল্লাত কখনো অলস, শ্রম বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। জগতের চাকাকে সচল রাখার জন্য তাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। তাহলে, আল্লাহর কোন আদেশ নিষেধই তাদের কাছে কঠিন মনে হবে না। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'মোনাফিকরা নামাযকে কঠিন মনে করে অথচ মোমিনদের কাছে তা কঠিন নয়।' (আল-কোরআন)

একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই প্রশিক্ষণের সুযোগ দিলে কারুর পক্ষেই ৩০ দিনব্যাপী রোযা রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু রমযানের বরকতে আল্লাহ এ সকল কষ্ট এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, রমযান কিভাবে শেষ হয়ে যায় রোযাদারেরা তা টেরও পায় না।

২২শ শিক্ষা

রমযান দাওয়াতে দ্বীনের মাস

রমযান হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াতের সর্বোত্তম মাস। যেহেতু এই মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে, তাই মানুষকে কোরআনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াতে দ্বীন ছিল সকল নবীর গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমন কোন নবী আসেননি, যিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেননি। সকল নবীর মূল দাওয়াত ছিল ঃ

اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই।' (সূরা আরাফ ঃ ৫৯)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দাওয়াত শুধু আল্লাহর এবাদতের দিকে হবে, দুনিয়াবী স্বার্থ কিংবা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে নয়। এতে কোন বংশীয়, দেশীয় এবং জাতীয় স্বার্থ থাকতে পারবে না। দাওয়াতে দ্বীনের পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাও থাকতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ -

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদের কাছে দাওয়াতে দ্বীনের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না।' (সূরা শোয়ারা ঃ ১২৭)

দাওয়াত অমুসলমান ও মুসলমান সবার কাছেই দিতে হবে। মুসলমানদের দুর্বল আকীদা-বিশ্বাস এবং আমল-আখলাক মজবুত করার লক্ষ্যে তাদের কাছে দ্বীনের শিক্ষা তুলে ধরতে হবে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং জাগতিক লোভ-লালসায় তাদের আমল দুর্বল হতে থাকে। দাওয়াতে দ্বীনের মাধ্যমে তাদের মন-মগজকে পরিশুদ্ধ করে আমলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়। যেমন ভোঁতা ছুরি ঘষে ধারালো করতে হয়। আল্লাহ দ্বীনের দাওয়াতকে অত্যধিক পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলমান ঃ' (সূরা হা-মিম আস সাজদাহ-৩৩)

তাই এই দাওয়াতী কাজ যারা করবেন তাদেরকেও তিনি ভালবাসবেন স্বাভাবিকভাবে। হাদীসে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ـ

অর্থ ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)কে বলেছেন ঃ হে আলী! একজন মানুষকে হেদায়াত করতে পারা দুনিয়ার সর্বোত্তম নিয়ামত।' (বোখারী, মুসলিম)

এই হাদীসে মানুষের প্রতি দাওয়াতী কাজ করে তাদেরকে হেদায়াত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এটাকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত বলা হয়েছে। যার কথা ও কাজ দ্বারা যত বেশী লোক হেদায়াত লাভ করবে কিংবা সংশোধন হবে, সে ব্যক্তি ততো বেশী সওয়াব ও নিয়ামতের অধিকারী হবে। অমুসলমানদের প্রতি দাওয়াতী কাজের গুরুত্বও অপরিসীম। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমেই বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ তৈরি হয়েছে। দাওয়াতে হেদায়াত প্রাপ্ত লোকের আমলের সমান সওয়াব পাবেন দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি। একজন দায়ী ইলাল্লাহর সৌভাগ্য কত বেশী। সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

দাওয়াতী কাজের এই গুরুত্ব আরেকটি হাদীস থেকেও ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা আমার কাছ থেকে ১টি আয়াত হলেও তা পৌছাও।'

এই হাদীসে বলা হয়েছে, যে যতটুকুই জানে, এমনকি একটি বিষয় জানলেও তা মানুষের কাছে পৌছাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতে বিদায় হজ্জের ভাষণের শেষে বলেন ঃ 'তোমাদের যারা উপস্থিত, তারা অনুপস্থিত লোকের কাছে পৌছাবে।' এই হাদীস দ্বারাও দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রমযানের মাধ্যমে সমাজে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দাওয়াতী কাজ হচ্ছে সেই পরিবেশ সৃষ্টির হাতিয়ার।

মালেক বিন দীনার (র) বলেন, আল্লাহ এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, অমুক জনপদটি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরজ করলেন, ঐ জনপদে আপনার অমুক আবেদ বান্দা রয়েছে। নির্দেশ এলো, তাকেও আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাও। কারণ, আমার বান্দাদের নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত দেখেও তার চেহারা কখনও বিবর্ণ হয়নি। (মাআরেফুল কোরআন, সূরা মায়েদা-৬৩)

হযরত ইউশা বিন নুন (আ)-এর প্রতি অহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে ৪০ হাজার সৎ লোক এবং ৬০ হাজার অসৎ লোক। ইউশা নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানা আছে, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এলো, ঐ সৎ লোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো, তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগ দিতো। আমার নাফরমানী ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠেনি। (মাআরেফুল কোরআন, সূরা মায়েদা ঃ ৬৩)

এখন আমরা দাওয়াতী কাজের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবো।

দাওয়াতের শর্ত

১. এখলাস ঃ

আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা ও আল্লাহর কাছে আশাবাদের ভিত্তিতে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। লোক দেখানো কিংবা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কাজ করা যাবে না।

২. আগে নিজে আমল করতে হবে ঃ

দা'য়ী ইলাল্লাহকে আগে আমল করতে হবে এবং পরে লোকের কাছে দাওয়াত দিতে হবে। নিজে আমল না করে অন্য লোককে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া লজ্জার বিষয়। আল্লাহ বলেন ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা কি লোকদেরকে নেক কাজের আদেশ করো এবং নিজেদের কথা

ভুলে যাও ? অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাব পাঠ করো; তোমরা কি জ্ঞানের অধিকারী নও ?' (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী বলা যায়, নিজেই যেখানে রোগী, সেখানে আগে নিজের চিকিৎসা না করে অন্যের চিকিৎসার মানে কি ? আগে তো নিজের রোগ সারাতে হবে! তবে এখানে একটা চিন্তার বিষয় আছে। তাহলো, মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীন আমলকারী হয়ে দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ আমলকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করে। আর উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যে যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী, সে ততটুকু আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে এবং তার পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগ করবে। উপরে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্যও তাই। তোমরা এক আয়াত হলেও প্রচার করো ও পৌছিয়ে দাও।'

৩. দাওয়াতে নম্র ভাব ঃ

দাওয়াতের ভাষা, উপস্থাপনা, ভাব বিনিময় ও ব্যবহার হবে নমনীয় ও কোমল। দাওয়াত দানের সময় কঠোরতা ও রূঢ়তার প্রদর্শন করা যাবে না। কোরআন বলছে ঃ

فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى -

অর্থ ঃ 'তোমরা উভয়ে তাকে নরম সুরে বলো, সম্ভবতঃ সে স্মরণ করবে কিংবা ভয় করবে।' (সূরা ত্বহা ঃ ৪৪)

মূসা ও হারূন (আ)কে ফেরাউনের কাছে গিয়ে নরমভাবে দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ হতে পারে, সে ভাল হবে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ 'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি (নবী) লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। তুমি যদি রূঢ় ও পাষাণ অন্তরের অধিকারী হতে, তাহলে এসব লোক তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো।'

৪. পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দান ঃ

লোকের কাছে পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দিতে হবে। প্রথমে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও পরে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দাওয়াত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি যখন মোয়াজ (রা)কে ইয়েমেন পাঠান, তখন বলেন, তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব। তুমি তাদেরকে প্রথমে কালেমার দাওয়াত দেবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

৫. কৌশল অবলম্বন করা ঃ

দাওয়াতে সম্ভাব্য সকল প্রকার কৌশল, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা ও হেকমত অবলম্বন করতে হবে। দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রামবাসীর জন্য যে আবেদন হবে, শহরবাসীর জন্য তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। অনুরূপভাবে শিক্ষিতের জন্য আবেদন, অশিক্ষিত লোকের আবেদনের চাইতে ভিন্ন রকমের হবে।

৬. সুন্দর বক্তব্য পেশ ঃ

দাওয়াতের জন্য সুন্দর বক্তব্য পেশ করতে হবে। কোরআনে এটাকে 'মাওয়েজায়ে হাসানাহ' বলেছে। এর ভেতর বহু কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন, সুন্দর উপমা ও বাগধারা প্রয়োগ, সুন্দর গল্প-কাহিনী ও সুন্দর প্রবাদ ইত্যাদি। এছাড়াও দাওয়াত পেশ করার সুন্দর পদ্ধতিসহ যুক্তিতর্কও এর অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত দুটো বিষয়ে কোরআন বলছে ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

অর্থ ঃ 'হে নবী! তোমার রবের পথে লোকদেরকে ডাক হেকমত এবং সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে।' (সূরা নাহল ঃ ১২৫, ১৬৪, ১৮০)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং শ্রোতার মানসিকতা অনুযায়ী কথা বলতে হবে। যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শ্রোতার মন জয় করতে হবে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের ন্যায় উপযুক্ত রোগ নির্ণয় করে যথার্থ চিকিৎসা করতে হবে।

৭. ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দাওয়াত দিতে হবে ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ ঃ 'তাদের সাথে বিতর্ক করবে অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থায়।' (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ ঃ 'মন্দ ও অন্যায়কে সর্বোত্তম পন্থায় মোকাবিলা করো।' (আল-মোমিনুন ঃ ৯২)

এই আয়াত দু'টিকে সামনে রাখলে, একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যার বা যাদের কাছে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে, তাদের বক্তব্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দাওয়াত দিতে হবে। তবে এর উদ্দেশ্য কিছুতেই ঝগড়া-বিবাদ অথবা ব্যাপক বিতর্কে জড়ানো নয় কিংবা কথার দাপটে আপাততঃ কাউকে মজলিশে দমন করে

দেয়া নয়। যতটুকু সম্ভব, আলোচনাকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য যুক্তি পেশ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। কেউ গঠনমূলক প্রশ্ন করলে তার চাহিদা পূরণের জন্য সুন্দর উত্তর দিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি বিতর্কের খাতিরে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে সেখানে সময় নষ্ট না করে যারা গঠনমূলক প্রশ্ন করে তাদের জবাবে সময় ব্যয় করা ভাল। সমাজে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে উল্টা-পাল্টা প্রশ্নকারীর সংখ্যা খুবই কম। পক্ষান্তরে জানা ও গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক প্রশ্নকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। তাই তাদের পেছনেই দাওয়াতে বেশী সময় ও শ্রম ব্যয় করা উচিত।

উপরোক্ত আয়াতে আরো বলা হয়েছে, মন্দ কাজের মোকাবিলা উত্তম পন্থা তথা নেক কাজ দ্বারা করতে হবে। কোন সময় ক্ষমা করা নেক কাজ ও উত্তম পদ্ধতি হতে পারে। কারুর শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক আচরণের জবাবে চুপ করে থাকলে, কিংবা তাকে ক্ষমা করে দিলে, শত্রুও বন্ধু হতে বাধ্য। অথবা কারুর গালির জবাবে তার কল্যাণ কামনা করলে সেও দা'য়ীকে আপন মনে করতে থাকবে।

৮. কট্টর বিরোধীদের কাছে দাওয়াতের পদ্ধতি ঃ

হাতে গোনা সামান্য কিছু লোক বাদ দিয়ে দুনিয়ার অধিকাংশ লোক সত্য প্রিয়। সত্যের দাওয়াত পেলে তারা সাথে সাথে তা গ্রহণ করে। কোন কোন সময় বিভিন্ন কারণে দাওয়াত গ্রহণ করতে ইতস্তত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাওয়াত কবুল করে। সেই কারণগুলো হলো, দা'য়ীর দুর্বল ব্যক্তিত্ব, দাওয়াতের ভুল পদ্ধতি, যাকে যা বলা দরকার সেটা থেকে ভিন্ন কিছু বলা, বন্ধু-বান্ধবের ভুল পরামর্শ, সমাজের সম-সাময়িক পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ এবং দ্বীনি জ্ঞানের অজ্ঞতা অন্যতম। কিন্তু আন্তরিকভাবে বলিষ্ঠ পদ্ধতিতে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে লেগে থাকলে অবশ্যই সাফল্য আসবে। দাওয়াত দান ও গ্রহণের এই স্বল্প পরিসরে দা'য়ীর চরিত্র ও আখলাক সিদ্ধান্তকারী বিষয়। দা'য়ীকে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

কোন গ্রাম, মহল্লা ও এলাকার দিকে তাকালে দাওয়াতের কট্টর বিরোধী লোকের সংখ্যা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হবে। তাদের কাছেও দাওয়াত দিতে হবে নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য। কোরআনে এসেছে ঃ وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاغُ.

অর্থ ঃ 'আমাদের দায়িত্ব হলো পৌছিয়ে দেয়া।' দাওয়াত গ্রহণ ও বর্জনের দায়িত্ব হলো যার কাছে দাওয়াত পৌছানো হয়েছে তার। আর কট্টরপন্থীদের কাছে যথাযথভাবে দাওয়াত পৌছানোর পর দা'য়ীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। যেমন

রাসূলুল্লাহ (সা) আবু জাহেল, আবু লাহাবসহ অন্যান্য কট্টর বিরোধীদের কাছে সুযোগ পেলেই দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ وَاَنْتَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى -

অর্থ ঃ 'হে নবী, আপনি মৃতকে শুনাতে পারবেন না।' কোরআনের পরিভাষায় কট্টরপন্থীরা মৃতলোকের মতো। তাদের কাছে কোন ভাল কথা পৌছানো সম্ভব নয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ আমরা তাদের আগে পিছে প্রাচীর তুলেছি এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। তাদের জ্ঞান চক্ষুর সামনে ও পেছনে অন্তরায় সৃষ্টি করায় তারা ভাল কিছু দেখতে ও বুঝতে পারে না। সে জন্য তারা দাওয়াত কবুল করে না। (সূরা ইয়াসিন ঃ ৯)

এ কথাটাই আল্লাহ ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন অন্যত্র। তিনি বলেন ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের কান ও চোখের মধ্যে রয়েছে পর্দা।' (সূরা বাকারা ঃ ৮)

এ যাবত কট্টরপন্থীদের সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনায় ৩টি বিশেষণ ফুটে উঠেছে। ১. তারা মৃতলোকের মতো শুনতে অক্ষম, ২. তাদের আগে পিছে বাধার প্রাচীর এবং তাদের কান দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে অন্তরায়, ৩. তাদের অন্তর সীল করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের কান ও চোখে পর্দা পড়েছে। যে কারণে তারা ভাল কথা বুঝতে ও শুনতে পারে না।

এ সকল বিশেষণের পর তাদের কাছে দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করা কি কারুর পক্ষে সম্ভব ? তাই তাদের পেছনে বেশী কাঠ-খড় পোড়ানো উচিত নয়। তারা কিছুতেই আসবে না। বরং এই সময়টা অন্য লোকের পেছনে ব্যয় করলে লাভ বেশী।

দাওয়াত দেয়ার সময় বুঝা যায় কার মন দাওয়াতের জন্য উর্বর। সেই জমীনেই চাষ করতে হবে, বীজ বুনতে হবে, সার দিতে হবে, নিড়ানী দিতে হবে, পরগাছা উপড়ে ফেলতে হবে এবং সবশেষে ফসল নষ্টকারী কীটনাশক ওষুধ দিতে হবে। তাহলেই বেশী ফসল লাভ করা যাবে। পক্ষান্তরে অনুর্বর ভূমিতে চাষ করে সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কট্টরপন্থীদের উদাহরণ

হলো, অনুর্বর চাষের জমির মতো। সেখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে চরমপন্থী কাফেরগণ আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্যদের মতো ইসলাম গ্রহণ করবে। কিংবা বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে ওমার ফারুক (রা) ও খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো দাওয়াত কবুল করবে।

নামে মাত্র মুসলমান চরমপন্থীরা বয়োবৃদ্ধ হয়ে জীবনের শেষ প্রহরে উপনীত হলে, কোন দুর্ঘটনার থেকে হঠাৎ করে শিক্ষা গ্রহণ করলে কিংবা নিজ আপনজনের মৃত্যুতে তাদের বোধোদয় শক্তি ফিরে আসতে পারে। সারা জীবনে ভাল দা'য়ীর সংস্পর্শে এসেও অনেকে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে থাকে। তাই তাদের ব্যাপারে দাওয়াতদানকারীর কোন পেরেশানী নেই, বরং দাওয়াত পৌঁছানোর আনন্দই রয়েছে।

কট্টরপন্থীদের বিরোধিতার জবাবে আল্লাহ মোমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ ঃ ভাল ও মন্দ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দকে অতি উত্তম ভাল দ্বারা দূর করো। তাহলে, তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ই ভাগ্যবান। তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব করো তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা হা-মিম আস-সাজদাহ ঃ ৩৪-৩৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কোরআনে[১] যে চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো ঃ পাপ খুবই দুর্বল। দুর্বলতা এর ভেতরে নিহিত রয়েছে। আর সে জন্যই শেষ পর্যন্ত তা চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কেননা, পাপী মানুষও এক পর্যায়ে পাপকে ঘৃণা না করে পারে না। বিরুদ্ধবাদী পাপীরা এ কথা

১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

ভাল করেই বুঝে যে তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য অন্যায়ভাবে জিদ করছে। তাদের নিজেদের অন্তরেই একজন চোর বসে আছে। অপরদিকে 'নেক' নিজেই শক্তিশালী। তাই লোকের কাছে পাপ টিকে থাকতে পারে না।

উপরের আয়াতে পাপের মোকাবিলা কেবল নেক দ্বারা করার কথা বলা হয়নি। বরং অপেক্ষাকৃত উন্নত ও উচ্চমানের নেক দ্বারা মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে। যেমন অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেয়া একটা নেক কাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে উচ্চমানের নেক কাজ হলো বিরুদ্ধবাদীর খারাপ আচরণের মোকাবিলায় সুযোগ মতো ভাল ব্যবহার করা। এর পরিণামে নিকৃষ্টতম দুশমনও শেষ পর্যন্ত প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ হওয়াটাই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি।

গালির মোকাবিলায় চুপ করে থাকাটা নেক কাজ, কিন্তু তাতে গালি বন্ধ হবে না। কিন্তু গালির মোকাবিলায় তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলে, সে যত নির্লজ্জ বিরুদ্ধবাদীই হউক না কেন, লজ্জিত হবে। তারপর খারাপ কথা বলার জন্য মুখ খুব কমই খুলবে। কোন সময় যদি বিরুদ্ধবাদী লোকটিকে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তাহলে সে দা'য়ীর খুব নিকটতর হবে। কেননা, এই নেকের মোকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, এই নিয়মটা কোন কোন বিরুদ্ধবাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রযোজ্য। দুনিয়ায় এমন খবীস প্রেতাত্মার লোকও আছে যারা শত আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার মুখেও দংশন থেকে বিরত হয় না।

নিঃসন্দেহে এই কাজ করার জন্য বড় মনোবল, বলিষ্ঠ আত্মা, বিরাট সাহসিকতা, দৃঢ় সংকল্প এবং ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন। দুই একদিন হয়তো যে কেউ এ রকম দু'একটা উদাহরণ স্থাপন করতে পারে। কিন্তু যারা দা'য়ী হিসেবে অব্যাহতভাবে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করবে তাদের জন্য এটা বিরাট কষ্ট ও ধৈর্যের পরীক্ষা।

শয়তান যখন দেখে যে, হক বাতিলের সংঘর্ষে নীচতা ও হীনতার মোকাবিলায় শালীনতা এবং পাপের মোকাবিলায় নেক আচরণ প্রদর্শন করা হচ্ছে, তখন সে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। তখন শয়তান আরেকটি ভিন্নপথ খুঁজতে থাকে। সে চায় যে কোনোভাবেই হউক, সত্যের সৈনিক কিংবা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিশোধমূলক কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হউক। এর ফলে, তিলকে তাল বানিয়ে তার প্রচার ও প্রকাশ করা সম্ভব হবে এবং বলবে যে, দেখ, অন্যায় একতরফা হচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে মুসনাদে ইমাম আহমদ আবু হোরায়রা (রা) থেকে একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি আবু বকরকে (রা) গালাগাল করছিল। আবু বকর (রা) চুপ থাকলেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসলেন। শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রা) অধৈর্য হয়ে ঐ ব্যক্তিকে গালির জওয়াবে একটি শক্ত কথা বললেন। তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি বাইরে চলে যান। আবু বকর (রা)ও পেছনে পেছনে গেলেন। পথে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় রাসূলুল্লাহ (সা) জওয়াবে বললেন, আমার মুচকি হাসার কারণ হলো তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিলেন এবং তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিচ্ছিলেন। কিন্তু তুমি নিজেই যখন কথা বলে উঠলে, তখন ফেরেশতার সাথে শয়তান এসে বসলো। আমি তো আর শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

এই ঘটনাটি উপরোক্ত আয়াতের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা। ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে, চরম ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

দাওয়াতের পদ্ধতি

দাওয়াতে দ্বীনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১. কাউকে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া। তাকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় বুঝানো। বিশেষ করে কালেমার মূল অর্থ ও তাৎপর্য, রেসালাত, কিতাব ও আখেরাত সম্পর্কে ভাল করে বুঝাতে হবে এবং ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিসের অভাব থাকলে সে সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করতে হবে। ব্যক্তি যোগাযোগ দাওয়াতী কাজের উত্তম হাতিয়ার।

২. দুই তিনজন মিলে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৩. সভা, বৈঠক ও জনসভায় বক্তৃতা করে দাওয়াত দেয়া যায়। সেমিনার, সিম্পোজিয়ামও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষাদান করবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই কাজ চালু করা দরকার।

৫. দাওয়াতী চিঠি, বই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, উপহার প্রেরণ ইত্যাদিকেও দাওয়াতী কাজের উত্তম উপায়ে পরিণত করা যায়।

আধুনিক উপায় উপকরণ ও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যায়। যেমন– পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদি।

দাওয়াতের ফলাফল

১. নবীদের দাওয়াতী উত্তরাধিকার লাভ করা যায়। সকল নবী দা'য়ী ছিলেন।

২. শিক্ষক ও দাওয়াত দানকারীর জন্য সাগরের মাছসহ অন্যান্য সৃষ্টি গুনাহ্ মাফ চায়। (আল-হাদীস)

৩. দ্বিগুন সওয়াব লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى سُنَّةٍ حَسَنَةٍ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ دُوْنَ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ـ

অর্থ ঃ 'যে কোন ভাল সুন্নাতের পদ্ধতির দিকে দাওয়াত দেয়, সে ঐ ডাকে সাড়া দানকারীদের সওয়াবের সমান সওয়াব পায়। এতে করে অনুসারীদের সওয়াব হ্রাস করা হয় না।' (মুসলিম)

৪. দাওয়াতী কাজ করার ফলে দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তি দা'য়ীতে পরিণত হয়।

৫. দাওয়াত দানকারী ইমামত ও নেতৃত্বের যোগ্য হয়। আল্লাহ্ ইমামদের প্রশংসা করে ইমাম হওয়ার দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ, আমাদেরকে মোত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দেন।' (সূরা ফোরকান ঃ ৭৪)

পুণ্যের মাস রমযানে বেশী দাওয়াতী কাজ করে বেশী সওয়াব অর্জনের চেষ্টা করা জরুরী। এই মাস দা'য়ীদের বেশী সক্রিয় হওয়া দরকার।

২৩শ শিক্ষা

রমযান সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের মাস

রমযান মাসসহ অন্যান্য সময়েও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ ফরয। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় একে 'আমর বিল মারূফ ও নাহ্য়ি আনিল মোনকার' বলা হয়। সমাজের মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত ও শিক্ষা দান সত্ত্বেও সকল মানুষ হেদায়াত গ্রহণ করবে না ও সৎ হবে না। কেননা, মানুষ ও জ্বিন শয়তান সমাজে বিরাজ করছে। তারা কখনও ভাল হয় না। তাই সমাজ সংশোধনের পরবর্তী কাজ হলো, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ। এটা না করলে সৎ ও ভাল মানুষগুলোকে দ্বীনের পথে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ' 'চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।' তাই এই অপশক্তির প্রতিরোধ করতে হবে শক্তি প্রয়োগ করে। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের মধ্যেই শক্তি প্রয়োগের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

রমযানের রোযা ফরয। কিন্তু অনেকেই এই ফরয রোযা রাখতে চায় না। অনুরূপভাবে নামায, যাকাতসহ অন্যান্য ফরয কাজগুলোও আদায় করতে চায় না। এছাড়াও হারাম কাজ করতে কেউ কেউ আগ্রহী। যেমন- মদ, সুদ, ঘুষ, জুয়া, যেনা, ধোকা দেয়া, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি। শক্তি প্রয়োগ করে এগুলো বন্ধ করতে হবে।

রমযানের মধ্যে সকল শয়তানদের শিকল দিয়ে বাঁধা হয় না। শুধুমাত্র বড় শয়তানগুলোকে বাধা হয় বলে রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাদীসে তা আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ -

অর্থাৎ বড় বড় শয়তানগুলোকে বাঁধা হয়। ফলে, ছোট শয়তানগুলো রমযান মাসে রোযা না রাখাসহ অন্যান্য পাপ কাজের ইন্ধন যোগায়। যেমন, হোটেল ব্যবসায়ীকে হোটেল খোলা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। ছাত্রাবাসের ডাইনিং হল খোলা রাখা কিংবা ঘরে খাবার রান্না করে রোযা ভাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজের

দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসহ সরকারকে এর মোকাবিলা করতে হবে ও তা বন্ধ করতে হবে। এই কাজকে ফরয ঘোষণা করে কোরআন বলছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ জাতি বা দল, যাদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (আলে-ইমরান-১১০)

এই আয়াতে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সকল ব্যক্তি ও সদস্যের জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর একটি অংশকে এইকাজে নিয়োগ করে উম্মাহর অবশিষ্ট সদস্যরা মুক্তি পেতে পারে। শর্ত হলো, যদি ঐ কাজ দু'টো সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এক দল কাজটি ঠিকমত আদায় করলে অন্যদের জন্য তা আর বাধ্যতামূলক থাকবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা দরকার যারা ভাল কাজের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে।' (সূরা আলে এমরান ঃ ১০৪)

আল্লাহ মোমিনের পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اُولٰئِكَ يَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ 'মোমিন পুরুষ ও নারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।' (সূরা তাওবা ঃ ৭১)

এই আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ, নামায, যাকাত ও

অন্যান্য আনুগত্যকে মোমিনের জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই দায়িত্ব কিভাবে আঞ্জাম দিতে হবে। ১. ব্যক্তিগত, ২. সামষ্টিক। ব্যক্তিগতভাবে যে যেখানে ও যে অবস্থায় আছেন, সে অবস্থাতেই সম্ভাব্য উপায়ে যথাসাধ্য এ কাজ দু'টো আঞ্জাম দেবেন। এক্ষেত্রে কোন অবহেলা করা চলবে না। সামষ্টিক পর্যায়ে যাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তারা হলেন ঃ (১) পরিবার প্রধান, (২) মসজিদের ইমাম, (৩) কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এবং ক্লাব ও হাসপাতালের প্রধান ব্যক্তি, (৪) কোন কমিটি ও সংস্থার প্রধান, প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান, (৫) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যেমন– ব্যাংক, বীমা, চেম্বার অব কমার্স, বণিক সমিতি ইত্যাদির প্রধান, (৬) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। (৭) সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও মন্ত্রীবর্গ, (৮) সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টাবৃন্দ। তারা নিজ নিজ পরিসর ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহী করবেন। তার মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ অন্যতম। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে হলে, নিম্নের হাদীসটিকে সামনে রাখতে হবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهٖ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ -

অর্থ ঃ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। সুতরাং যিনি নেতা এবং মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। পুরুষ বা পরিবার প্রধান তার পরিবারের লোকদের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করেন, সুতরাং তাকে পরিবারের অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। স্ত্রী হচ্ছেন নিজ স্বামীর ঘরের গৃহকর্ত্রী এবং তার সন্তানের তত্ত্বাবধায়িকা। তাই তাকে তাদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানকে দায়িত্বশীল কর্তা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দাওয়াতে দ্বীনের পরই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ না করলে যথার্থ দায়িত্ব পালন করা হবে না। যেমন, পিতা পরিবারের প্রধান হিসেবে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেবেন। তিনি তাদেরকে নামায, রোযা, আদব, আখলাক, শিক্ষা-দীক্ষার নির্দেশ দেবেন এবং মিথ্যা, আমানতের খেয়ানত, নিন্দা, চুরি, কিংবা নামায ও রোযা না করলে শাস্তি দেবেন। এইভাবে তিনি শক্তি প্রয়োগ করবেন।

অনুরূপভাবে স্ত্রী তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। বাবার মতো মা হিসেবে তাকেও একই ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি সন্তানের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন।

এছাড়া অন্যান্য সকল সংস্থা, সংগঠন, দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকেও দাওয়াতে দ্বীন এবং যথাসাধ্য শিক্ষা-দীক্ষার পর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা দায়িত্বশীলরা অধীনস্থ ছাত্র, শিক্ষক, সাথী ও কর্মচারীদেরকে ফরয ওয়াজিবগুলো পালন এবং হারাম কাজ থেকে তাদেরকে দূরে থাকতে বাধ্য করবেন। যেমন ঃ নামায, রোযা, পর্দা, সত্যবাদিতা, সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য নির্দেশ দেবেন এবং সহশিক্ষা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা, অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন। তারা আনুগত্য না করলে তাদেরকে বিভিন্ন রকম শাস্তি যেমন জরিমানা-বহিষ্কার ও শাস্তি ইত্যাদি দান করবেন।

সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের উপরও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের মূল দায়িত্ব অর্পিত হয়। সরকার সকল বিভাগকে এই কাজে নিয়োজিত করবেন। সাথে সাথে এই কাজ জোরদার করার জন্য বিশেষ বিভাগও সৃষ্টি করা যায়।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ না করার পরিণাম

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ না করলে পরকালে শাস্তিতো আছেই এমনকি এই দুনিয়াতেও আল্লাহ শাস্তি দেবেন। এ মর্মে হোজায়ফা বিন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার প্রাণ যার হাতে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে, না হয় শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের উপর নিজ আযাব পাঠাবেন। এরপর তোমরা তার কাছে দোয়া করবে কিন্তু তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।' (তিরমিযী)

এই হাদীসে দুনিয়াতেই আযাব পাঠানোর কথা বলা হয়েছে এবং এ জাতীয় লোকের দোয়া কবুল না করে তাদের দুঃখ দুর্দশা টিকিয়ে রাখার ইঙ্গিত দেয়া

হয়েছে। তাই সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, তারা কত বড় জিম্মাদারী কাঁধে নিয়েছেন। যারা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন তাদের উচিত দায়িত্ব ত্যাগ করে এমন সব লোকের হাতে তা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা যারা তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে, এতে সক্ষম না হলে মুখ দিয়ে প্রতিরোধ করবে এবং তাতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এতেও সক্ষম না হলে, অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে এবং তাতেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। তবে এটা খুবই দুর্বল ঈমান।' (নাসাঈ, মুসলিম)

এই হাদীসে মন্দ কাজের প্রতিরোধের তিনটি পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, হাত বা শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা। এর মধ্যে লিখনী শক্তিও অন্তর্ভুক্ত আছে। যদি ঐ পরিমাণ শক্তি না থাকে, তাহলে মুখ বা বাক শক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। মুখ দিয়ে প্রতিরোধের মধ্যে-প্রতিবাদ করা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি অন্যতম।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) মন্দ কাজের প্রতিরোধকে সাগরে ভাসমান দোতলা জাহাজের সালে তুলনা করেছেন। জাহাজের দোতলায় পানির ব্যবস্থা আছে। নীচতলার লোকেরা পানির জন্য বারবার উপরের তলায় যাওয়ায় তারা বিরক্ত বোধ করে। তাই নীচতলার লোকেরা জাহাজের তলা ছিদ্র করে সাগর থেকে পানি তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন যদি লোকেরা এ কাজে বাধা না দেয় তাহলে জাহাজ ডুবে উপর ও নীচতলার সকল লোক মারা যেতে বাধ্য। (মেশকাত)

এই হাদীস চোখে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করছে যে, মন্দ কাজের প্রতিরোধ না করলে খারাপ মানুষগুলোর সাথে সাথে ভাল মানুষগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সমাজকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই মন্দ কাজে বাধা দিতে হবে। অন্যথায় সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত দাঊদ (আ)-এর সময় শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একদল লোক তা অমান্য করায় তাদের উপর আযাব নেমে আসে। তারা বানর হয়ে যায়। তিন দিন জীবিত থাকার পর বানরগুলো মরে যায়। কোরআন ঐ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছে, যারা নাফরমানী করেছে তাদের সাথে ঐ সকল লোকও ধ্বংস হয়েছে যারা মন্দ কাজে বাধা দেয়নি। অথচ তারা মোমিন ছিল। যারা অসৎ কাজের প্রতিরোধ করছিল তারাই শুধু রক্ষা পেয়েছিল। তাই আজকের সমাজের

মোমিন মুসলমানদেরকেও চিন্তা করতে হবে যে, তারা আল্লাহর আযাব-গজব থেকে বাঁচার জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করছেন কিনা, না করলে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে.এবং পরকালেও।

ফযীলত

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের অনেক ফযীলত রয়েছে। আবুজার (রা) থেকে বর্ণিত, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা সকল সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের (গরীবদের) মতই নামায রোযা পালন করে কিন্তু অতিরিক্ত সম্পদ দান করে তারা অধিক সওয়াব অর্জন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য দান সদকার ব্যবস্থা করেননি ? নিঃসন্দেহে তসবীহ সদকা, তাকবীর সদকা, তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদকা, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা) সদকা ও সৎ কাজের আদেশ সদকা এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ সদকা। (মুসলিম)

এখানে অন্যান্য কাজের সাথে সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকে আর্থিক দান সদকার সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থ দান না করেও ঐ কাজের মাধ্যমে আমরা দান সদকার সওয়াব লাভ করতে পারি।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক বনি আদমের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার বলে, আলহামদু বলে, গুনাহ মাফ চায়, মানুষের চলার পথ থেকে পাথর, কাঁটা কিংবা হাড় সরায়, সৎ কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দেয় এবং এর সংখ্যা ৩৬০ হয় তাহলে সেদিনের সন্ধ্যাবেলায় তার অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মতো যে নিজেকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। (মুসলিম)

এছাড়াও অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নেক কাজের পথ প্রদর্শনকারী নেককারের মতই সওয়াব পায়। অনুরূপভাবে পাপ কাজের পথ প্রদর্শনকারী পাপীর অনুরূপ গুনাহ অর্জন করে।' হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ وَالدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهٖ -

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করলে সমাজেও এর যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে। সমাজ থেকে অন্যায় অসত্যের মূলোৎপাটন হবে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। সমাজ থেকে অপরাধ, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক, রাহাজানী, হানাহানি, মারামারি ও অশান্তি দূর হবে এবং এর পরিণতিতে দেশ একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে ও জনগণ এর সুফল ভোগ করবে।

২৪শ শিক্ষা

ক. রমযান জিহাদ ও বিজয়ের মাস

রমযান জিহাদ ও বিজয়ের মাস। জিহাদ 'জোহদ' ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ, যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করা ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইসলামের একটি মৌলিক পরিভাষা। এর অর্থ হলো, আল্লাহর দ্বীনের জন্য ছোট থেকে বড় সকল ধরনের চেষ্টা চালানো। দাওয়াতে দ্বীন থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত এর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। কোরআন ও হাদীসে মোমিনদের প্রতি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জিহাদ কষ্টকর। অনেকে জিহাদে যেতে চায় না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা জান না।' (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'ওজর ব্যতীত বসে থাকা লোক কখনো জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী লোকের সমান হতে পারে না। আল্লাহ্ বসে থাকা লোকদের উপর মুজাহিদদেরকে ফযীলত, মহান বিনিময়, সম্মান ও মর্যাদা এবং ক্ষমা ও রহমত দান করেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।' (সূরা নিসা ঃ ৬৫-৬৬)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবো না, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে ? (আর তা হলো) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, জান-মাল দিয়ে তাঁর রাস্তায়

জিহাদ করবে। তোমরা যদি বুঝ তাহলে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন, তোমাদেরকে এমনি বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার পাশ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত, সুন্দর বাসস্থান এবং আদর্শ জান্নাতে স্থান দেবেন। আর এটা হবে বড় বিজয়।' (সূরা সাফ ঃ ১০-১৩)

জিহাদের বহু ফজীলত বর্ণিত আছে। আবুজার (রা) থেকে বর্ণিত ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল উত্তম ? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'বেহেশতের মধ্যে ১শ'টি মর্যাদা (সিঁড়ি) আছে, আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য সেগুলো তৈরি করে রেখেছেন। দুইটি মর্যাদার মধ্যে আসমান ও যমীনের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান ঠিক ততটুকু ব্যবধান রয়েছে।' (বোখারী)

আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সামান্যতম সময়ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আল্লাহ তার চেহারার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেবেন।' (আহমদ)

শাহাদাত লাভ করা জিহাদের অন্যতম আকর্ষণ। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস আছে। সাহল বিন হোনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, সে বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।' (মুসলিম)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অর্থ দান করলেও বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। খোরাইম বিন ফাতেক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে তার জন্য ৭শ' গুন সওয়াব লেখা হয়।'

জিহাদে অংশগ্রহণকারী লোকদের প্রস্তুতিতে সাহায্য করলেও জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায়। যায়েদ বিন খালেদ আল জোহানী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন যোদ্ধাকে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে প্রস্তুত করে দেয় সেও গাজীর (মুজাহিদের) মর্যাদা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি যোদ্ধার অবর্তমানে তার পরিবার পরিজনকে তদারক ও সাহায্য করবে সেও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করবে। (বোখারী, মুসলিম)

এখন আমরা রমযানের সাথে জিহাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। কেননা জিহাদ ও রমযান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রমযান যেমন কোরআন নাযিলের মাস তেমনি তা কোরআন বিজয়েরও মাস। কোরআনের আদেশ-নিষেধ তথা ইসলামী

জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য এই রমযানেই গুরুত্বপূর্ণ জিহাদগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। রমযান শক্তি ও বিজয়ের প্রতীকী মাস। রমযানের বরকতেই মুসলমানরা সেগুলোতে বিজয় লাভ করেছে। মুসলমানরা এই মাসে এত বিজয় লাভ করেছে যা অন্য কোন মাসে সম্ভব হয়নি। এই মাসে এমন একটি জিহাদও নেই যাতে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। রমযান মুসলমানদের শক্তির উৎস। মুসলমানের জিহাদ ও বিজয় অভিন্ন। জিহাদ না থাকলে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে যায়।

হিজরী প্রথম সালের প্রথম রমযানে মুসলমানরা সর্বপ্রথম হামযাহ বিন আবদুল মোত্তালিবের নেতৃত্বে ছোট একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠায়। এরপর ওবায়দাহ বিন হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবের নেতৃত্বে আরো একটি ছোট মুজাহিদ বাহিনীকে অভিযানে পাঠায়। প্রথম হিজরীর রমযানে পরপর দু'টো মুজাহিদ বাহিনী পাঠানোর পর মদীনার ইহুদীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সবাই মানসিকভাবে তৈরি হতে থাকে।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশাতেই রমযানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ সংঘটিত হয়। প্রথমটি বদরের যুদ্ধ ও দ্বিতীয়টি মক্কা বিজয়। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান মুসলমানরা মদীনা থেকে দক্ষিণে বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত কাফের কোরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের শিকড় মজবুত করেন এবং ইসলাম গোটা আরব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাতিলের উৎখাত করাই ঐ যুদ্ধের লক্ষ্য।' (সূরা আনফাল)

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের ময়দানের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, তোমরা ছিলে দুর্বল।' (সূরা আলে এমরান ঃ ১২৩)

মক্কার কোরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং তৃতীয় হিজরীতে তারা ওহোদের যুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও ৭ই শাওয়ালে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু তৃতীয় হিজরীর গোটা রমযান মাসে মুসলমানরা সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫ম হিজরীতে রমযান মাসে, মুসলমানরা আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে

থাকে। যদিও তা ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও হিম প্রবাহের কারণে মোশরেকরা সৈন্য প্রত্যাহার করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে মুসলমানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীকে বিভিন্ন অভিযানে পাঠায়। তাদের মধ্যে ওক্কাসা বিন মামফী, আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহর নেতৃত্বে দুটো দল দুটো অভিযানে যায়। যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বাধীন দলটি খন্দক যুদ্ধে কোরাইশের সাথে অংশগ্রহণকারী বনি ফোজারার সাথে লড়াইতে অবতীর্ণ হন।

৭ম হিজরীর রমযান মাসে গালিবের নেতৃত্বে ১৩০ জন মুজাহিদ বনি আবদ বিন ছাকিলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হন। তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের শত্রুতা শুরু করে। যুদ্ধে গালিব বাহিনী জয় লাভ করেন।

৮ম হিজরীর ২০শে রমযান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মক্কা বিজয় হয়। বদর থেকে যে বিজয়ের ধারা শুরু হয়েছে তা মক্কা বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর গোটা আরবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। কোরআন বলছে ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ ঃ 'আমরা আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।' (সূরা ফাতহ ঃ ১)

৯ম হিজরীর রমযান মাসে তাবুক যুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়। তাবুক যুদ্ধ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। নবী করিম (সা) রমযান মাসেই তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। যুদ্ধ তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, রোমান বাহিনীকে মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করা।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় রমযানে এতগুলো ছোট ও বড় জিহাদ সংঘটিত হয়। রমযান মুসলমানদেরকে শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। আজও মহানবীর জিহাদের অনুসরণে মুসলমানরা দুনিয়ায় বিজয় লাভের জন্য মাহে রমযানে অগ্রসর হতে পারে। আল্লাহ সহায় হবেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগ শুরু হয়। ২য় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাবের আমলে, ১৫ হিজরীর ১৩ই রমযান হযরত আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ জেরুসালেম জয় করেন। মক্কার মতো মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রস্থান বায়তুল মাকদাসও এই পবিত্র রমযান মাসেই জয় করা হয়।

হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে পারস্য বিজয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা রোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তদানীন্তন পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। তারা সীমান্তবর্তী আরব মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মহানবীর (সা) জীবদ্দশায় তাঁর প্রেরিত দূতকে পরস্য সম্রাট খসরু অপমান করেন।

এছাড়াও আরবদের সাথে পারস্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কও হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই খলীফা ওমর (রা) হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাসকে মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ বানিয়ে পাঠান। কাদেসিয়ার মদয়ানে পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগারদের প্রধান সেনাপতি রুস্তমের সাথে ১৫ই হিজরীর রমযান মাসে মোকাবিলা হয়। তাতে রুস্তম নিহত হয় ও মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেন।

তদানীন্তন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্য ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার বহু চেষ্টা চালায়। হযরত আমর বিন আস ২০ হিজরীর ২রা রমযান ব্যবিলন দুর্গ অবরোধ করার পথে রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন।

উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদের শাসনামলে তাঁর সেনাধ্যক্ষ মুসা বিন নোসায়ের ৯১ হিজরীর ১লা রমযান তোরাইফ বিন মালেককে স্পেনের রাস্তা আবিষ্কারের জন্য পাঠান। তারপর ৯২ হিজরীর রমযান মাসে তারেক বিন যিয়াদের হাতে স্পেন জয় হয়। তারেক নৌকার মাধ্যমে পানি সীমা পেরিয়ে স্পেনে পৌঁছে মুসলিম সেনাবাহিনীর নৌকাগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে বলেন ঃ 'হে সৈন্যরা, তোমাদের পেছনে সাগর, সামনে শত্রুবাহিনী। আল্লাহর কসম, তোমাদের জন্য ঈমানের দাবীতে সত্যবাদিতার বাস্তবায়ন ও ধৈর্য ধারণ ব্যতীত বাঁচার আর কোন পথ নেই।' এ পরিস্থিতিতে তারা শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বিজয়ের সূর্য ছিনিয়ে আনেন।

৯৩ হিজরীর ৯ই রমযান মুসা বিন নোসাইর স্পেনে পরিপূর্ণ জয়লাভের জন্য আক্রমণ চালান। হিজরী ৯৬ সালের রমযান মাসে মোহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে অত্যাচারী সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত হয় এবং উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের শেষ আমলে সেখানে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। এই বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসারের সূচনা করে।

২১২ হিজরীর রমযান মাসে যিয়াদ বিন আগলাবের হাতে ইটালীর সিলিলি দ্বীপ জয় হয়। ২২৩ হিজরীর ৬ই রমযান, রোববার আব্বাসী খলীফা মোতাসিম বিল্লাহ বাইজানটাইন সম্রাটকে পরাজিত করে আমুরিয়া (Amuruim) জয় করেন।

বাইজানটাইন সম্রাট থিওফিল রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত মুসলিম শহর যপেট্রা (Azopetra) আক্রমণ করে শহরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়, শিশু ও পুরুষদেরকে দাস এবং মহিলাদেরকে দাসী বানিয়ে নেয়। তাদের চোখ উপড়ে ফেলে, কান-নাক কেটে ফেলে। এটা মোতাসিমের মায়ের জন্মস্থান। এ খবর শুনে তিনি দুঃখিত হন। তাছাড়া হাশেমী বংশীয় একজন বন্দী মহিলা করুণ সুরে وَامُعْتَصِمَاهُ 'হে মোতাসিম' বলে সাহায্যের আবেদন জানায়। এটা তাঁর কানে আসলে তিনি বাইজানটাইন সম্রাট থিওফিলের বাপের জন্মস্থান আমুরিয়া ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি নিজে ৫ লাখ মুসলিম সৈন্যের নেতৃত্ব দেন এবং এশিয়া মাইনরে দুই বাহিনীর যুদ্ধে থিওফিলের বাহিনী পরাজিত হয়। তারপর তিনি আংকারা এবং অবশেষে আমুরিয়ায় প্রবেশ করেন। আংকারা ও আমুরিয়ার মাঝে দূরত্ব হলো ১৪০ কিলোমিটার। বিজয় শেষে তিনি ইরাকের সামরায় ফিরে আসলে তাকে লোকেরা বিশাল সম্বর্ধনা দেয়। এর মধ্যে প্রখ্যাত কবি আবু তাম্মামের ঐতিহাসিক কবিতাও শামিল রয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় খৃস্টান গণকদের গণনাকে ভর্ৎসনা করে লিখেন ঃ

اَلسَّيْفُ اَصْدَقُ اَنْبَاءٍ مِّنَ الْكُتُبِ

فِيْ حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعِبِ ـ

'গণকের লিখিত কথা অপেক্ষা তলোয়ার অধিকতর সত্য। এর ধারের মধ্যে যথার্থতা ও খেল-তামাশার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়।

সর্বশেষ লাইনে তিনি লিখেন ঃ

فَبَيْنَ اَيَّامِكَ اللاَّتِيْ نُصِرْتَ بِهَا

وَبَيْنَ اَيَّامِ بَدْرٍ اَقْرَبُ النَّسَبِ ـ

'আপনি যে দিন বিজয় লাভ করেছেন সে দিনের সাথে বদর যুদ্ধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।' অর্থাৎ তিনি এ বিজয়কে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের বিজয়ের কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেন।

৪৬৩ হিঃ (১০৭০ খৃঃ) ২৫শে রমযান, সেলযুক রাষ্ট্রের সুলতান ও মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক আলফ আরসালান বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উপর জয়লাভ করেন। বাইজানটাইন সম্রাট ৪র্থ রোমানোস মালাজগারদ নামক ঐ যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাদের মিত্র রুশ, বৃটিশ, আর্মেনিয়ান, আকরাজ, খাজার ও গোয ক্রুসেডাররা সম্মিলিতভাবে পরাজিত হয়। মালাজগারদ এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে

আখলাত নামক স্থানের কাছে অবস্থিত। বাইজানটাইন বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৬ লাখ, আর মুসলমানরা ১৫ হাজার মুজাহিদ। তারা কাফনের কাপড় পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেলজুক রাষ্ট্রের রাজধানী খোরাসানে পৌঁছার আগেই ক্রুসেডারদের আক্রমণের সম্মুখীন হন। তিনি নিজ সাম্রাজ্যের কিছু ভূখণ্ডের বিনিময়ে রোমানদের সাথে আপোষের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে রোজাদার কাফন পরিহিত মুজাহিদীনকে নিয়ে খৃস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে শত্রুবাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

একটু পরেই রোমানোসকে বন্দী হিসেবে ধরে আনা হয়। আলফ আরসালান মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাকে মুক্তি দেন এবং তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। ১৫ হাজার দীনার উপহার সহ তাকে বিদায় করে দেন। সাথে তার অন্যান্য মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষদেরকেও মুক্তি দেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে এই বীর মুজাহিদ ৪৬৫ হিজরীতে ২ লাখ মুসলিম মুজাহিদ সহকারে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং যাইদুন নদীর উপর বিরাট পুল নির্মাণ করে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু ৪৬৫ হিজরীর ১০ই সফর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ায় তিনি চীন জয় করতে পারেননি। নচেত, আজ পর্যন্ত চীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই থাকত। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। তিনি ৪৫৮ হিজরীতে তার প্রতিদ্বন্দী শাসক ফাতেমীদের হাত থেকে মক্কা ও মদীনা এবং সিরিয়ার হালব শহর দখল করেন। ৪৫৭ হিজরীতে বাগদাদে মাদরাসা নেজামিয়া নামক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। আজ পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে কওমী মাদ্‌রাসা এরই ফসল।

৫৩২ হিজরীর রমযান মাসে এমাদুদ্দিন জংগীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী উত্তর সিরিয়ার হালব শহর জয় করেন এবং খৃস্টান ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করেন। সিরিয়া তখন রোম সম্রাটের অধীন ছিল।

১১৮৭ খৃঃ মোতাবেক ৫৮৩ হিজরীর রমযান মাসে মিসরের সুলতান সালাহ উদ্দিন ইউসুফ বিন আইউব বায়তুল মাকদেস উদ্ধারের লক্ষ্যে হিত্তিন ময়দানে পৌঁছেন এবং ১ লাখ ৬৩ হাজার খৃস্টান অশ্বারোহীকে পরাজিত করেন। মুসলিম বাহিনী জেরুজালেমের খৃস্টান রাজাকে বন্দী, ৩০ হাজার সৈন্য আটক ও অন্য ৩০ হাজার সৈন্যকে হত্যা করে বিজয় লাভ করেন। তিনি খৃস্টানদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং জেরুজালেমে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক রমযান নয় বরং রজব মাসকে জেরুজালেমের বিজয়ের মাস বলে উল্লেখ করেছেন।

তাতারের নেতা হালাকু খাঁ মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। ৬৫৮ হিজরীর সফর মাসে তার হাতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফতের পতন হয়। তাতাররা ছিল দুর্ধর্ষ, বর্বর ও অত্যাচারী। তারা ইরাক ও সিরিয়া দখরের পর মিসর অভিযানের উদ্যোগ নেয়। হালাকু খাঁ মিসরের সুলতান কোতজের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। কিন্তু মিসরীয় বাহিনী জাহের বাইবারসের নেতৃত্বে বের হন এবং ৬৫৮ হিজরীর ২৫ রমযান মোতাবেক ১২৬২ খৃঃ তাতারীদের বিরুদ্ধে আইনে জালুত নামক স্থানে উপস্থিত হন। এটি ফিলিস্তিনের নাবলুস ও সিরিয়ার বিসানের মাঝামাঝি অবস্থিত। জাহের বাইবারস জেরুজালেমের ওপর তাতারীদের আক্রমণ প্রতিহত করে বাইতুল মাকদেসকে রক্ষা এবং তাদের মিসর অগ্রাভিযান প্রতিহত করেন। এতে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার আর তাতারীরা ছিল ১ লাখ। আর তাদের ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। যুদ্ধে ১০ হাজার তাতারী সৈন্য বন্দী হয়। যুদ্ধে তাতার সেনাধ্যক্ষ কাতাবগা নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন।

জাহের বাইবারস ৬৬৬ হিজরীর রমযান মাসে, তাতারদের কাছ থেকে তুরস্ক দখল করেন। রমযান মাসে মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। ৭০২ হিজরীর রমযান মাসে মিসরীয় বাহিনী তাতারদের আরেকটি অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয় এবং দক্ষিণ দামেস্ক থেকে ১০ হাজার তাতার সৈন্য আটক করে। কনস্টানটিনোপল ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী। এর বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল। বর্তমানে এটি তুরস্কে অবস্থিত। ইস্তাম্বুল হচ্ছে ইউরোপের সাথে এশিয়ার স্থল সংযোগ সেতু।

রাসূলুল্লাহ (সা) কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে, তোমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করবে, সেই যুদ্ধের আমীর কতই না ভাল এবং সেই সেনাবাহিনীও কতই না উত্তম।[১]

রাসূলুল্লাহর (সা) এই ভবিষ্যতবাণীর সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মুসলমানরা বিভিন্ন সময় কনস্টান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা চালান।

দীর্ঘ তিন শতাব্দীব্যাপী খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে ক্রুসেডে লিপ্ত থাকে। পূর্ব বাইজাইনটাইন খৃস্টান সাম্রাজ্য, স্পেন এবং পূর্ব আরব দেশসমূহে ঐ সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন পুনরায় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে

---

১. দৈনিক আল-মদীনা, সংখ্যা ৮৭২২, জেদ্দা, তারিখ-১৭ই রমযান, ১৪১১ হিঃ।

তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। তুরস্কের ওসমানী শাসক সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতেহ্ দীর্ঘ ৫৯ দিন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার পর তা জয় করেন। তিনি পবিত্র রমযানে ১৪০৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপল প্রবেশ করেন এবং তার নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আয়াসুফিয়ায় নামায আদায় করেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কারণে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার প্রসার শুরু হয়। রমযানের এই বিজয় কতই না বকরতপূর্ণ।

রমযানের বিজয় এখানেই শেষ নয়। সর্বশেষ বিজয়ের ঘটনা হচ্ছে, মিসরের সাথে ১৯৭৩ সালের ৬ই অক্টোবর ইসরাঈলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধও রমযান মাসেই সংঘটিত হয়। এর আগে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইসরাঈল অবশিষ্ট ফিলিস্তিনসহ সিনাই ও গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। আমেরিকা ও ইউরেপের মদদপুষ্ট ইসরাঈলের সামরিক প্রাধান্য ছিল গোটা আরব মুসলিম বাহিনীর ওপর। তদুপরি সুয়েজ খালের পানি ছিল মিসরীয় বাহিনীর সম্মুখে বিরাট বাধা। এছাড়াও বালুর বিরাট প্রতিবন্ধতা, অপ্রতিরোধ্য বারলিক লাইন এবং পানির গভীরে ইসরাঈল বাহিনী অগ্নিপাইপ নির্মাণ ছিল বিরাট অন্তরায়। উঁচু বালুর প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যুদ্ধের এক মাস আগে একজন রাশিয়ান জেনারেল মন্তব্য করেন যে, এটা অতিক্রম করার জন্য পারমাণবিক বোমা দরকার। কিন্তু ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের কঠিন যুদ্ধেও মুসলিম মিসরীয় পদাতিক বাহিনী পবিত্র রমযান মাসে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে ইসরাঈলী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে, যা ইসরাঈলের কল্পনাতীত ছিল। আমেরিকা ইসরাঈলকে সেদিন রক্ষা না করলে তার পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। রমযান সত্যিই বরকতময়।

খ. রমযান ও মুসলিম জাহানের সংকট

রমযানের রোযা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য ফরয। সকল দেশে একই মাসের রোযা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের উজ্জ্বল প্রতীক। রমযান স্থান, কাল ও ভৌগোলিক সীমার বাধা তুলে দিয়ে বিশ্বের মুসলমানদেরকে ঐক্যের সুতায় গেঁথে দিয়েছে। ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অন্য কোন জিনিস মুসলিম ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের এই উম্মাহ এক এবং আমি তোমাদের রব, তোমরা কেবল আমারই এবাদত করো।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯২)

কোরআন আরো বলেছে ঃ 'মোমিনরা একে অপরের ভাই।' (সূরা আল হুজুরাত-১০)

রমযান মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জাগরণের মাস।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'একজন মোমিন আরেকজন মোমিনের জন্য ইমারত স্বরূপ। ইমারতের ইটের মতো একজন মোমিন আরেকজনকে শক্তিশালী করবে ও ধরে রাখবে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'মুসলমানের ভালবাসা ও দয়ার উদাহরণ হলো শরীরের মতো, যার এক অংশ অসুস্থ্য হলে অবশিষ্ট অঙ্গগুলোতে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় কষ্ট অনুভব করে।' (মুসলিম)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো রোযাদারকে মুসলিম ঐক্য ও মুসলিম উম্মাহর সংকটে মাথা ঘামানোর নির্দেশ দিচ্ছে। রোযাদারই যদি তাকওয়ার অনুসারী হয়ে মুসলিম উম্মাহর সংকট সমাধান ও তাদের কল্যাণ চিন্তা না করে তাহলে আর কখন করবে ? সুস্থ্য ও নেক চিন্তার মওসুম হচ্ছে রমযান। তাই এই মওসুমে বিশ্ব মুসলিম উন্নয়নের চিন্তা করা কর্তব্য।

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বর্তমানে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন এবং সেগুলোর আকৃতি ও প্রকৃতি কি ধরনের। সে ব্যাপারে অন্যান্য মুসলমানদের কি করণীয় আছে। মুসলমানরা নারা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। সেগুলো হচ্ছে– আদর্শিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ যে সকল মুসলিম ভূখণ্ডকে গ্রাস করে নিয়েছিল সেখানকার মুসলমান ও ইসলমাকে নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। মুসলমানের মগজে ইসলামী অর্থনীতির পরিবর্তে সমাজতন্ত্র তথা কুফরী অর্থনীতি ঢুকানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সকল কুফরীকেও তাদের মনে প্রবেশ করিয়েছে। চীন ও রাশিয়া অনেক মুসলিম দেশকে গিলে তাদের ইসলামী জিন্দেগীকে খতম করে দিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

পুঁজিবাদ ইসলামী জীবন দর্শনের বিপরীত এক মানব রচিত আদর্শ। এই আদর্শ সমাজতন্ত্রের মতো নৈতিক গুণাবলীকে জলাঞ্জলী দিয়ে ভোগ, রসনা পূরণ ও শোষণের মাধ্যমে পুঁজিপতি সৃষ্টি করে। এই কাজে তার বড় হাতিয়ার হলো– নারী, মদ, গান-বাজনা, দুনিয়ার চাকচিক্য, সুদ ইত্যাদি। পুঁজিবাদী বিশ্বের সরদারগণ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে ও মুসলিম জ্ঞানী গুণীদের মগজ ধোলাই করে। রোযাদার মুসলমানকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের আরেক দুশমন। মুসলিম সমাজের ভেতর থেকেই ইসলামকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই বাতিল মতাদর্শ মুসলিম দেশগুলোতে যথেষ্ট প্রভাবশালী। এই কুফরী মতবাদের শ্লোগান হলো, ধর্ম জাতিসমূহের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ইসলামকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও শিক্ষানীতি, কূটনীতি ও যুদ্ধনীতি এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মুসলিম বিশ্বে জেঁকে বসে আছে। রমযান মাসে রোযাদারদের কর্তব্য হলো, এই কুফরী ও ইসলাম বিরোধী মতবাদের বিরোধিতা করা।

যায়নবাদ হচ্ছে ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল টার্গেট হলো, ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংস সাধন করা। এই আন্দোলন গোপন কিন্তু বিশ্বব্যাপী এর তৎপরতা রয়েছে। রোযাদার মুসলমানকে ইহুদীদের বিভিন্ন সংস্থা ও তৎপরতা সম্পর্কে জানতে হবে।

মুসলিম বিশ্বে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ খুবই মারাত্মক। বস্তুবাদী ও ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি মুসলিম যুবক-যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস করে তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রধান বাহন গানবাদ্য, উলঙ্গ ছবি, পত্র-পত্রিকা, প্রেম কাহিনী, নভেল, নাটক, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও এবং তথাকথিত বিকৃত বুদ্ধিজীবী। এ সকল মাধ্যমগুলোতে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করে অপসংস্কৃতির মোকাবিলা করতে হবে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভৌগোলিক আগ্রাসন মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করে। মুসলিম ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম আজ অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে বন্দী। আফগানিস্তানকে রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক চক্র ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। ১৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা ও তাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক যাঁতাকল থেকে সম্প্রতি মুসলিম দেশ উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান স্বাধীন হয়েছে। এখন চীনের অধীন পূর্ব তুর্কিস্তান (সাংহাই) আবখাজিয়া, চেচনিয়া, এঙ্গোশিয়া, দাগিস্তান ও অন্যান্য ককেশীয় মুসলিম এলাকা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি সমর্থন দান সকল মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। ইউরোপে আলবেনিয়া সমাজতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। সেখানে আজ মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনি জাগরণ চলছে।

ইউরোপের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ সাবেক যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্র বসনিয়া হারজেগোভিনাও সমাজতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু সার্ব খৃষ্টানদের হাতে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ঐ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বাকি আছে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার কসোভো, সঞ্জক, ফিলিপিনের মিন্দানাও, কাশ্মীর, আরাকান, ফিলিস্তিন ও থাইল্যান্ডের পাতানীর মুসলমানদের স্বাধীনতা। তাদের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্য সমর্থন দান রোযাদারের জন্য অত্যন্ত জরুরী। মুসলিম বিশ্বের শিশুদেরকে নিয়ে চলছে বিরাট ষড়যন্ত্র। ইহুদী খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুধা ও বিধ্বস্ত মুসলিম দেশের শিশুদেরকে তারা কিনে নিচ্ছে। তাদেরকে তারা নিজেদের নাগরিক বানাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা অনেক বেশী ক্ষতিকর।

নারীদের বিরুদ্ধে চলছে অঘোষিত যুদ্ধ। মুসলিম নারীদের পর্দার বিরুদ্ধে এবং পুরুষের সাথে সহ অবস্থান ও অবাধ মেলামেশার পক্ষে চলছে বিরাট অভিযান। রোযাদার নারী-পুরুষকে এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে। তাছাড়া নারী ব্যবসাও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে, খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা। তারা মুসলমানদেরকে খৃষ্টান বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আজকের লেবাননে আগে শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ মুসলমান ছিল। বর্তমানে মুসলমান ও খৃষ্টান জনগণের সংখ্যা সমান সমান। অনুরূপ সমস্যা চলছে ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানকার অবস্থাও যে কোন সময় লেবাননের মতো হতে পারে। এছাড়াও আফ্রিকার সকল মুসলিম দেশেও একই অবস্থা। নাইজেরিয়া ও জাম্বিয়াসহ অন্যান্য দেশেও আজ খৃষ্টান মিশনারীদের বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের শ্লোগান হলো আগামী দিনের আফ্রিকা হবে খৃষ্টানদের আফ্রিকা। ঐ সকল দেশের সরকারগুলো খৃষ্টান মিশনারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার।

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা লিপ্সা, বিরাট জনশক্তি ব্যবহারের অযোগ্যতা, শিল্পায়নের অভাব, পুঁজির স্বল্পতা ইত্যাদি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যদি আল্লাহর দ্বীনকে মুসলিম দেশগুলোতে কায়েম করা হয়, তাহলে এ সকল সংকটের সমাধান সম্ভব। তাই রোযাদার মুসলমানকে সমাজে ইসলাম কায়েমের কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।

২৫শ শিক্ষা

ক. রমযান ও নারী

রমযানের রোযা নারী-পুরুষ সবার জন্যই ফরয। রমযানকে নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় ওয়ার্কশপ বলা যায়। নারী সমাজও সেই ওয়ার্কশপের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ কোরআনে নারীদের বিভিন্ন গুণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রোযাদার নারীর কথাও উল্লেখ আছে। নারীদের জন্য রমযানের মূল শিক্ষা তাকওয়া অর্জন অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে নেক লোকের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

إِنِّىْ لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى -

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে সৎ কর্মশীল নারী-পুরুষের আমল নষ্ট করবো না।' (সূরা আলে-এমরান ঃ ১৯৫)

এই আয়াতে নারীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেছেন, তাদের নেক আমল বরবাদ হবে না। এটা জানা কথা যে, রোযা না রেখে রোযার কল্যাণ লাভ করা যাবে না।

রমযানের দায়িত্ব কর্তব্য নারী-পুরুষের জন্য সমান হলেও আমরা এখানে নারীদের জন্য বিশেষ কিছু কর্তব্যের কথা উল্লেখ করবো। কেননা, এটা হলো মুক্তির মাস। নারীদেরকে দোজখ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে নারী। তাই এই মাসে মহিলাদেরকে খাঁটি তাওবা, বিশুদ্ধ ঈমান ও নির্ভেজাল নেক আমল প্রচুর পরিমাণে করতে হবে। নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক হতে হবে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন, নেক আমল এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারিণী হতে হবে। এই মাসে সওয়াব যেমন বেশী, গুনাহও তেমনি বড়। তাই তাদেরকে গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। স্থান ও কালভেদে গুনাহ বড় হয়। যেমন মসজিদে গুনাহর কাজ বড় পাপ। তেমনি রমযানের গুনাহও বড় গুনাহ।

পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরয। কিন্তু পর্দার বিষয়াদি পুরুষের চাইতে

নারীদের সাথেই বেশী সংশ্লিষ্ট। এই মাসে পর্দার অনুশীলন করতে হবে। নারীরাই পুরুষের পর্দা লংঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক করতে হবে। রাগ ও আবেগ কমিয়ে যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا -

অর্থ ঃ 'যদি নারী ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের মাসব্যাপী রোযা রাখে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে নিজ প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আহমদ ও তাবারানী)

নারী হচ্ছে ঘরের রাণী আর পুরুষ হচ্ছে রাজা। স্বামী সংসারের বাইরে কাজে বেশী ব্যস্ত থাকবে আর ঘরের গোটা দায়িত্ব অর্পিত হবে নারীর ওপর। নারীর এই দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসে পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে।

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ -

অর্থ ঃ 'স্ত্রী নিজ স্বামীর ঘর ও তার সন্তান সম্পর্কে দায়িত্বশীলা। তাকে এদের সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস নারীর ওপর স্বামীর ঘর সামলানো এবং সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ও সুন্দর পরিবার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তাহলেই কেবল নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের বক্তব্য বাস্তব হতে পারে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমরা আমাকে আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি উপহার দেবো।'

সন্তানরাই দেশের আগামী দিনের নাগরিক। তাদের নৈতিক, আদর্শিক, জাগতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন।

মা হবে পরিবারের আদর্শ শিক্ষিকা। তার ওপর নির্ভর করবে সন্তান ভাল হবে কি মন্দ হবে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ 'হে মোমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও; মানুষ ও পাথর হবে যেই দোজখের জ্বালানি।' (সূরা তাহরীম-৬)

এই আয়াতে সকল মোমিন নারী-পুরুষকে পরিবারের অধীনস্থ লোকদের ওপর

খবরদারী করা, তাদেরকে সুন্দর-সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং ভালভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই নারীদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। রমযানের মূল শিক্ষা অনুযায়ী তাকওয়া ভিত্তিক পরিবার গঠন করতে হবে। পরিবার গঠনে নারী ও পুরুষের সমান দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে পরিবার গঠনের বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তির ওপর নিজ বুনিয়াদ স্থাপন করেছে সেই ব্যক্তি উত্তম না যে ব্যক্তি ভাঙ্গনশীল তীরে ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তা জাহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়েছে সেই ব্যক্তি উত্তম ? আল্লাহ জালেম কওমকে হেদায়াত দেন না।' (সূরা তাওবা ঃ ১০৯)

মা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন। বিশেষ করে নিজ কন্যা সন্তানকে হায়েজ সংক্রান্ত বিধান শিক্ষা দেবেন। নচেত বালেগা কন্যা সন্তানের পক্ষে নামায রোযার মাস'আলা ও বিধান জানা সম্ভব হবে না এবং এক্ষেত্রে ভুল করে বসবে। সত্য বলার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহও লজ্জা পান না। তাই মাকেও সেক্ষেত্রে নিঃসংকোচে ও লজ্জাহীনভাবে মাস'আলা দিতে হবে।

নারী কোন পর পুরুষের সাথে একা একা অবস্থান করতে পারবে না কিংবা কোথাও যাওয়া আসা করতে পারবে না। তবে কোন তৃতীয় পরিচিত ব্যক্তি থাকলে সীমিত পরিসরে তা বৈধ হতে পারে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَا خَلَتْ اِمْرَأَةٌ بِرَجُلٍ اِلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا ـ

অর্থ ঃ 'কোন নারী কোন অ-মোহরেম পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে স্থান নেয়।' (তিরমিজী, আহমদ)

এই হাদীসে কেন অ-মোহরেম পুরুষের সাথে একাকী অবস্থান করা যাবে না এর কারণ বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো শয়তান। শয়তান মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে। মোহরেম ব্যক্তি ছাড়া নারীর জন্য এক দিনের পথ সফর করা নিষিদ্ধ।

মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ নারীর বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারীর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন।' (বোখারী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ)

আমাদের সমাজে অনেক নারী-পুরুষ এই হাদীসের বিপরীত কাজ করে আল্লাহর অভিশপ্ত হন। পবিত্র রমযানের পবিত্র উপলব্ধি দ্বারা তাদের উচিত আত্মশুদ্ধি ও

পবিত্রতা অর্জন করা। এই পবিত্র মাসে নারী সমাজের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা দাওয়াতে দ্বীন, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ের ওপর অন্যান্য লোকের কাছে বক্তৃতা দিতে হবে ও পৃথক সভা-বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। নিজেরাও বিভিন্ন দ্বীনি আলোচনায় অংশ নেবেন, শুদ্ধ করে কোরআন শিক্ষা দেবেন এবং শুদ্ধ কোরআন পড়ার উদ্যোগ নেবেন। এই মাসে কিছু কোরআন মুখস্থ করার কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। অন্যান্য বোনদের কাছে দারসে কোরআন ও দারসে হাদীস পেশ করা উচিত। যেন তারাও কোরআন হাদীস থেকে উপকৃত হয়।

অন্যান্য রোযাদারকে ইফতার করানো উচিত। পারিবারিক লাইব্রেরী কায়েম করা খুব বেশী প্রয়োজন। সন্তানের সুশিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার জন্য এই লাইব্রেরী গুলির ভেতরে বারুদের কাজ দেবে। এছাড়া তা থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ নিকটাত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবরাও উপকৃত হবে।

মহিলাদের মধ্যে সাধারণত বেহুদা আলোচনা ও গল্পের প্রচলন আছে। এগুলো প্রায় ক্ষেত্রে নিন্দা ও অপবাদের সীমায় পৌঁছে যায়। তাতে করে নিজেদের রোযা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। তাই কম কথা, ভাল আলোচনা ও গঠনমূলক পরামর্শের মধ্যে নিজেদেরকে সীমিত রাখা উচিত। রমযান সম্পর্কিত ইসলামী বই, কোরআন ও হাদীসের অংশগুলো পাঠ এবং দোয়া, তাসবীহ, নফল এবাদত ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকা উচিত।

রমযানে নারীরা সন্তানদেরকে নিয়ে কোরআন চর্চা করতে পারেন। শুদ্ধ ও সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য এক সাথে তাফসীর পাঠ করতে পারেন। এছাড়াও তারা দান-সদকা করতে পারেন। মসজিদে তারাবীর নামাযেও যেতে পারেন। মসজিদে ইমাম সাহেব মহিলাদের উপযোগী ওয়াজ-নসীহত করতে পারেন। তবে, মসজিদে যাওয়া অপেক্ষা তাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম।

রান্নার সময় কোরআনের আয়াত মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারেন কিংবা জিকির-আজকার করতে পারেন। এতে করে রমযানের মর্যাদাবান সময় নষ্ট হবে না, বরং সদ্ব্যবহার হবে। হায়েজ-নেফাস হলেও তারা জিকির-আজকার, তাসবীহ-তাহলীল করতে পারেন। অন্যদের নিকট দ্বীনের শিক্ষার ওয়াজ-নসীহত করতে পারেন।

অবসর সময়েকে টেলিভিশন কিংবা স্যাটেলাইট চ্যানেলের সামনে বসে নষ্ট করা ঠিক হবে না। রমযানে এগুলো বন্ধ রেখে কেবলমাত্র নেক কাজ, কোরআন চর্চা ও দ্বীনি বিষয়ে সময় ব্যয় করা উচিত।

রযমানের উদ্দেশ্য অনেক। এর মধ্যে খাদ্য কমানোও অন্যতম উদ্দেশ্য। উপবাস থাকার মানে তাই। খাবার কমানো। কিন্তু অনেক পরিবারে উল্টা দেখা যায়।

প্রথম থেকেই রমযানে ভাল খেতে হবে– এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অন্য সময়ে নাস্তা ও খাবার যাই তৈরি হোক, রমযানে তার পরিমাণ অনেক বাড়ানো হয়। মেহমান আসলে তো কোন কথাই নেই, যত আইটেম বাড়ানো যায়। অধিক খাবার, ভুঁড়িভোজ, বেশী আইটেম, সেহরীর বিচিত্র খাবার রমযানের মূল শিক্ষা বিরোধী। সেহরী ও ইফতার পরিমিত খেতে হবে। অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়।

তাছাড়া রযমানে রান্নাঘরেই যদি সময় চলে যায়, তাহলে এ মাসের ফায়দা কিভাবে লাভ করা যাবে ? এজন্য নারীদেরকে রমযানে রান্নাবান্না কমিয়ে এবাদত বাড়িয়ে দিতে হবে।

খ. রমযান ও শিশু

রযমানের সাথে শিশু প্রতিপালনেরও বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। শিশুরা আমাদের কাছে পবিত্র আমানত। পবিত্র রমযান মাসে এই পবিত্র আমানতের সদ্ব্যবহার করা জরুরী। শিশুদেরকে কৃষি জমীনের সাথে তুলনা করা যায়। ভাল ফসল লাভ করার জন্য কৃষককে উর্বর জমীনে উত্তম চাষ, সার, পানি সেচ করতে হয় এবং নিড়ানীর মাধ্যমে জমীনের আগাছা পরগাছা উপড়ে ফেলতে হয়। এরপর কৃষক ভাল ফসল লাভ করে। তেমনি, শিশুকে ভালভাবে গড়ার জন্য আমাদেরকের কৃষকের মতো অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমাদের অতীতের নেক ও বুজুর্গ লোকেরা রমযান মাসে সন্তানদেরকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতেন। এই অভ্যাস শিশুদের পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ -

অর্থ ঃ 'তোমাদের সন্তানদের তাদের ৭ বছর বয়সে নামায পড়ার আদেশ করো, নামায না পড়লে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।' (আহমদ, আবূ দাউদ)

এই হাদীসে শিশুদের নামায শিক্ষার সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই তাদেরকে রোযাসহ অন্যান্য নেক কাজেরও অভ্যাস করাতে হবে। আর তাদেরকে ঐ বয়সে মাতা-পিতার বিছানা থেকে পৃথক স্থানে শোয়াতে হবে। তা না করলে, পরে এর নেতিবাচক প্রভাব এবং যৌন বিকৃতিসহ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

শিশুর ভাল মন্দ হওয়া নির্ভর করে তার উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশের ওপর। এই কথাটিই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ الخ -

অর্থ ঃ 'সকল মানব শিশু ফিতরাত (দ্বীনে ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারী বানায়। পশু যখন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে তখন কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাও ? মানুষই পরে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খুঁত সৃষ্টি করে।' (মেশকাত)

এই হাদীস পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে মা-বাবা ও পরিবারের ভূমিকা কি ?

এই হাদীসে মা বাবার উপর শিশু শিক্ষাকে ফরয করা হয়েছে। তারা সন্তানকে যেভাবে গড়বে, সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। মা-বাবার কারণেই সন্তান ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও নাস্তিক হয়। শিশুর ইসলামী শিক্ষার জন্য পূর্বশর্ত হলো, মা বাবার ইসলামী শিক্ষা। কেননা তারা নিজেরাই অন্ধ হলে আরেক অন্ধকে পথ দেখাবে কিভাবে ?

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা যাদের কাছে থাকে তাদের কাজ কর্ম ও চারিত্রিক গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা পরামর্শ ও উপদেশের চাইতে বানরের মত অন্যের দেখাদেখি কোন কাজ করতে আগ্রহী। সে কাজ ভাল কি মন্দ তারা তা চিন্তা করে না। সে জন্য মা-বাবাকেও সন্তানের জন্য ভাল গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তাদের সামনে ভাল আচরণ ও কাজ করতে হবে এবং খারাপ কাজ ও কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই আমর বিন আকাবা বিন আবু সুফিয়ান তার সন্তানের শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ 'আমার সন্তানের সংশোধন তোমার সংশোধনের দাবী রাখে। কেননা, তাদের চোখ তোমার উপর নিবদ্ধ। তুমি যা করো সেটাকেই তারা ভাল এবং তুমি যেটা করো না, সেটাকেই তারা মন্দ মনে করে।'[১]

১. আল একদুল ফারীদ ২য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ।

এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, সন্তানের শিক্ষককেও ভাল এবং আদর্শ চরিত্রবান হতে হবে। শিক্ষক ভাল না হলে তার খারাপ প্রভাব ছাত্রের ওপর পড়তে বাধ্য।

শিশুকে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দেয়া উচিত ? এর জওয়াবে বলা যায়, তাদেরকে প্রথমে ঈমান ও ইসলাম এবং কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষার মাধ্যমে ঈমানের ভিত্তিকে মজবুত করে এর ওপর প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞানের ইমারত নির্মাণ করতে হবে। ঈমানের রসে সিঞ্চিত ঘরে জীবনে জাগতিক কল্যাণ ও পারলৌকিক সাফল্যের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তানদেরকে সাঁতার, তীর নিক্ষেপ ও অশ্বারোহরণ শিক্ষার আদেশ দিয়ে বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে এ সকল জিনিস শিক্ষা দাও।' (আল হাদীস)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ اَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَالرَّمِيَّ وَلاَ يَرْزُقَهُ اِلاَّ طَيِّبًا ـ

অর্থ ঃ 'পিতার উপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে, তাদেরকে লেখা, সাঁতার ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দেয়া এবং হালাল খাবার ছাড়া অন্য কোন খাবার না দেয়া।' (জামে সাগীর-সুয়ূতী-১ম খণ্ড)

এই হাদীসে তিনটি বিষয় শিক্ষার কথা উল্লেখ করে মূলতঃ ৩টি বৃহত্তর জ্ঞান রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো, লেখা-পড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য, সাঁতার শারীরিক মজবুতির জন্য এবং তীর নিক্ষেপ জিহাদের জন্য। এই তিন জিনিস অর্জিত হলে মোমিনের জীবনে আর কি চাই ? আল্লাহ সন্তানকে দুনিয়ার সৌন্দর্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ

অর্থ ঃ 'সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।' (সূরা কাহাফ-৪৬)

তাই এই সৌন্দর্যের পরিচর্যা ও যত্ন করে একে পূর্ণতা দান করতে হবে। আর এই সৌন্দর্য পূরণ করতে হবে উপযুক্ত স্নেহ, শিক্ষা ও পরিবেশ দিয়ে।

শিশুদেরকে আদর-স্নেহ করা সওয়াব এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সুন্নাহ্। এমনকি তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও খেলা করা সুন্নাতে নবওয়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) আপন নাতী হাসান ও হোসাইনের সাথে খেলার জন্য নিজের অনেক অমূল্য সময় ব্যয়

করতেন। তিনি তাদেরকে হাসাতেন ও আনন্দ দিতেন। একবার তিনি নামায পড়ার সময় হাসান তাঁর পিঠে চড়ে বসে। তিনি সিজদা দীর্ঘ করেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সিজদা দীর্ঘ করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি তাদেরকে দ্রুত নামানো পছন্দ করিনি।' অন্য সময় তিনি তাদেরকে পিঠে চড়াতেন এবং বলতেন ঃ 'তোমাদের এই উটটি কতইনা ভাল এবং তোমরা দুইজন কতইনা উত্তম সওয়ার। স্নেহ কাকে বলে ? তিনি নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজ নাতীন উমামা বিনতে যয়নাবকে তুলে নিতেন এবং সাজদায় গেলে মাটিতে রেখে দিতেন। (বোখারী, মুসলিম)

তিনি সন্তানদের আদর করা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

اَكْرِمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ -

অর্থ ঃ 'তোমরা সন্তানকে আদর করো ও সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اَحِبُّوْا الصِّبْيَانَ وَارْحَمُوْهُمْ فَاِذَا وَعَدْتُمُوْهُمْ فَفِرقُوْا لَهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ اِلاَّ اَنَّكُمْ تَرْزُقُوْنَهُمْ -

অর্থ ঃ 'শিশুদেরকে ভালবাস ও তাদেরকে আদর-যত্ন ও সোহাগ করো। যদি তাদেরকে কোন জিনিস দেয়ার ওয়াদা করো, তাহলে তা তাদেরকে দাও। তারা এটা ছাড়া আর কিছু দেখে না যা তোমরা তাদেরকে খাবার হিসাবে দাও।'

কোন পরিবারে যদি শিশু হাসি-খুশীর নেয়ামত লাভ না করে অর্থাৎ কেউ যদি তার সাথে না হাসে, তাহলে বড় হলে তার মুখ থেকে হাসিতো দূরে থাক, মুচকী হাসি বের করাও মুশকিল হবে। তখন শিশুর মনস্তাত্বিক জটিলতা ও সমস্যা দেখা দেবে। তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। পরে সে সমাজে কারুর সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না এবং সমাজের কোন কল্যাণে আসবে না, বরং সমাজের একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

শিশুদের সাথে নির্দোষ খেলাধূলা করতে কোন বাধা নেই এবং তাতে গুনাহও নেই। বিয়ের আগে হযরত আয়েশা (রা) কাপড়ের তৈরি খেলনা দিয়ে খেলতেন এবং বিয়ের সময় ৯ বছর বয়সে সেগুলো সাথে নিয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন।

সাহাবায়ে কেরামদের অনেকেই নিজ শিশুদের সাথে খেলতেন এবং আনন্দ-ফূর্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নামায পড়ানোর সময় শিশুর কান্না শুনলে নামায তাড়াতাড়ি শেষ করতেন এবং বলতেন ঃ 'আমি সন্তানের মায়ের কষ্ট পছন্দ করি না।'

একদিন সকালে তিনি হযরত ফাতেমার (রা) ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হোসাইনের কান্না শুনে কষ্ট পান। তিনি ফাতেমাকে ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ 'তুমি জান না, তার কান্নায় আমি কষ্ট পাই ?' এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুরদেরকে হাসি-খুশীর মধ্যে রাখতে হবে এবং যত কম কাঁদানো যায়, ততো ভাল।

তিনি আরো বলেছেন ঃ 'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।' তাই শিশুদের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ 'যার শিশু সন্তান আছে সে যেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।'

শিশুদেরকে ভালবাসার আরো উদাহরণ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকের নতুন গাছের ফল রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তা গ্রহণ করে এই দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَـرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَـاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ্! আমাদের ফল, মাপযন্ত্র-সা' ও মোদে বরকত দিন। তারপর তিনি উপস্থিত সবচাইতে ছোট শিশুকে তা দিতেন।' (হাদীস)

এই হাদীসের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। ১. নতুন ফল কোন নেক লোককে দেয়া যায়, ২. ফল গ্রহণ করা সুন্নাহ, ৩. দোয়া করা, ৪. নিজের ভোগ ও লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ করা, ৫. সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে তা দান করা।

শিশুর প্রতি কতটুকু মায়া থাকলে অন্য কাউকে না দিয়ে তা একটা শিশুকে দেয়া যেতে পারে ?

নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান করার সময় সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব। কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া গুনাহ ও অন্যায়। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে দুই পুত্রের মধ্যে একজনকে চুমু খেয়েছে এবং অন্যকে চুমু দেয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কেন তাদের দুইজনের মধ্যে সমতা রক্ষা করলে না ?' তিনি এই প্রশ্নের মাধ্যমে উক্ত

বৈষম্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন। নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন ঃ আমি আমার এই সন্তানকে দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপ দিয়েছ ? তিনি বলেন, 'না।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'আমাকে গুনাহর কাজে স্বাক্ষী করো না।' তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি চাও যে, তারা সবাই তোমার সমান সেবা করুক ও নেক কাজ করুক ?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'তাহলে ঐ রকম করবে না।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো।' (বোখারী)

সাধারণতঃ অনেক মানুষ ছেলে ও মেয়ে সন্তান থাকলে ছেলেদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয় ও মেয়েদের চাইতে তাদেরকে বেশী আদর করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অন্যায়। বরং রাসূলুল্লাহ (সা) সমাজের ঐ কুরুচী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেন ঃ 'তোমরা যখন বাজারে যাবে ও পবিারের সদস্যদের জন্য উপহার কিনে নিয়ে আসবে। তোমরা অবশ্যই পুরুষদের আগে মহিলাদের মধ্যে উপহার বন্টন করবে।'

এই হাদীসে পুরুষের আগে মহিলাদেরকে উপহার দানের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম মায়ের জাতির মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষা ও ভালবাসার আরও উদাহরণ হলো, তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে এক সাথে আহার করেছেন এবং তাদেরকে নিজ সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করিয়েছেন। তাই সকল শিশুর প্রতি সবার ভালবাসা থাকা জরুরী। অনেক সময় শিশুরা ময়লাযুক্ত থাকে। এই অজুহাতে তাদেরকে আদর না করা অযৌক্তিক এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ বিরোধী। বরং ঐ অবস্থাতেও তাদেরকে আদর করে পরিষ্কার থাকার পরামর্শ দেয়া যায়। শিশু প্রকৃতি ধূলোমলিন। আজকে যারা বড়, শিশুকালে তারাও নোংরা ছিল।

শিশুদেরকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা যায়। যেমন– কোরআন ও নামায পড়লে কিংবা রোযা রাখলে অথবা ভাল লেখা-পড়া ও আদব-কায়দার পুরস্কার হিসাবে উপহার দেয়া উত্তম।

শিশুদের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ করা দরকার। নচেৎ তারা ওয়াদাভঙ্গ করা শিখবে। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ 'এক মহিলা তার ছেলেকে বললো, আসো, আমি তোমাকে (কিছু) দেবো।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'কি দেবে ?' মহিলা সাহাবীটি বললো, 'একটি ফল।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যদি তুমি তাকে তা না দাও তাহলে তোমার একটা গুনাহ লেখা হবে কিংবা একটা কিছু মন্দ হবে।'

ইসলাম শিশু যত্ন ও শিক্ষাকে ফরয করেছে। তাই ভাল ও সুসন্তান লাভ করার জন্য কিছু পূর্বশর্ত আছে। আর তা হচ্ছে, নেক ও ঈমানদার স্ত্রী বিয়ে করতে হবে। হযরত ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'পিতার উপর সন্তানের অধিকার কি ?' তিনি বললেন, 'সন্তানের উত্তম মা নির্বাচন, উত্তম নাম রাখা ও তাকে কোরআন শিক্ষা দেয়া।' এই তিনটি কাজ করলে সন্তান উত্তম হওয়ার আশা করা যায়।

নেক সন্তানের জন্য দ্বীনদার স্ত্রী গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সাধারণতঃ ৪টি বিষয় দেখে স্ত্রীকে বিয়ে করা হয় ঃ ১. সম্পদ, ২. বংশ, ৩. সৌন্দর্য, ৪. দ্বীনদারী। তবে তোমরা (আর কিছু থাক বা না থাক) দ্বীনদার স্ত্রী গ্রহণ করবে। তারপর তিনি বললেন, 'স্ত্রীদের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করবে না। হতে পারে, এই সৌন্দর্য তাদের ধ্বংস টেনে আনবে। তাদের মাল-সম্পদ দেখে বিয়ে করো না। হতে পারে, সম্পদের ঔদ্ধত্বে তারা নাফরমানী করতে পারে। তবে তাদের দ্বীনদারী দেখে বিয়ে করো।' (ইবনে মাজাহ)

দ্বীনদার স্ত্রীর ঘরে নেক সন্তান লাভ করার আশা করা যায়।

ইসলাম শিশুর জন্মের আগ থেকেই শিশুর যত্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সন্তান মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জন্মের পর তার আকীকা ও ভাল নাম রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হাশরের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নামে ও সন্তানের নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তাদের উত্তম নাম রাখো। (আবূ দাউদ)

উত্তম নাম হচ্ছে ভাল অর্থপূর্ণ নাম। আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে রাখলে সে নাম সর্বোত্তম। যেমন– আবদুল্লাহ, আবদুল খালেক, আবদুর রহমান ইত্যাদি।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ডান কানে আজান ও বাম কানে একামত দিতে হবে। হযরত আবু রাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতেমা হাসান বিন

আলীকে ভূমিষ্ঠ করার পর রাসূলকে তাঁর কানে আজান দিতে দেখেছি।' (হাদীস) মায়ের পক্ষেই সন্তানের কানে আজান ও একামত দেয়া সহজ।

শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে অসৎ সঙ্গী-সাথীর সাহচর্য থেকে দূরে রাখতে হবে। কেননা, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের মধ্যে অবস্থান করে। তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।' (আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম)

সন্তানদের ইসলামী পোষাক-আশাকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যেন বিজাতীয় পোষাক না পরে ও বিজাতীয় সংস্কৃতির নাগপাশে আটকা না পড়ে। সন্তানের মনে আল্লাহ ও রাসূলের ভয়, আখেরাতের ভীতি, ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করতে হবে। সন্তানকে নেক বানানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ কোরআনে আমাদেরকে সেই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থ ঃ 'হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে (চোখ শীতলকারী) বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মোত্তাকী লোকদের নেতা বানিয়ে দাও।' (সূরা ফোরকান-৭৪)

একই দোয়া স্ত্রী ও স্বামী এবং সন্তানের জন্য করতে হবে। আল্লাহর শেখানো ভাষায় দোয়া কবুল হয়। মোটকথা, পবিত্র রমযানে শিশুদের প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা ও শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। রমযানে দয়া ও স্নেহের যে অমীয় ধারা শুরু হয় তা যেন পরবর্তী এগার মাস অব্যাহত থাকে ও ফুল-ফলে সুশোভিত হয়। সন্তানকে মারের পরিবর্তে স্নেহ ও মমতা দিয়ে জয় করতে হবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মারেরও প্রয়োজন হবে। যখন তারা সীমার বাইরে চলে যাবে ও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে অস্বীকার করবে, তখন মারের দরকার হবে। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ১০ বছর বয়সে নামায না পড়লে মারার আদেশ দিয়েছেন। অবশ্য সে মারও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, মাত্রাতিরিক্ত নয়।

২৬শ শিক্ষা

রমযান নেক কাজের মওসুম

ফল ও ফসলের যেমন সুনির্দিষ্ট মওসুম আছে, তেমনি নেক কাজের সর্বোত্তম মওসুম হচ্ছে রমযান। ফসলের মওসুমের সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায়। যদিও মওসুমের বাইরেও স্বল্প ফলন পেতে বাধা নেই। রমযান মাসের বাইরেও নেক কাজে সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু রমযানের মতো ৭০ গুন সওয়াব পাওয়ার সুযোগ নেই। তাই একজন আদর্শ চাষীর মতো ভরা মওসুমে সর্বোত্তম ফসল ঘরে তোলার সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।

মহান আল্লাহ এই মাসে নফলকে ফরযের সমান এবং একটি ফরযকে ৭০টি ফরযের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি এই মাসে ওমরাকে হজ্জের সমান বলেছেন। এই মাসে সকল নফল সুন্নাতে অন্য মাসের ফরযের সমান সওয়াব। তাই ফরয, ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল এবাদত বেশী বেশী করা উচিত। এখন আমরা কিছু নফল এবাদত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

নফল নামায

নফল নামাযে ফজীলত অনেক। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময়ে নফল নামায পড়েছেন। এর মধ্যে এশরাকের নামায অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকির করা অবস্থায় অপেক্ষা করে এবং পরে দুই রাকআত নামায পড়ে তার জন্য রয়েছে ১টি হজ্জ ও ১টি ওমরার পূর্ণ সওয়াব।' (তিরমিজী)

বর্ণিত আছে, একবার তিনি উম্মে হানীর ঘরে দুপুরের আগে ৮ রাকআত নামায পড়েছেন।

আল্লাহর জিকির

আল্লাহ বলেছেন ঃ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

অর্থ ঃ 'সতর্ক হও! আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা অন্তর শান্ত্বনা লাভ করে।' (সূরা রা'দ-২৮)

তিনি আরো বলেছেন ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।' (সূরা বাকারা-১৫২)

আবু ওসমান মাহদী বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে কখন স্মরণ করেন তা আমি জানি। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি তা কেমন করে জানেন ? তিনি উত্তরে বলেন, কোরআনে আল্লাহর উপরোক্ত ওয়াদা অনুযায়ী জানি যে, যখন আমরা তাঁকে স্মরণ করবো তখন তিনিও আমাদেরকে স্মরণ করবেন। (মা'আরেফুল কোরআন)

তিনি আরো বলেছেন ঃ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো, সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্য লাভ করবে।' (সূরা জুম'আ-১০)

জিকির সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'মোফাররেদরা অন্যদের চাইতে এগিয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, মোফাররেদ কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে অধিক জিকিরকারী'। (মুসলিম, তিরমিযী)

আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। জিকির হচ্ছে অন্তরের ময়লা পরিষ্কারের হাতিয়ার।' (ইবনু আবিদ্ দুনিয়া)

মোয়াজ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সর্বশেষ এই প্রশ্নের পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আর পাইনি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন্ আমল আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দেন, মৃত্যুর সময় যদি তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত থাকে। (তাবারানী)

জিকিরকারীর উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে ব্যক্তি করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।' (বোখারী)

মুজাহিদদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম এ ব্যাপারে হযরত মোয়াজ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঐ প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'সর্বাধিক জিকিরকারী মুজাহিদ ব্যক্তি।' ঐ ব্যক্তি আবারও প্রশ্ন করেন, কোন্ রোযাদার সর্বোত্তম পুরস্কারের অধিকারী ? তিনি বলেন, 'সর্বাধিক জিকিরকারী ব্যক্তি। তারপর তিনি অনুরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকার কথা উল্লেখ করে বলেন, সর্বাধিক জিকিরকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়। হযরত আবু বকর (রা) তখন ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, জিকিরকারীরা সকল কল্যাণ নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'হ্যাঁ।' (তাবারানী)

সাহল বিন হানজালিয়া থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কোন একদল লোক যদি কোন মজলিশে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং শেষ করে উঠে যায়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা উঠো, তোমাদের গুনাহ মাফ হয়ে গেছে এবং তোমাদের গুনাহ নেকে পরিণত হয়ে গেছে।' (তাবারানী)

জিকিরের মজলিশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে অংশগ্রহণ করা দরকার। এ মর্মে আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি বেহেশতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো; তাহলে সেখানে একটু বিচরণ করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, বেহেশতের বাগান বলতে কি বুঝায় ? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহর জিকিরের মজলিশ।' (তিরমিযী)

সাঈদ বিন যোবায়ের (রা) আল্লাহর জিকিরের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ জিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য করা ও নির্দেশ পালন করা। তিনি বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর জিকিরই করে না। সে প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তাসবীহ-ই পাঠ করুক না কেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল-হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলো মানে, যদি তার নফল নামায রোযা কিছু কমও হয় সে আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশবালীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামায-রোযা ও তাস্‌বীহ-তাহলীল বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। কুরতুবী ইবনে খোয়াইয়ের আহকামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে জিকির দ্বারা কি বুঝায় তা আমাদের বুঝতে হবে। জিকির যেমন– আল্লাহকে স্মরণ করা বুঝায়। তেমনি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করাকেও বুঝায়। মোটকথা, কোরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়ার যে কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা আল্লাহর জিকির বা স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমরা বিশেষ কয়েকটা জিকির সম্পর্কে আলোচনা করবো।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ

অর্থ ঃ 'সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে, 'আলহামদুলিল্লাহ।' (ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

কালেমা লা ইলাহা দ্বারা ঈমানকে নবায়ন করা হয়। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ঈমানকে নবায়ন করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে ? তিনি বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী উচ্চারণ করো।' (আহমদ)

আরেক হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে বেহেশতে যাবে।' 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' হচ্ছে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় জিকির। এ মর্মে আবুজার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে বলবো না ? আমি বললাম, বলুন। তিনি উত্তর দেন, 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।' (মুসলিম)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলবে, তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।' (তিরমিজী, নাসাঈ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে 'সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' একশত বার বলবে, তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অগণিত হলেও আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দু'টো শব্দ জিহ্বায় উচ্চারণ সহজ ও হালকা, হাশরের পাল্লার জন্য ভারী ও আল্লাহ রহমানের কাছে অতি প্রিয়; সেগুলো হচ্ছে, 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীম।' (বোখারী, মুসলিম)

মোয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন ঃ আমি কি তোমাদের বেহেশতের ১টি দরজা সম্পর্কে সংবাদ দেবো না ? আমি বললাম, তা কি ? তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (আহমদ)

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আরো বিভিন্ন দোয়ার বর্ণনা হাদীসে এসেছে। সেগুলো সবই জিকির।

কোরআন ও হাদীস পড়া উত্তম জিকির। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে, মৃত্যু ছাড়া তার বেহেশতে প্রবেশের পথে কোন অন্তরায় নেই।' (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)

শাদ্দাদ বিন আওস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে ইয়াকীনের সাথে সাইয়েদুল এস্তেগফার পড়ে এবং সন্ধ্যার আগে মারা যায় সে

বেহেশতী হবে এবং যে ব্যক্তি ইয়াকীনের সাথে রাত্রে তা পড়ে ও সকালের আগে মারা যায় সেও বেহেশতী হবে।' (বোখারী)

সাইয়েদুল এস্তেগফার (বড় তাওবা ও ক্ষমার দোয়া) হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার গোলাম এবং সাধ্যমত তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর আছি। আমি যে সকল মন্দ কাজ করি সেগুলো থেকে তোমার পানাহ চাই। আমার উপর তোমার নেয়ামত স্বীকার করি এবং আমার গুনাহও স্বীকার করি। আমাকে মাফ করো। তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সকল কাজ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। একথাই কোরআন বলেছে ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

তিনি বহু কাজের আদেশ-নিষেধ করেছেন।

'রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) এক জুতা ও এক মোজায় চলতে নিষেধ করেছেন।' (আহমদ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।' (নাসাঈ)

'রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষদের সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী)

তাই কোন পুরুষের পক্ষে সোনার অলংকার পরা জায়েয নেই। অনেক পুরুষ সোনা-রূপার আংটি ও চেইন পরে, এটা হারাম।

'রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষের জন্য সোনা ও সিল্ক নিষিদ্ধ এবং মহিলাদের জন্য তা হালাল করেছেন।' (নাসাঈ, আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) এশার আগে ঘুম ও এশার পরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।' (তাবারানী)

'রাসূলুল্লাহ (সা) পাকা চুল তুলতে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ 'যদি আমার উম্মাহর জন্য কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক অজুর সময় মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম।' (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ বাধ্যতামূলক করে দিতাম।

বিদ'আত থেকে দূরে থাকা

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ 'তোমাদের উচিত আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরো। তোমরা বিদ'আত থেকে দূরে থাকো। প্রত্যেক নূতন (এবাদত) বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী।' (আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)

আমাদের সমাজে অসংখ্য বিদ'আত রয়েছে। সেগুলো থেকে দূরে থাকা দরকার।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা

রাসূলুল্লাহ (সা) এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সবকিছুকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাই আজ যে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শুধুমাত্র ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য কাজ করেন কিন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন না, তারা উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের বিরোধিতা করেন। শুধু তাই নয়, এ মর্মে আরো অগণিত আয়াত ও হাদীস আছে তারা সেগুলোরও বিরোধিতা করেন। এসবের বিরোধিতা করে তারা নিজেদেরকে কিভাবে ইসলামের দা'য়ী ও প্রচারকারী বলে সন্তুষ্টি লাভ করেন ?

আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা

এই মাসে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর ও কুশলাদি জানার চেষ্টা করা দরকার এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رِحْمٍ-

অর্থ ঃ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যেতে পারবে না।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ 'আত্মীয়তাকে সৃষ্টির পর সে আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলতে থাকে। সে বলে, এটা হলো, আত্মীয়তা ছিন্নকারীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও আশ্রয়ের স্থান। তখন আল্লাহ বলেন, তুমি কি রাজী আছো যে, যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখবো এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো?' (বোখারী, মুসলিম)

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মা-বাবার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। তাদেরকে কষ্ট না দেয়া, তাদের খোঁজ-খবর রাখা, সেবা-যত্ন করা, প্রয়োজন পূরণ করা ও যা কিছু খেতে ও পরতে চায় তা খাওয়ানো ও পরানো। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

'তোমাদেরকে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, তাঁর সাথে আর কারুর এবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন কিংবা দুইজন বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তাদের সাথে 'উহ' শব্দটুকুও করবে না এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলবে ও উত্তম ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি বিনয়ের বাহু অবনত করো এবং দোয়া করো, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে অনুরূপ দয়া করো যেরূপ তারা ছোটকালে আমার প্রতি দয়া করেছেন।' (বনী ইসরাঈল-২৩-২৪)

হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাল সাহচর্য পাওয়ার সর্বোত্তম অধিকারী কে? তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবারও প্রশ্ন করেন, এরপর কে? তিনি উত্তর দেন 'তোমার মা।' লোকাটি পুনরায় প্রশ্ন করেন, এরপর কে? তিনি পুনরায় বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবারও একই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমার বাবা।' (মুসলিম)

এই হাদীসে, পিতার চাইতে মায়ের হক তিন গুন বেশী একথাই তিনি গুরুত্বের সাথে বুঝিয়েছেন। এই পবিত্র রমযানে মা-বাবার সেবাসহ অন্যান্য আত্মীয়ের অধিকার পূরণ করা বিরাট সওয়াবের বিষয়।

রোগীর সেবা

রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগীর সেবা করা বিরাট সওয়াব। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কেউ যদি কোন বিপদগ্রস্ত লোক (রোগী) দেখতে যায় এবং বলে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

'আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে তোমার মতো বিপদ দিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেননি এবং অন্যান্য অনেক লোকের চাইতে আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন।' (তিরমিযী-কিতাবুদ দাওয়াত, ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ তাকে ঐ বিপদ থেকে মুক্ত রাখবেন সে যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

ঘরে কিংবা হাসপাতালে রোগী দেখার পর তাদের আরোগ্যের জন্য দোয়া করা দরকার। যে ব্যক্তি রোগী দেখে ও তাদের সেবা-যত্ন করে ফেরেশতারা তার জন্য রহমত ও ক্ষমার দোয়া করে। এ প্রসঙ্গে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তি সকালে রোগী দেখলে ও সেবা করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে এবং কোন ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা করলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি শরৎকাল মঞ্জুর হয়। (তিরমিজী-কিতাবুল জানায়েয ও আবূ দাউদ)

রোগী দেখা ও সেবা করা রহমত, মাগফিরাত এবং ভালবাসার কারণ। এর মাধ্যমে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়।

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত ও মুর্দাদের জন্য দোয়া করা রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত। তিনি বলেছেন ঃ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تَذْكِرُ بِالْمَوْتِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করায়।' (মুসলিম-কিতাবুল জানায়েয, আবূ দাউদ, ঐ, তিরমিজী, ঐ)

নিকটবর্তী কবরে গিয়ে দোয়া করা উত্তম। এতে নিজেরও ফায়দা হয় এবং মুর্দারেরও। তবে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের জন্য দূরবর্তী স্থানে সফর করা জায়েয নেই। কেননা, দোয়া পৌঁছানোর বাহন হচ্ছে আল্লাহর ফেরেশতা। ঘরে বসে দূরবর্তী স্থানের মুর্দার জন্য দোয়া করলে ফেরেশতা তা পৌঁছাবে। সে জন্য অর্থ ও সময়ের অপচয় করে দূরবর্তী স্থানে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা তিন স্থান ব্যতীত সওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন জায়গায় সফর করো না। সেই তিন স্থান হলো, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা।' (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস অনুযায়ী দূরবর্তী স্থানে কোন বিশেষ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ। যারা বিশেষ কোন কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে তারা অন্যায় করে।

বিবিধ (জামা'আতে নামায পড়া, বান্দার হক, সমাজ কল্যাণ, ইফতার করানো, এলেম অর্জন)

রমযানে নিয়মিত জামা'আতে নামায পড়া, ইসলামী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা, মানুষকে সৎ উপদেশ দেয়া, মানুষের কল্যাণ কামনা করা, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর হক আদায় করা, মানুষের উপকার করা ও সমাজকল্যাণ করা সবই উত্তম। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদীস আছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বিপদগ্রস্ত লোকের ১টি বিপদ কিংবা দুঃখ-কষ্ট দূর করে, আল্লাহ পরকালে তার একটি বিপদ কিংবা দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন।

আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করা খুবই সওয়াবের কাজ। কিন্তু রমযানে তা আরো বেশী সওয়াবের কাজ। এ মর্মে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ رَمَضَانَ -

অর্থ ঃ 'রমযানের দান-সদকা সর্বোত্তম।' (তিরমিজী)

ঈদের সময় গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাদের মুখে হাসি ফুটানো প্রয়োজন। যারা গরীবদেরকে অন্ন-বস্ত্র সাহায্য করে তারা যেন আল্লাহকেই সাহায্য করলো। (হাদীস)

রোযাদারকে ইফতার করানো এবং বেশী বেশী দোয়া করা উচিত। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো, পশু-পাখীর ক্ষতি না করা এবং কাউকে কোরআন, হাদীস ও ইসলাম সাহিত্য পড়ানো সওয়াবের কাজ।

এভাবে, যত বেশী নফল, সুন্নত, ওয়াজিব ও ফরয কাজ আঞ্জাম দেয়া যাবে ততো বেশী সওয়াব হবে। এর পাশাপাশি হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। এভাবে রোযাদার রমযানে উৎকৃষ্ট চাষীর মতো সর্বাধিক সওয়াবের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হবেন।

২৭শ শিক্ষা

যাকাতুল ফিতর

রমযানের সিয়াম সাধনার পর দেয় বিশেষ আর্থিক এবাদতের নাম যাকাতুল ফিতর। এটাকে সাদকাতুল ফিতরও বলা হয়। হাদীসে এটাকে যাকাত এবং সাদকা এই দুই নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফিতর' শব্দের অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। ইফতারের অর্থও তাই।

যাকাতুল ফিতরের সাথে ইসলামের ৫ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ যাকাতের পার্থক্য আছে। যাকাতুল ফিতর ব্যক্তির দিকে এবং যাকাত সম্পদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ফকীহগণ তাই যাকাতুল ফিতরকে শরীর কিংবা ব্যক্তির যাকাত হিসেবে বিবেচনা করেন। এটি একটি কল্যাণকর বিধান। হিজরী ২য় সালে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। একই সাথে রোযাও ফরয হয়েছিল।

কোরআন মজীদে সাদকাতুল ফিতর সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। হাদীসের মাধ্যমে তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই হানাফী মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী তা ফরয নয় বরং ওয়াজিব। কেননা, ফরয হওয়ার জন্য কোরআন মজীদের আয়াতের অকাট্ট নির্দেশ দরকার। পক্ষান্তরে, হাম্বলী মাযহাবের মতে হাদীসে তাকে ফরয করার কথা উল্লেখ আছে। আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রমযানে যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন এবং প্রত্যেক স্বাধীন ও গোলাম এবং নারী ও পুরুষের জন্য এক সা' খেজুর কিংবা যব দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (বোখারী)

এই হাদীসে 'ফরয করেছেন' শব্দের উল্লেখ আছে। যারা এটাকে ওয়াজিব বলেন, তাদের মতে, এখানে 'ফরয" মানে 'নির্ধারণ করেছেন।'

অধিকাংশ আলেম এটাকে ফরয কিংবা ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, তা সুন্নতে মোআক্কাদাহ। হাদীসে বর্ণিত মূল অর্থ গ্রহণ করতে যেখানে কোন অসুবিধে নেই, সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করার কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। একই উৎস থেকে 'তাযকিয়া' শব্দও বেরিয়েছে। 'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্থ আত্মশুদ্ধি। এর মাধ্যমে রোযাদার ব্যক্তি নিজের রোযার ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করেন। তাই একে 'যাকাতুল ফিতর' বলা হয়। ইবনে কোতাইবার মতে, সাদকাতুল ফিতর অর্থ হচ্ছে সাদকাতুন্ নুফুস। অর্থাৎ মানুষের যাকাত। ফিতর, ফিতরাত থেকে এসেছে।

যাকাত শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি বা বাড়ানো। রোযাদার এই যাকাতের মাধ্যমে রোযাকে পবিত্র করে-এর সওয়াব বৃদ্ধির কাজ করে থাকেন বলে এটাকে 'যাকাতুল ফিতর' বলে। ময়লা দূর করার জন্য যেমন পানি দিয়ে গোসল দরকার, তেমনি রোযার ক্রটি ও কালিমা দূর করার জন্যও 'যাকাতুল ফিতর' দরকার। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

فَرَضَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ـ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাতুল ফিতরকে রোযাদারের বেহুদা কথা ও কাজ এবং গুনাহ থেকে পবিত্র করা এবং নিঃস্ব-অসহায় মিসকীনের খাবার উদ্দেশ্যে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে তা আদায় করে, সেটি আল্লাহর কাছে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাযের পর আদায় করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-সদকার মতো বিবেচিত হবে।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

এই হাদীসে যাকাতুল ফিতরের ২টা প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। ১. রোযাদার বহু ক্রটি-বিচ্যুতি ও গুনার কাজ করে রোযাকে অপবিত্র করে ফেলে এবং তাতে রোযা অপূর্ণাঙ্গ থাকে। তাদের এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য রোযার শারীরিক এবাদতের সাথে সাথে কিছু আর্থিক এবাদত তথা দান-সদকা আদায় করে

রোযাকে পূর্ণাঙ্গ করার প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এর সাথে আমরা ফরয নামাযের সাথে সুন্নত এবং নফল নামাযের দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান পাই। ফরয নামাযের কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হলে তার পূর্ণতা সাধিত হয় সুন্নত এবং নফল আদায়ের মাধ্যমে। কিছু আলেম বলেছেন যাকাতুল ফিতর সুহু সিজদার মতো। সুহু সিজদার মাধ্যমে যেভাবে নামাযের ক্রটি শুধরে যায়; তেমনি যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে রোযার ক্রটিও সেরে যায়।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ أَغْنُوهُمْ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ ـ

অর্থ ঃ 'আজ তাদেরকে ধনী করে দাও।' অর্থাৎ ঈদের দিন গরীব-মিসকীন ও অসহায় মানুষকে ধনীদের মতো আনন্দ দান করার উদ্দেশ্যে সচ্ছল করে দাও। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অভাবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা হয়, অন্যদিকে পবিত্র উৎসবের দিনে এটি একটি বিরাট মানবিক বিষয়। কিছু লোক ঈদের আনন্দ-উৎসব করবে আর কিছু লোক তা থেকে বঞ্চিত হবে তা কি করে হয় ? ধনীর সম্পদের একটা সামান্য অংশ গরীবদের মাঝে বিতরণ করলে যদি তাদের দারিদ্র্য দূর হয়, তাহলে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম কি করে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে এবং তাদেরকে ঈদের দিন মহান উৎসব থেকে নিরাশ করতে পারে ? এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলাম রোযাদারের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছে।

তাই জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেন ঃ

কারো আঁখি জলে কারো ঘরে কিরে জ্বলিবে প্রদীপ ?

দু'জনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখে লাখে হবে বদ নসীব।

এ নহে বিধান ইসলামের।

ঈদুল ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,

ওগো সঞ্চয়ী উদ্বৃত্ত যা করবে দান,

ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার!

ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,

তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পেয়ালাতে

দিয়া ভোগ কর, কর বীর দেদার।

দুনিয়ার আর কোন দর্শন কিংবা বিধানে এত বড় মানবিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। অন্ততঃ হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বৌদ্ধদের বিভিন্ন দিবস ও প্রার্থনা, খৃষ্টানদের বড় দিন এবং ইহুদীদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা আছে বলে দেখা যায় না।

কি কি জিনিসের মাধ্যমে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা যায় ?

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ (ص) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ -

অর্থ ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এক সা' খাদ্য, কিংবা এক সা' খেজুর, কিংবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' কিসমিস সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম।' (বোখারী ও মুসলিম)

আলেমদের একটা বিরাট অংশ এখানে 'খাদ্য' বলতে গমকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য আলেমদের অন্য অংশ এখানে খাদ্য বলতে দেশবাসীর প্রধান খাবারকে বুঝিয়েছেন, সেটা গম, যব, ভুট্টা ও চাউল যাই হউক না কেন। এই ব্যাখ্যাই বেশী ঠিক বলে মনে হয়। কেননা, সাদাকাতুল ফিতর হচ্ছে গরীবের প্রতি ধনীর সহানুভূতি। তা বিদেশী কোন খাবারের মাধ্যমে করা জরুরী নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাউল। সেই চাউল দ্বারা তা আদায় করা ভাল।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে সাদাকাতুল ফিতর দানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত, রাসূলুল্লাহর (সা) সরাসরি সুন্নাহ পালনের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য দান করা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার আশংকা হয়, এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর বিরোধিতা করা হয় এবং আমি তাকে যথার্থ মনে করি না।' তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়, ওমার বিন আবদুল আযীয (রা) খাদ্যের মূল্য দান করতেন। তাহলে, আমরা পারবো না কেন ? তিনি উত্তরে বলেন, 'লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীকে ত্যাগ করে, বলে যে, অমুক এটা বলে।'

ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীরা মূল্য দেয়াকে জায়েয বলেছেন। তাঁরা হযরত ওমার বিন আবদুল আযীয এবং হাসান বসরীর বরাত দিয়ে কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র) মূল্য দেয়াকে জায়েয মনে করতেন।

যাকাতে পণ্যদ্রব্যের নগদ অর্থ গ্রহণের বিষয়টি স্বয়ং নবী করিম (সা) এবং তাঁর যুগ ও পরবর্তী যুগের একদল সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা প্রমাণিত।

বোখারী শরীফের باب العروض فى الزكاة 'যাকাত বাবদ পণ্যদ্রব্য গ্রহণ অধ্যায়ে বর্ণিত। নবী করিম (সা) মোয়াজ (রা)কে ইয়েমেনে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠান। মোয়াজ (রা) ইয়েমেনবাসীদেরকে বলেন, 'তোমরা ভূট্টা ও যবের পরিবর্তে কাপড়, পোশাক, লাল বা কাল ডোরাকাটা কাপড় দাও, এটা তোমাদের জন্য সহজ এবং মদীনার সাহাবীদের জন্য উত্তম। এখানে মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনু রোশাইদ বলেন ঃ ইমাম বোখারী এই মাস'আলায় মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ এ ক্ষেত্রে মজবুত দলীল রয়েছে। যদিও তিনি অন্যান্য বহু বিষয়ে হানাফী মাজহাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এটা জানা কথা যে, মোয়াজ (রা) ঐ মূল্য বাবদ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নবী (সা)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। অথচ, তাঁকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় নবী করিম (সা) পরিষ্কার ভাষায় আদেশ দিয়েছেন ঃ

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الابِلِ وَالْبَقَرَ مِنَ الْبَقَرِ -

অর্থ ঃ 'তুমি গম-যব-ভূট্টার মতো শষ্যের যাকাত শষ্য, ভেড়া-বকরী বাবদ ভেড়া, উটের বাবদ উট এবং গরু বাবদ গরু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে।' (সুনানে কোবরা-বাহয়াকী)

এই পরিষ্কার নির্দেশ সত্ত্বেও মোয়াজ (রা) যব ও ভূট্টার মূল্য বাবদ কাপড় দানের আহ্বান জানান। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য যে চাহিদা তা পূরণ করা। তাই তিনি হুবহু পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করেননি। মদীনায় তখন শষ্যদানের পরিবর্তে কাপড়ে-চোপড়ের প্রয়োজন বেশী ছিল। তাই তিনি বলেন, এটা তোমাদের জন্য সহজ আর মদীনার সাহাবীদের জন্য উত্তম। নবী করিম (সা) সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঐ মূল্য গ্রহণ করেছেন। যদিও সেটা তাঁর নির্দেশের

পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছিল না। মূল্য গ্রহণ করা নাজায়েয হলে তিনি অবশ্যই তা নিষেধ করতেন।

ইমাম বোখারী মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে বোখারী শরীফে বর্ণিত আরেকটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ـ

অর্থ ঃ 'যার উটের যাকাত বিনতে মাখাদ[১] দেয়, কিন্তু বিনতে মাখাদ তার কাছে নেই, আছে বিনতে লাবুন[২]; সেটাই যাকাত বাবদ তার থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দেরহাম ফেরত দেবে।'

এ হাদীসটি মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইমাম বোখারী মূল্য গ্রহণের পক্ষে আরেকটি হাদীস প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, ঈদুল ফিতরের দিন নবী করিম (সা) মহিলাদেরকে বলেন ঃ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ 'তোমরা নিজেদের অলংকার হলেও সাদকা আদায় করো।' (মোসনাদে আহমদ)

তখন মহিলারা হাতের চুড়ি ও আংটি ইত্যাদি সাদকা করলো। ইমাম বোখারীর মতে, ফরয যাকাতকে নফল দান-সদকা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়নি। সোনা-রূপাই ছিল তখন নগদ মুদ্রা। অলংকার, সোনা-রূপা দিয়েই তৈরি করা হতো।

আল্লামা গামারী বলেন, যাকাত ও যাকাতুল ফিতরের হুকুম একই। উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই।

হাদীসে সাদাকাতুল ফিতরকে যাকাত বলা হয়েছে। লোকদেরকে যাকাতুল ফিতর বাবদ খাদ্যদ্রব্য দানের নির্দেশ দেয়ার পেছনে শরীয়তের হেকমত ছিল, নবী করিম (সা)-এর যুগে আরব দেশগুলোতে নগদ অর্থ মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ছিল। বিশেষ করে গ্রামে তা ছিল দুর্লভ। আর গরীবদের কাছে তা ছিল না বললেই চলে। যদি তাদেরকে তখন নগদ অর্থ আদায়ের নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে তাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্যতার কারণে যাকাতুল ফিতর আদায় করা সম্ভব হতো না। ধনীদের সম্পদ বলতে ছিল– গবাদি পশু ও খাদ্য। খাদ্যদ্রব্য সর্বত্র সহজলভ্য ছিল। এ সকল কারণে মূল্য আদায় করা বৈধ।

---

১. পূর্ণ এক বছর বয়স্কের উষ্ট্রী শাবককে বিনতে মাখাদ বলে।

২. পূর্ণ দুই বছরের উষ্ট্রী শাবককে বিনতে লাবুন বলে।

কাদের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব

মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড় ও শিশুদের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। স্ত্রী ও শিশুদের সাদাকাতুল ফিতর স্বামী কিংবা পিতার উপর ফরয। ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, মালেক, লায়েস এবং ইসহাকের মতে, স্বামীর উপর স্ত্রীর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। কেননা, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। গর্ভজাত সন্তানের উপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়, তা আদায় করা উত্তম বা মোস্তাহাব। তবে হযরত ওসমান (রা) তাও আদায় করতেন।

ইবনে ওমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে স্বাধীন ও গোলাম এবং নারী ও পুরুষের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব বলা হয়েছে। এর দ্বারা ধনী ও গরীব উভয়কে বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে যাকাতুল ফিতরকে 'মিসকীনে'র খাবার বলা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই 'গরীব' ও মিসকীনদের মধ্যে সাদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য সূচিত হয়। ধনীরা তো সাদকা আদায় করবেই। কিন্তু যে গরীব, সাহেবে নেসাব নয়, অর্থাৎ যার উপর সম্পদের যাকাত ফরয নয়, অথচ তার কাছে ঈদের দিন নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, অধিকাংশ ওলামার মতে, তাদের উপরও সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবের ফতোয়াও এর উপর। যদিও ইমাম আবু হানিফাসহ তাঁর কিছু সাথীর মতে, কেবলমাত্র সাহেবে নেসাব বা যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপরই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। অন্য সময় এ জাতীয় গরীব লোক যাকাত গ্রহণ করে। তাই সাদাকাতুল ফিতর অপেক্ষাকৃত বেশী গরীব বা মিসকীনকে দিতে হয়।

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব ও আদায়ের সময়

ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, সাওরী ও ইমাম মালেকের এক মত অনুযায়ী, রমযানের সর্বশেষ দিন সূর্যাস্তের মুহূর্তে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। কেননা, সূর্য ডুবার সাথে সাথে রমযানের রোযা শেষ হয়ে যায়। আর এই সাদকা হচ্ছে, রোযার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার জন্য। তাই সূর্যাস্তের সময়ই তা ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানিফা, লায়েস ও আবু সাওর এবং ইমাম মালেকের অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের দিন ফজরের সময় তা ওয়াজিব হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, ঈদের নামাযের আগে

সাদাকাতুল ফিতর আদায় করলে তা কবুল হবে। পরে করলে তা সাধারণ দান-সাদকায় পরিণত হবে। তা কবুল হবে কিনা তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। তাই তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈদের নামাযের আগেই আদায় করতে হবে। ইমাম বোখারী ও মুসলিম আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় 'ইয়াওমুল ফিতরে' এক সা' খাদ্য দান করতাম। এখানে 'ইয়াওমুল ফিতরে' বলতে ঈদের পুরো দিন বুঝায়।

ইমাম শাফেঈর মতে, ঈদের নামাযের আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আজ তাদেরকে ধনী করে দাও। এখানে 'আজ' বলতে ঈদের পুরো দিনকে বুঝায়। অনেক ফকীহ্র মতে, ঈদের নামাযের পর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা মাকরূহ। কেননা, সে দিন তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেয়ার নির্দেশ পালন করতে হলে সকাল বেলায় তা আদায় করতে হবে যেন পুরো দিন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ঈদের নামাযের পর আদায় অর্ধ দিবসের জন্য তাদেরকে ধনী করা হয়।

ইবনে ওমার (রা) থেকে বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) ঈদের ২/১ দিন আগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে দিতেন। ইমাম আহমদেরও এই মত। তবে তিনি এর চাইতে আগে দেয়াকে নাজায়েয মনে করতেন। ইমাম মালেকের মতও তাই। মালেকী মাযহাবের কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন ১৬ই রমযান থেকে তা অগ্রিম আদায় করা যাবে। শাফেঈ মাযহাবে ১লা রমযান থেকে এবং হানাফী মাযহাবে বছরের শুরু থেকে আদায় করা জায়েয আছে। তবে সকল মাযহাবে ঈদের দিন ভোর বেলায় তা আদায় করা উত্তম এবং বিলম্ব না করা উচিত।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

হাদীসে সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক সা' বলা হয়েছে। এটা মদীনার স্থানীয় মাপযন্ত্র। বাংলাদেশে সাবেক মণ ও সেরের ওজনে তা ছিল সাড়ে তিন সের। কিন্তু কেজির ওজনে তা প্রায় সোয়া দুই (কিলোগ্রাম) কেজির কাছাকাছি। আরেক হিসাব অনুযায়ী ১ সা' = ২ কেজি ১৭৬ গ্রাম। অর্ধ সা' = ১ কেজি ৮৮ গ্রাম। কেজি হিসেবে ওজন না করলে ৪ মোদ অর্থাৎ মাঝারী ধরনের লোকের দুই হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী পরিমাণ আদায় করতে হবে। হানাফী মাযহাবে গম ব্যতীত অন্যান্য জিনিসে এক সা' নির্ধারণ করা হয়েছে। গম হলে তা এক সা'র অর্ধেক দিতে হবে যা দুই মোদ কিংবা সোয়া এক কেজি থেকে সামান্য কম অথবা

মাঝারী আকৃতির লোকের হাতের দুই অঞ্জলীর পরিমাণের সমান। হানাফী মাযহাবের দলীল হচ্ছে ঃ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ (রা) বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এক সা' খাদ্য, কিংবা খেজুর, কিংবা যব, কিংবা কিসমিস অথবা পনির সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম। হযরত মুআইয়া (রা) মদীনায় আসার আগ পর্যন্ত আমরা এভাবেই তা দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু মুআইয়া (রা) বলেন সিরিয়ার দুই মোদ গম অর্ধ সা' খেজুরের সমান। (বোখারী)

তখন থেকে লোকেরা এই মত গ্রহণ করে এবং আমি নিজেও দুই মোদ গম অর্ধ সা' দেয়া শুরু করি।' (ওজায়েফ শাহরে রামাদান- হাফেজ যাইনুদ্দিন, আবুল ফারাজ- নাহদাহ প্রকাশনী, মিসর)

এক বর্ণনায় খাদ্য' বলতে 'যব' এর কথা উল্লেখ আছে। (ওজায়েফ শাহরে রামাদান- হাফেজ যাইনুদ্দিন, আবুল ফারাজ- নাহদাহ প্রকাশনী, মিসর)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মদীনায় গম তেমন একটা ছিল না। থাকলেও সামান্য ছিল। সাহাবাদের যামানায় গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম আধা সা' গমকে এক সা' যবের সমান মনে করেন এবং আধা সা' গম দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেন। হযরত ওসমান, আলী, আবু হোরায়রা, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের এবং আসমা বিনতে আবি বকর (রা) এইভাবে তা আদায় করেছেন বলে জানা যায়। (ইবনে আবি মায়বা, মোসান্নাফ, আবদুর রাজ্জাক)

কিন্তু ইবনে ওমর ও আবু সাঈদের বর্ণিত হাদীসে এক সা' খাদ্য দেয়ার কথা উল্লেখ থাকায় এক সা' পরিমাণ দেয়াই উত্তম বলে মনে হয়। হাসান বসরী, জাবের বিন ইয়াজিদ, শাফেঈ, মালেক, আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাকের মতে সাদাকাতুল ফিতর এক সা' দিতে হবে। সেটা গম বা অন্য যাই কিছু হউক না কেন।

২৮শ শিক্ষা

ঈদুল ফিতরের উপহার

পরিশ্রমের জন্য রয়েছে পারিশ্রমিক, আর কষ্টের জন্য রয়েছে আনন্দ। দীর্ঘ এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার ফলে রমযানের কুদরতী তাপে পাপকে জ্বালিয়ে দেয়ার পরই আসে পুরস্কারের আনন্দ। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'রমযানের সর্বশেষ রাত্রে আল্লাহ রোযাদারের গুনাহ মাফ করে দেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কদরের রাত্রের কথা বলছেন ? তিনি উত্তর দেন, 'না'। তবে শ্রমিককে তার কাজ শেষে পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয়া হয়।' (আহমদ)

এই হাদীসে রোযাদারকে শ্রমিকের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, তারা রোযা শেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করবেন। সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার হচ্ছে, ক্ষমা ও মাগফিরাত– এই কথাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখে আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেন।' অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে তারাবীর নামায পড়ে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।' আরো এক হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রে নামায পড়ে, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেন।' রোযা, তারাবী ও কদরের পরেই ঈদ আসে। তাই ঈদে এই তিনটি ক্ষমাই এক সাথে পাওয়া যায়।

আরেক হাদীসে এসেছে, 'কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে; ৫ ওয়াক্ত নামায– এক জুমআ' থেকে আরেক জুমআ' এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান, মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষতিপূরণ।' অর্থাৎ গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ঈদুল ফিতরের পুরস্কার সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে দুর্বল সনদ ভিত্তিক একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেশতারা জমীনে নেমে আসেন এবং উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে আওয়াজ দিতে থাকেন যে, মানুষ ও জিন ছাড়া আল্লাহর সকল সৃষ্টি তা শুনতে পায়। ফেরেশতারা বলেন, হে উম্মতে মোহাম্মদ! তোমরা তোমাদের দয়ালু প্রভুর উদ্দেশ্যে বের হও, তিনি আজ অতি বিরাট দান করবেন এবং বড় গুনাহ মাফ করবেন। মুসলমানরা

ঈদগাহে হাজির হলে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ফেরেশতারা! কাজ শেষে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তোমাদের রায় কি ? জওয়াবে ফেরেশতারা 'বলেন, হে আমাদের মা'বুদ! শ্রমিকদেরকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী করে বলছি, আমি তাদের নামায ও রোযার সওয়াবকে আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমায় পরিণত করলাম। হে মোমিনগণ! তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় ঘরে ফিরে যাও।' (কিতাব ফাজায়েলে রামাদান-সালমা বিন শোবাইব)

আসমানে ঈদকে পুরস্কার দিবস বলা হয়। আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঐ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বড় পুরস্কারের জন্য বড় গণজমায়েত দরকার। তাই ঈদ হচ্ছে বৃহত্তর গণজমায়েতের ব্যবস্থা। এই সমাবেশ হাশরের ময়দানের বিশাল সমাবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেও সকল মানুষকে তাদের কাজের পুরস্কার দেয়া হবে। তবে, সেই পুরস্কার খারাপও হতে পারে কিংবা ভালও হতে পারে। নেক বেশী হলে পুরস্কার আনন্দদায়ক হবে, আর পাপ বেশী হলে পুরস্কার হবে বেদনাদায়ক। ঈদের পুরস্কারও একইরূপ হবে।

গোসলের পর যেমন শরীরে ময়লা থাকে না, তেমনি রমযানের রোযার পরও কোন গুনাহ থাকে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক যে রমযান পাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহ্ মাফ হয়নি।' (হাকেম)

রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির সুংসবাদের আনন্দ লাভ করে। ঈদুল ফিতরের দিন তার আংশিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ এর মাধ্যমে বান্দার আনন্দের সামান্য নমুনা দেখান। মোমিনের আসল আনন্দতো হবে বেহেশতে আল্লাহর সাথে। সত্যিকার আনন্দ বা খুশী আসে আল্লাহর আনুগত্য বা আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে। তাই রমযানের পরে আল্লাহর অন্যান্য আদেশ-নিষেধ মেনে চললে সেই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করবে।

ঈদে নতুন কাপড়-চোপড় ও সাজ-গোছের প্রচলন আছে। এ প্রসঙ্গে একজন আরবী কবি বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ + بَلِ الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا + وَلٰكِنَّ الْعِيْدَ لِمَنْ تَرَكَ الْخَطَايَا -

অর্থ ঃ 'ঈদ সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরে, বরং ঈদ সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। ঈদ সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে সওয়ারীতে আরোহণ করে, বরং ঈদ সেই ব্যক্তির জন্য যে গুনাহর কাজ ত্যাগ করে।'

এক নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তি ঈদের দিন কিছু লোককে খেলাধূলায় মশগুল দেখে বললেন, 'তোমরা যদি নেক কাজ করে থাকো তাহলে তা নেক কাজের শুকরিয়া নয়, আর যদি পাপ কাজ করে থাকো তাহলে দয়াবান আল্লাহর সাথে এভাবে আর কত করবে ?

হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্তের সময় খলীফা ওমার বিন আবদুল আযীয কিছু লোককে উট ও ঘোড়ার উপর দ্রুত দৌড়াতে দেখে মন্তব্য করেন, 'আজ যার ঘোড়া বা উটে দ্রুতগামী সে বিজয়ী প্রতিযোগী নয়, বরং সেই বিজয়ী প্রতিযোগী যার গুনাহ্ মাফ হয়েছে।' রমযানেও গুনাহ্ মাফের প্রতিযোগিতাই কাম্য অন্য কোন প্রতিযোগিতা নয়।

হযরত আলীর (রা) মতে, মুসলমানের ঈদ প্রতিদিন। প্রতিদিনই তারা গুনাহ থেকে দূরে থেকে সওয়াব ও মুক্তির খুশী লাভ করে।

রমযান পরবর্তী সময়ে আমাদের কি করণীয় ? এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা)কে জিজ্ঞেস করা হলো, যারা রমযান আসলে এবাদত করে ও কষ্ট করে এবং রমযান চলে গেলে আবার গাফেল হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি ? তিনি উত্তর দেন, 'তারা কতইনা বদ-নসীব যারা শুধু রমযানে আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে।' নেক আমল কবুলের লক্ষণ হলো, পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখা। যেমন নামায কবুলের লক্ষণ হলো, নফল নামায আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া।

ঈদুল ফিতরের অর্থ

'ঈদ' শব্দের অর্থ কি ? এর উত্তরে বলা যায়, আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞরা এর দুইটি অর্থ প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, ঈদ অর্থ ফিরে আসা। বছরে একবার এই উৎসব দিবসটি খুশী ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে ফিরে আসে। এই জন্য একে ঈদ বলা হয়। আরবরা উট, নৌকা ও মুসাফিরের দলকে 'কাফেলা' বলে। 'কাফেলা' অর্থ ফিরে আসা। কাফেলা কল্যাণ ও সম্পদের বার্তা নিয়ে ফিরে আসে। আরবদের মধ্যে এ রকম প্রকাশভঙ্গী প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'আ'দত-অভ্যাস عادة থেকে ঈদ শব্দের উৎপত্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈদের অর্থ হলো, আল্লাহ প্রতি বছর ঈদের মাধ্যমে বান্দাকে তাঁর দয়া, এহসান ও করুণা ভোগে অভ্যস্থ করে তুলেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈদ হচ্ছে বান্দার জন্য বিরাট আতিথেয়তা। তাই তিনি ঈদের দিন রোযা রাখাকে হারাম করেছেন। এ জন্য ঈদকে আল্লাহর নিয়ামত ও জিয়াফত ভোগ করার চিরন্তন অভ্যাস বা আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।

ঈদুল ফিতর মানে কি ? 'ফিতর' মানে রোযা ভাংগা। ইফতার শব্দ এই 'ফিতর'

থেকেই এসেছে। ঈদুল ফিতর মানে, রোযা ভাংগার ঈদ। ঈদের দিন রোযা ভাংগা প্রথম ও প্রধান কাজ। তাই মহানবী (সা) মিষ্টি খেজুর খেয়ে ঈদের সূচনা করতেন। অন্য এক মত অনুযায়ী, 'ফিতর' ফেতরাত শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বভাব-প্রকৃতি। আল্লাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ 'ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী নয়, বরং স্বভাব-প্রকৃতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য সে দিক নির্দেশ করে।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈদুল ফিতরের অর্থ হলো, স্ববাব-প্রকৃতি সম্মত ঈদ। পবিত্র রমযানের দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার কষ্ট ও ক্লান্তির পর স্বাভাবিকভাবেই সুখভোগের প্রশ্ন আসে। ঈদুল ফিতর মুসলমানদেরকে সেই স্বভাব সম্মত সুখ উপহার দেয়।

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি মদীনার স্থানীয় দু'টো জাতীয় উৎসব দিবস সম্পর্কে অবগত হন। ঐ দুই দিবসে মদীনাবাসীরা খেলাধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তি করতো। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ দুই দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, দিবস দু'টো কি ? মদীনাবাসীরা বলেন, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে ঐ দুই দিবসে খেলাধূলা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দুই দিবস অপেক্ষা আরো ২টি উত্তম উৎসব দিবস দান করেছেন। সেগুলো হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা'। (আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ)

অন্যান্য জাতির জাতীয় উৎসব

প্রত্যেক জাতির জাতীয় উৎসব ধর্মীয় রঙে রঙ্গিন। মুসলমানদের ঈদ হচ্ছে এবাদত। ঈদের নামাযের মাধ্যমে ঐ উৎসবের সূচনা হয়। ঐ দিবসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাব বিনিময় করা হয় এবং পারস্পরিক সাক্ষাত করা হয়। এ সবই ভাল ও কল্যাণকর। এতে অপচয়, অশালীনতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা নেই। সকল কাজ ও অনুষ্ঠান মার্জিত ও যুক্তিসঙ্গত। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত।

হিন্দু সমাজের জাতীয় উৎসব হচ্ছে দুর্গা পূজা, বৌদ্ধ সমাজের রয়েছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা, গ্রীক ও রোমান সমাজের জাতীয় উৎসব হচ্ছে 'বাকুস' এবং খৃস্টানদের হচ্ছে, 'বড় দিন বা ক্রিস্টমাস ডে'। এগুলো সবই ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত। এছাড়া তারা ইংরেজী নববর্ষকেও উৎসব হিসেবে পালন করে।

কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলো জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব পালন উপলক্ষে যে হীন ও ঘৃণ্য কাজ করে, তাকে কিছুতেই বিবেকসম্মত ও মার্জিত উৎসব বলা যায় না।

গ্রীক ও রোমান সমাজ 'বাকুস' নামক যে জাতীয় উৎসব পালন করে তাতে

পুরুষদের যৌন কামনা পূরণের জন্য নারী সমাজকে নিজ চরিত্র ও সতীত্বের বলি দিতে হয়। কোন বিবেকবান নারী অনুষ্ঠানে পুরুষের পাশবিক রসনা পূরণে অস্বীকৃতি জানালে সেই সমাজের ধর্মীয় যাজক ও পাদ্রীরা তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলে, তারা সমাজের কলংক, তাদেরকে জনবসতি থেকে দূরে দাফন করা হউক।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন পূজায় মূর্তির সামনে যে ভোগ বা খাবার আগুনে ঘি ঢেলে জ্বালানো হয় তা নিঃসন্দেহে বিরাট অপচয়। শিবলিঙ্গ পূজায় তথাকথিত 'বর' দেয়ার নামে নারী চরিত্র হননের সর্বগ্রাসী সয়লাব সৃষ্টি করা হয়।

পাশ্চাত্য খৃস্টান সমাজ ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিন এবং ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে যে পাশবিক অনাচারে লিপ্ত হয় তা ইতিহাসের সকল যৌন কেলেংকারীকে হার মানায়। ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটের সময় অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম মুহূর্তেই শুরু হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যৌন কেলেংকারী। তখন যুবক-যুবতী কিংবা নারী-পুরুষের মজলিশের আলো হঠাৎ নিভিয়ে দেয়া হয়। তারপরই শুরু হয় যৌন যুদ্ধ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিটিং হলটি বেশ্যালয়ে পরিণত হয়।

ইহুদীদের যৌন কেলেংকারীরও কোন সীমা নেই। বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় উৎসব নীতি-নৈতিকতা এবং পবিত্রতার নাম-গন্ধও নেই। সেখানে অর্থের অপচয়, শ্লীলতা ও নারীর সতীত্বহানি, অর্থহীন কাজ এবং চরিত্রহীনতার পুঁতিগন্ধময় পরিবেশ বিরাজমান।

পক্ষান্তরে, মুসলমানের ঈদ হচ্ছে খুশী ও পবিত্র অনুভূতির প্রকাশ এবং গরীব মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট পরিবেশ। যাকাতুল ফিতর দান করে অন্ততঃ বছরে একদিন হলেও ধনী-গরীব সবার খুশীকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। গোটা মুসলিম জাহানে ঐদিন স্বর্গীয় আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়।

ঈদের দিন করণীয়

ঈদের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) উপর দরূদ পাঠ করা দরকার। তারপর ঈদের সন্ধ্যা থেকে ঈদের নামায পর্যন্ত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাকবীর বলতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ -

অর্থ ঃ 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকবীর উচ্চারণ করো, কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন।' (সূরা বাকারা-১৮৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকাশ্যে নিম্নোক্ত তাকবীর পড়তেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু

আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। ঈদের রাত্রে সজাগ থেকে আল্লাহর এবাদত করা বিরাট সওয়াবের বিষয়। এ প্রসঙ্গে ওবাদাহ বিন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুই রাত সজাগ থাকে, যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে সেদিন তার অন্তর মরবে না।' (তাবারানী)

এই হাদীস দ্বারা ঈদের রাত্রে এবাদতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

ঈদের দিন ভোরে ঈদের নামাযের আগে ফিতরা আদায় করতে হবে। তারপর ঈদের নামায পড়তে হবে। মাঠে ঈদের নামায পড়া উত্তম। মসজিদে ঈদের নামায পড়া যায়, তবে উত্তম নয়। সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে যাওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করতেন। ঈদের খোতবা শোনাও জরুরী। ভিন্ন ভিন্ন পথে ঈদের মাঠে আসা-যাওয়া সুন্নাহ। (বোখারী)

ভোরে উঠেই মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের দিন ভোরে ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে কয়েকটি খেজুর খেতেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তিনি কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেতেন।' (বোখারী)

ঈদের দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরা উত্তম। নতুন পোশাক পরতে বাধা নেই। তবে ঈদে অবশ্যই নতুন কাপড় পরতে হবে– এ জাতীয় ধারণা অর্থহীন। যারা এর উপর জোর দেন, তারা ভুল করেন। কাপড় থাকা অবস্থায় নতুন কাপড় কেনা অবশ্যই অপচয়। আর অপচয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই। জাবের (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি জুব্বা ছিল। তিনি দুই ঈদ ও জুম'আতে তা পরতেন। (ইবনে খোজায়মা)

ইবনে ওমার (রা) ঈদের দিন নিজের সর্বাধিক সুন্দর পোশাক পরতেন। (বায়হাকী)

ঈদের সময় ছোটদেরকে স্নেহ-আদর এবং বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ একে অন্যকে এই বলে অভিনন্দন জানাতেন ঃ 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের কাছ থেকে রমযানের রোযা কবুল করুন এবং পুনরায় রমযানকে ফিরিয়ে দিন।' সালাম বিনিময়, মোসাফাহা, কুশল বিনিময় এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে ভ্রমণ ইত্যাদি কাজ করা উত্তম। মহিলাদের জন্যও ঐ সকল কাজ প্রযোজ্য। ঈদ উপলক্ষে ভাল ও শিক্ষামূলক আলোচনা, নাটক ও ফিল্ম, ইসলামী গান ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলাম বিরোধী কিছু করা যাবে না।

২৯তম শিক্ষা

বিবিধ

নেক ও কল্যাণের মওসুম রমযান শেষে শুরু হয় আরেকটি পবিত্র মওসুম। সেটি হচ্ছে, হজ্জের মওসুম। ১লা শাওয়াল থেকে হজ্জ শেষ হওয়া পর্যন্ত ঐ মওসুম বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ -

অর্থ ঃ 'হজ্জ হচ্ছে, কয়েকটি নির্দিষ্ট জানা মাস।'

কয়েকটি নির্দিষ্ট জানা মাস বলতে ঈদুর ফিতর তথা ১লা শাওয়াল থেকে এর সূচনা হয় এবং হজ্জ সমাপ্তির আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই পরবর্তী পবিত্র মওসুমেও রোযার ধারা চালু রয়েছে।

ক. একই দিন মুসলিম বিশ্বে ঈদ উদযাপন

বিশ্বব্যাপী একই দিন ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করা যায় কিনা, এ নিয়ে চান্দ্র মাসের ঐক্যবদ্ধ সূচনার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বহু মত পার্থক্য আছে। একদল ওলামায়ে কেরামের মতে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে ভৌগলিক পার্থক্যকে অস্বীকার করার জো নেই। তাদের বক্তব্যের পক্ষে কোরআন হাদীসের প্রচুর যুক্তি রয়েছে। এই মর্মে অনেক হাদীসের একটি উল্লেখ করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ -

অর্থ ঃ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো।' তাদের মতে ভৌগলিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে প্রত্যেক দেশে পৃথক পৃথক সময়ে ঈদসহ ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করতে হবে।

আরেক দল ওলামার মতে, এই একই হাদীসের ভিত্তিতে একই দিনে বিভিন্ন দেশে ঈদসহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করা যায়। তাদেরও রয়েছে অনেক যুক্তি ও ব্যাখ্যা। জিদ্দা ভিত্তিক ইসলামী ফেকাহ্ একাডেমী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ সংগঠন। ইসলামী ফেকাহ একাডেমীতে মুসলিম বিশ্বের বড় বড় ফকীহগণ দীর্ঘ গবেষণার পর বিশ্বে একই দিন ঈদ উদযাপনের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। একাডেমী ৮-১৩ই সফর-১৪০৭ হি, মোতাবেক ১১-১৬ অক্টোবর

১৯৮৬ জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলেছে ঃ 'কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে, অন্য দেশের মুসলমানদেরও তাই মেনে চলা দরকার। চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কেননা, চাঁদ দেখা মাত্র রোযা রাখা ও ইফতার করার আদেশ সার্বজনীন ও সবার জন্য প্রযোজ্য।'

একই দিন বিশ্বব্যাপী ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করতে হলে, বিশ্ব মুসলিমের বৃহত্তম ঐক্য ও সমন্বয় দরকার। বিশেষ করে মুসলিম সরকারগুলোকে এ বিষয়ে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ. জরুরী মাস'আলা

১. যারা দেশ-বিদেশ সফর করেন কিংবা দূর দেশে চাকুরী করেন তারা সফরে গেলে ৩০ রোযার চাইতে কম ও বেশী রোযার সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের ব্যাপারে মাস'আলা হচ্ছে, যদি সফরে ভৌগলিক পার্থক্যের কারণে রোযার সংখ্যা ৩০ এর বেশী হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। যদি তখনও রোযার মাস অবশিষ্ট থাকে তথাপি রোযা রাখতে হবে। যেমন কেউ ১/২ দিন আগে এক দেশে রোযা শুরু করে আরেক দেশে গিয়ে যদি দেখেন যে সেখানে এখনও রোযা চলছে, তাহলে তাঁকে রোযা রাখতে হবে। যদিও তার রোযার সংখ্যা ৩০-এর অধিক হয়ে যায়। কেননা, কোরআন বলছে ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযার মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।' তখন পর্যন্ত রোযার মাস বাকী থাকায় এই আয়াতের মর্মানুযায়ী তাকেও রোযা রাখতে হবে।

অবশ্য কোন দেশে ঈদ হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে অন্য দেশে গেলে এবং প্রকাশ্যে রোযা চলতে থাকলে, আর রোযা রাখা লাগবে না। তবে রোযার সম্মানে প্রকাশ্যে কিছু খাওয়া যাবে না। কেননা, একজন ব্যক্তির জন্য দুইবার ঈদ প্রযোজ্য নয়।

২. মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করা

রোযার মাসে রোযা পূর্ণ করা এবং সুষ্ঠুভাবে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ওষুধ সেবন করে মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করার বিষয়টি একটি বিরাট প্রশ্ন। এই মর্মে সৌদি আরবের ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, তা জায়েয এবং তাতে কোন দোষ নেই। তাঁদের দলীল হলো, এ বিষয়ে যেহেতু শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং তাতে ক্ষতিরও কিছু নেই, বরং সাময়িক কিছু উপকারিতা আছে, ফলে

তাতে কোন দোষ নেই। তবে কারুর মতে, স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ঋতু বিলম্বিত না করাই উত্তম।

সৌদী আরবের উচ্চ ওলামা কমিটির পরলোকগত সদস্য শেখ মোহাম্মদ সালেহ বিন ওসাইমীন (র) বলেন ঃ রমযানের রোযা কিংবা হজ্জ ও ওমাহর জন্য টেবলেট খেয়ে মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করা উচিত নয়। শেখ সালমান ফাহাদ আওদাহসহ আরো অনেক বড় বড় আলেম একই মত পোষণ করেন। তাদের মতে, এটা স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী। আল্লাহ নারীদেরকে মাসিক ঋতু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে এ কাজ করা ঠিক নয়। এছাড়া, ঋতুকে বাধাগ্রস্ত করলে শরীরের উপর এর ক্ষতি অনিবার্য। ঐ সময় শরীর রক্তস্রাবের জন্য তৈরি হয়। তাই স্রোতের গতিকে বাধাগ্রস্ত করলে তা ক্ষতিকর বানভাসির কারণ হবে। এমনকি তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে অবশ্যই এর উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে।

অভিজ্ঞ ডাক্তাররা বলেছেন, এ টেবলেটগুলো জরায়ুর জন্য ক্ষতিকর। ফলে ভবিষ্যতে সন্তান উৎপাদনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এ কারণে কোন কোন সময় সন্তান বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ও বিকৃত হয়। ঋতু অবস্থায় নামায-রোযা থেকে বিরত থাকার আদেশ পালন, পবিত্র অবস্থায় নামায-রোযা আদায়ের মতই এবাদত। এবাদত হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা। ঋতু অবস্থায় নামায-রোযা থেকে বিরত থাকা আল্লাহর নিষেধের প্রতি আনুগত্যের কারণে অন্যতম এবাদত। তাদের মতে, ওষুধ ব্যবহার থেকে মহিলাদের বিরত থেকে আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির উপর টিকে থাকাই উচিত। আল্লাহর হুকুম নিয়ম ও ফয়সালার মধ্যেই কল্যাণ।

আমাদের উত্তরসূরী নবীপত্নীগণ এবং মহিলা সাহাবীরা আমাদের জন্য আদর্শ। তাদেরও ঋতু হয়েছে এবং তারা পরে রোযা কাজা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি নবী (সা)-এর উপস্থিতির কারণে পরবর্তী শাবান মাসে রমযানের রোযা কাজা করেছেন। জায়েয থাকলেই কোন জিনিস করতে হবে এটা জরুরী নয়।

৩. রমযানে চিকিৎসা

অন্যান্য মাসের মতো রমযানের রোযায় রোগের চিকিৎসা করা যাবে। আগের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম শরীরের ভেতর নাক, কান ও পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু ঢুকালে রোযা নষ্ট হওয়ার ফতোয়া দিতেন। তাদের মতে,

শরীরের ভেতর কিছু শূন্যতা আছে যা ওষুধ দ্বারা পূর্ণ হয়। কিন্তু ইবনে হাজম তার বিপরীত মত প্রকাশ করে বলেছেন, রমযানে শুধু খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ। শরীরের অন্যান্য প্রবেশ পথে ওষুধ ব্যবহার করার নাম পানাহার নয়। তাই এই কারণে রোযা নষ্ট হবে না।

বর্তমান যুগের বহু আলেম ইবনে হাজমের মত অনুসরণ করেন। কেননা, ডাক্তাদের মতে, শরীরের ভেতর কোন শূন্যতা নেই। তাই প্রয়োজন হলে, নাক, কান ও গুহ্যদ্বার দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে রোযা ভাংতে পারে না। যেমন– নাকের ড্রপ, ইনজেকশান, সাপজিটর কিংবা অন্য কোন তরল পদার্থ ইত্যাদি। এমনকি হাঁপানী রোগী ইনহেলার ব্যবহার করতে পারে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। তাতে রোযা নষ্ট হবে না, কেননা, এগুলো খানা ও পান করার আওতায় পড়ে না।

তবে গ্লুকোজ জাতীয় ইনজেকশান গ্রহণ করলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তা খাবার ও পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুখে কোন ওষুধ ও টেবলেট পান করলে বা খেলে তাতে অবশ্যই রোযা নষ্ট হবে। কিন্তু শরীরে মলম ব্যবহার করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; অপারেশন করা ইত্যাদির মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয় না।

গ. শাওয়ালের ৬ রোযা

আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ -

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরে শাওয়ালে আরো ৬টি রোযা রাখে, সে যেন গোটা বছর রোযা রাখলো।' (মুসলিম)

ইবনে মাজাহ ও দারেমী সাওবান (রা) থেকে, আহমদ জাবের (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হোরায়রা (রা) থেকে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাওয়ালের ৬ রোযা রাখা উত্তম। অপরদিকে ইমাম মালেকের মতে ৬ রোযা জায়েয নেই। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসগুলো ইমাম মালেকের বক্তব্যকে বাতিল করে দেয়।

প্রশ্ন হলো, ৬ রোযা কি করে একটি পূর্ণ বছরের রোযায় পরিণত হয় ? এর জওয়াব হলো, আল্লাহর কাছে প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় হচ্ছে ১০। ৩০ রোযায় ৩শ দিন রোযার সমান। আর ৬ রোযায় আরো ৬০ দিন। এর ফলে, ৩৬০ দিনে চান্দ্রমাস অনুযায়ী এক বছর পূর্ণ হয়। রমযানে রোযা রাখার-পর

শাওয়ালের ৬ রোযা রাখলে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সারা বছর রোযাদার হিসেবে বিবেচিত হন।

তবে যাদের উপর রমযানের কাজা রোযা আছে তারা কাজা আদায় না করে শাওয়ালের নফল ৬ রোযা রাখতে পারবেন না। কেননা হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তির রমযানের রোযা পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ৬ রোযা রাখে, যার উপর কাজা রয়েছে তিনি রমযানের রোযা পূর্ণকারী নন। এছাড়াও ফরয দায়িত্ব বাকী রেখে নফল দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যুক্তি বিরোধী।

কোন কোন আলেমের মতে রমযানে ঋতুবতী মহিলারা যদি শাওয়ালে কাজা আদায় করে অতিরিক্ত ৬ রোযা রাখতে না পারে, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ঐ ৬ রোযার সওয়াবও দান করবেন, যদি তারা দ্বিগুন সওয়াবের নিয়ত ও আগ্রহ রাখেন। কেননা, আল্লাহ মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করেন না এবং তিনি মানুষের নিয়ত ও আগ্রহ অনুযায়ী দান করেন।

এখন আরেকটি প্রশ্ন হলো, ৬ রোযা কি শাওয়াল মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না অন্য মাসেও রাখা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ৬ রোযা শাওয়াল মাসেই সীমাবদ্ধ। কেননা, হাদীসে শাওয়াল মাসের কথা উল্লেখ রয়েছে। অন্য একদল আলেমের মতে, বছরের যে কোন সময়ই ৬ রোযা রাখা যাবে। শাওয়ালে না রাখলেও চলবে। তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ প্রতি মাসেই প্রতিটি নেক কাজ বা রোযার জন্য ১০ গুন সওয়াব দান করেন। তাই অন্য মাসে
প্রতিটি নেক কাজ বা রোযার জন্য ১০ গুন সওয়াব দান করেন। তাই অন্য মাসে
৬ রোযা রাখলেও হাদীসে বর্ণিত পুরা বছর রোযাদার হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

৩০শ শিক্ষা

জান্নাত ও জাহান্নাম

রমযানে বেহেশতের দরজা খোলা এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়। রমযান বেহেশতের চাবি ও দোযখ থেকে মুক্তির উপায়। এখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

ক. জাহান্নাম

চির দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানী, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্য, লজ্জা-শরম, ক্ষুধা-পিপাসা, আগুন, অশান্তি, হতাশ-নিরাশা, চীৎকার-কান্নাকাটি, শাস্তি, অভিশাপ, আযাব-গযব ও অসন্তোষের স্থান হলো জাহান্নাম। শান্তির লেশমাত্রও সেখানে নেই। হাত-পা ও ঘাড়-গলা শিকলে বেঁধে বেড়ি পরিয়ে দলে দলে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে শুধু অতি বেশী তেজ ও দাহ শক্তিসম্পন্ন আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। দোযখের অগ্নিশিখা তাদেরকে উপর, নীচ এবং ডান ও বাম থেকে স্পর্শ করবে, জ্বালাতে-পোড়াতে থাকবে। একবার চামড়া পুড়ে গেলে আবারো নূতন চামড়া গজাবে যেন বার বার আগুনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। পানি চাইলে এত বেশী গরম পানি দেয়া হবে যা পান করার সাথে সাথে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে যাবে। এ হচ্ছে, আজাবের উপর আযাব। তাতে পিপাসা না কমে আরো তীব্র হবে। অতি দুর্গন্ধময় যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত ঘাস ও গিসলিন হবে তাদের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় জঠর জ্বালায় তা ভক্ষণ করতে গেলে পেটের ভেতরে আরো যন্ত্রণা বাড়াবে। খাদ্য এবং পানীয় হবে আযাবের অন্যতম উপকরণ।

অতিশয় ঠাণ্ডা ও হিম প্রবাহ দ্বারাও আরেক প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। বরফের চাইতে শত গুন ঠাণ্ডা যামহারীরে তাদেরকে রাখা হবে। সে আযাব হবে করুণ। তারা শাস্তির মধ্যে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না। নিরূপায় হয়ে জাহান্নাম থেকে বাইরে যেতে চাইবে। কিন্তু আজ তাদের কোন সাহায্যকারী নেই, নেই কোন সুপারিশকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

জাহান্নামীদের আফসুস-আক্ষেপ

তারা জাহান্নামের কঠোর আযাব দেখে আফসুস পরে বলবে ঃ

'সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। জালেম সেদিন আপন হাত দু'টো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আফসুস, আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম। সে আমার কাছে উপদেশ আসার পরই আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।' (সূরা ফোরকান-২৬-২৯)

জাহান্নামের আযাব স্থায়ী

আল্লাহ বলেন, 'অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরস্থায়ী অবস্থান করবে।' (সূরা যোখরোফ ঃ ৭৪)

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জাহান্নামবাসীরা কাঁদতে থাকবে। তাদের চোখের পানিতে জাহাজ ভাসাতে চাইলে ভাসানো যাবে। তাদের চোখ থেকে অশ্রুর বদলে রক্ত বেরুবে।' (হাকেম-হাদীসের সনদ সহীহ, আল্লামা জাহাবী ও আলবানী একে সহীহ হাদীস বলেছেন)

শিকলে বেঁধে দাহ্য আলকাতরার জামা পরানো হবে

অপরাধীদের শাস্তি কঠিন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' (সূরা ইবরাহীম-৪৯-৫০)

যাক্কুম বৃক্ষ হবে খাদ্য এবং ফুটন্ত পানি শরীরের উপর ঢেলে দেয়া হবে

ক্ষুধার জ্বালায় জান বেরিয়ে যাবে। তখন তারা খাদ্য চাইবে। কিন্তু খাদ্য তো দেয়া হবে না, দেয়া হবে অখাদ্য। যেটা পাবে সেটাই খেতে চাইবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে। গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন পানি ফুটে। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।' (সূরা দোখান ঃ ৪৩-৪৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি দুনিয়ায় যাক্কুমের এক ফোঁটা রস নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা গোটা দুনিয়াবাসীর খাদ্য-খাবার বরবাদ করে দেবে। তাদের অবস্থা কি হবে, এটা যাদের খাদ্য হবে ?' (তিরমিযী)

পুজ পান করানো হবে

প্রচণ্ড শাস্তির কারণে জাহান্নামীদের ক্ষুধা-পিপাসা মারাত্মক হবে। তারা কেবল খাইতে চাইবে। যা দেয়া হবে তাই খাবে ও পান করবে। তাদেরকে পুজ ও রক্ত মিশ্রিত পানি পান করতে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন ঃ 'তার সামনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুজ ও রক্ত মিশ্রিত পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভেতর প্রবেশ করাতে কমই পারবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৬-১৭)

আগুনের পোশাক, গরম পানি ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে

দোযখীদের শাস্তি বহুমুখী। আল্লাহ বলেন ঃ 'যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোষাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহন শাস্তি ভোগ কর।'

জবুর গ্রন্থে লেখা আছে, যেনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে জাহান্নামে তাদের লজ্জাস্থানের সাথে বেঁধে টানিয়ে রাখা হবে এবং এর উপর লোহা দিয়ে পেটানো হবে।

কোরআনে বর্ণিত 'দোযখের ৭টি দরজার' তাফসীর প্রসঙ্গে আ'তা বলেন, এ দরজাগুলো ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন বিপদ-মুসীবতে ভরা। যারা জানা সত্ত্বেও যেনা করেছে, তাদের নিকৃষ্টতম পচা দুর্গন্ধে এগুলো দুর্গম হয়ে থাকবে। মাকহুল দামেশকী বলেন, দোযখীরা খুব পচা দুর্গন্ধ পেয়ে বলবে, এর চাইতে বেশী দুর্গন্ধ আমরা আর কখনও পাইনি। তাদেরকে বলা হবে, এটা যেনাকারীদের লজ্জাস্থানের পচা দুর্গন্ধ।

জাহান্নামে জুব্বুল হোযন নামক এক উপত্যকায় খচ্চরের মতো বিরাট বিরাট বিচ্ছু যেনাকারীকে দংশন করতে থাকবে। প্রতি দংশনে এক হাজার বছর পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। তারপর গোশত খসে পড়বে এবং জননেন্দ্রিয় থেকে পুজ বের হবে।

দোযখীদেরকে যেনাকারীদের যৌনাঙ্গ থেকে নিঃসৃত পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় পান করানো হবে।

বেনামাযীকে জাহান্নামের মালহাম নামক অঞ্চলের উটের ঘাড়ের মতো মোটা

এবং প্রায় এক মাসের পথের সমান লম্বা বিষধর সাপ দংশন করতে থাকবে। প্রতি দশংনের বিষ ৭০ বছর পর্যন্ত যন্ত্রণা দেবে, এরপর গোশত খসে পড়বে।

যারা সোনা-রূপার যাকাত দেয় না, সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপালে, পিঠ ও পার্শ্বে শেক দিয়ে বলা হবে, এখন তোমরা তোমাদের জমাকৃত সম্পদের মজা ভোগ করো।

এছাড়াও সুদখোর, মিথ্যুক, নিন্দুক, চোর-ডাকাত, জালেম-অত্যাচারী, অন্যের অধিকার নষ্টকারী, মা-বাপের অবাধ্য ও তাদেরকে কষ্টদানকারী সন্তানের জন্যও বহু আযাব রয়েছে। এখানে শুধু দু'একটা দলের আযাবের সামান্য ইঙ্গিত দেয়া হলো।

জাহান্নামের গভীরতা অনেক

আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসা। তিনি একটি শব্দ শুনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ ? আমরা জবাবে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক ভাল জানেন। তিনি বলেন, ৭০ বছর আগে, জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখন তা এর তলদেশে গিয়ে পড়েছে। (মুসলিম)

উপরে ও নীচে আগুনের ছাতা

জাহান্নামীদের নীচে ও উপরে এবং ডানে ও বামে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। তারা এ আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে। আল্লাহ বলেন ঃ 'তাদের জন্য উপর দিক এবং নীচের দিক থেকে আগুনের ছাতা থাকবে।' (সূরা যুমার ঃ ১৬)

আগুনের চামড়া পুড়ে গেলে নূতন চামড়া গজাবে

আল্লাহ বলেন ঃ 'কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে নেবে।' (সূরা মা'আরেজ ঃ ১৫-১৬)

অন্য আয়াতের এসেছে, যখনই চামড়া পুড়ে যাবে, তখন আমরা নূতন চামড়া গজিয়ে দেব।

দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনের তেজ ৭০ গুন বেশী

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার আগুন, জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি যথেষ্ট নয় ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ এর সাথে আরো ৬৯ গুন যোগ করা হবে এবং প্রত্যেকটির গুন এই আগুনের মতো।' (বোখারী ও মুসলিম)

নিম্নতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

নো'মান বিন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সবচাইতে কম সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী ব্যক্তি হলো যার দু'টো জুতার মধ্যে আগুনের দু'টো ফিতা থাকবে। তা মাথার মগজকে এমনভাবে টগবগিয়ে সিদ্ধ করতে থাকবে যেন পাতিলে সিদ্ধ করা হয়। সে মনে করবে, তার চাইতে এত কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ, সেটা হলো সবচেয়ে কম আযাব।

সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আগুন কাউকে ছোট গিরা পর্যন্ত, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, কাউকে কোমর পর্যন্ত এবং কাউকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে নেবে।' (মুসলিম)

জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী

উসামা বিন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আমি জান্নাতের গেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী গরীব-মিসকীন। ধনীরা আটকা পড়েছে। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর আমি জাহান্নামের গেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাদের অধিকাংশই নারী।' (বোখারী ও মুসলিম)

জাহান্নামীদের দাঁত ওহোদ পাহাড়সম, চামড়ার ঘনত্ব এবং দুই ঘাড়ের ব্যবধান তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ (জাহান্নামে) কাফেরের দাঁত হবে ওহোদ পাহাড় সমান এবং চামড়ার ঘনত্ব হবে তিন দিনের পাথের দূরত্বের সমান।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'জাহান্নামে কাফেরের দুই কাঁধের দূরত্ব দ্রুতগামী সওয়ারীর তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান।' (বোখারী ও মুসলিম)

জাহান্নামের আসল শাস্তির বর্ণনা বুঝার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। সে শাস্তি তো খুবই ভয়াবহ। জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জাহান্নামীরা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেবে

যখন সকল দোযখীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তখন উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদেরকে অভিযুক্ত করে বলবে, অনেক নবী-রাসূল এবং হেদোয়াতকারীর

আগমন ও তাদের কাছ থেকে হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা আমাদেরকে সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে দাওনি, বরং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছো।

এ মর্মে আল্লাহ্ কোরআন মজীদে বলেন ঃ 'আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের পূর্বে জিন ও মানুষের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিস্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুন ঃ তোমরা জান না। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে ঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, নিজ কর্মের কারণে শাস্তি ভোগ করো।' (সূরা আরাফ ঃ ৩৮-৩৯)

এ আয়াতে বিভ্রান্তকারী ও বিভ্রান্ত উভয়েরই শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেককে নিজের কাজও বিবেকের জন্য জবাবদিহী করতে হবে। অন্যকে দোষারোপ করে লাভ হবে না।

কোরআন মজীদ ভ্রান্ত নেতাদের অন্ধ আনুগত্যের পরিণতি সম্পর্কে বলে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন সাহায্যকারী ও অভিভাবক পাবে না। যেদিন আগুনে তাদের মুখমণ্ডল ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনে নিয়েছিলাম, তারপর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে অভিসম্পাত করুন। (সূরা আহযাব ঃ ৬৪-৬৮)

শয়তান নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে

মানুষ যে শয়তানের প্ররোচনা ও ওয়াসওয়াসার কারণে গুনাহ করেছে এবং খারাপ পথে চলেছে সে শয়তান হাশরের দিন দোযখীদেরকে দেখে বলবে, তোমাদের শাস্তির জন্য আমি দায়ী নই, তোমরাই দায়ী। কোরআন এ মর্মে আমাদেরকে বলে ঃ 'যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে,

আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, তারপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছো। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা যালেম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা ইবরাহীম ঃ ২২)

খ. জান্নাত

জান্নাত চিরশান্তির জায়গা। সেখানে আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ-আহ্লাদের চরম ও পরম ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে ভোগ-বিলাস ও পানাহারের আতিশয্য। বেহেশতীরা যা কামনা করবে কিংবা কোন কিছু পাওয়ার আহ্বান জানাবে, সকল কিছু পাবে। সেখানে সবাই যুবক হয়ে বাস করবে। শরীরে কোন রোগ-শোক, জরাজীর্ণতা, মন্দা, বার্ধক্য, দুর্বলতা ও অপারগতা থাকবে না। যত ধরনের ফল-ফলাদি, খাদ্য-খাবার, পানীয়, দুধ, মধু, সুস্বাদু খাবার সব খেতে পারবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান। সেগুলো স্বাদ ও গন্ধে অপূর্ব। আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ-বিহার, খেলা-ধূলা, বেড়ানো, বাজার করা ও শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাতে পারবে। অর্থ-সম্পদের কোন অভাব হবে না। দ্রুতগামী যানবাহনসহ মনের ইচ্ছা চোখের নিমিষে পূরণ করতে পারবে।

নারীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্বামী এবং স্বামীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্ত্রী ও রূপবর্তী লাবণ্যময়ী আয়তলোচনা হুর। তারা সেখানে সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন-যাপন করবে। মানুষ সেখানে পেশাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত এবং নারীরা ঋতুমুক্ত হবে।

এক কথায়, পরম ও চরম শান্তি বলতে যা বুঝায়, তা সবই জান্নাতে পাওয়া যাবে। দুনিয়ায় সুখ-শান্তির যত ব্যবস্থা আছে, জান্নাতের সুখ-শান্তির তুলনায় তা কিছুই না। বরং তা দুনিয়ার সকল আরাম-আয়েশকে হার মানাবে। মানুষ সুখ পেতে চায়। তাই পরম সুখ লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

জান্নাতের ব্যাপক পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এক বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে।' (সূরা সাজদাহ ঃ ১৭)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং এমনকি কোন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এরপর তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে, নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ো। যার অর্থ হলো ঃ 'কেউ জানেনা, তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে।' (বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান-যমীনের সমান

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা হবে আসমান-যমীনের সমান। যা মোত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।' (সূরা আলে-এমরান ঃ ১৩৩)

জান্নাতীদের চেহারা হবে ধবধবে সাদা এবং তারা ৬০ হাত লম্বা হবে

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী ১ম দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোর মতো। পরবর্তী দলগুলোর চেহারা হবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। তাদের পেশাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা ও থুথু হবে না। চিরুনী হবে সোনার, ঘাম হবে মেশকের মতো সুঘ্রাণ, আগর কাঠের সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া বিতরণ করা হবে, স্ত্রীরা হবে আয়াতলোচনা, সবার চরিত্র এক ও অভিন্ন এবং আকৃতি হবে তাদের পিতা আদমের মতো ৬০ হাত লম্বা।' (বোখারী ও মুসলিম)

নিম্নতম বেহেশতীর মর্যাদা

মুগীরা বিন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ নবী মূসা (আ) আল্লাহকে প্রশ্ন করেন, নিম্নতম বেহেশতীর মর্যাদা কি হবে ? তিনি বলেন, সকল লোক জান্নাতে প্রবেশের পর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে রব! কিভাবে ? লোকেরা তো তাদের স্থান নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য বুঝে নিয়েছে। তাকে বলা হবে, তুমি কি দুনিয়ার বাদশাহদের সমপরিমাণ রাজত্বে সন্তুষ্ট হবে ? সে বলবে, হাঁ, হে রব। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাকে এরূপ পাঁচ গুন দেয়া হলো। তখন সে বলবে, হে রব, আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাকে ঐরূপ ১০ গুন দেয়া হলো এবং তুমি যা চাইবে ও চোখের প্রশান্তির জন্য যা যা দরকার সবই দেয়া হলো। তখন সে বলবে, হে রব, আমি সন্তুষ্ট।

এরপর মূসা (আ) প্রশ্ন করেন উচ্চতর বেহেশতীদের মর্যাদা কেমন হবে ? তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বাছাই ও মনোনীত করেছি, নিজ হাতে তাদের মর্যাদার বীজ বপন করেছি এবং এর উপর তাদের সমাপ্তি করেছি। এটা এমন যে, যা চোখ কোন দিন দেখেনি, কান কোন দিন শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করেনি। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে পারো। আয়াতের অর্থ হলো, 'কেউ জানে না, তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে।' (মুসলিম)

বেহেশতীদের উষ্ণ সম্বর্ধনা

মোত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে, জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে এ বলে অভ্যর্থনা জানাবে, তোমাদের প্রতি সালাম, শুভেচ্ছা, তোমরা সুখে থাকো এবং সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার!' (সূরা যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

বহুতল ভবন ও নির্ঝরিণী

জান্নাতীদের বাসস্থান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ 'যারা মোত্তাকী, তাদের জন্য রয়েছে কক্ষের উপর কক্ষ (বহুতল ভবন) এবং এর নীচে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। আল্লাহ নিজ ওয়াদা কখনও ভঙ্গ করেন না।' (সূরা যুমার ঃ ২০)

সকল প্রকার মজাদার খাবার ডিশ ও ফল-ফলাদি

আল্লাহ্ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও পেরেশান হবে না। তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আমার আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ করো তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। তাদের কাছে সোনার তৈরি ডিশ ও পানপাত্র পেশ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের তোমরা উত্তরাধিকারী হয়েছো, এটা তোমাদের কর্মের ফল। সেখানে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা খাবে।' (সূরা যুমার ঃ ৬৮-৭৩)

জান্নাতে সকল প্রকার ফল-মূল পাওয়া যাবে তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে যখনই ইচ্ছা করবে, তখনই খেতে পারবে।

সোনার খাটে মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে

বেহেশতীরা সোনার খাটে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে আরামের সাথে আলাপচারিতা করবে। (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহ বলেন ঃ 'তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে খাটে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে ফল-মূল এবং তারা যা চাবে সবই।' (সূরা ইয়াসিন-৫৬)

কচিকাঁচা ছোট শিশুদের আপ্যায়ন

শিশুরা আনন্দের খোরাক। তাদের কচিকাঁচা চালন-চলন মনোহর। যদি তারাই আপ্যায়ন করায় তাহলে তা আরো কত বেশী আনন্দঘন হবে! আল্লাহ বলেন ঃ 'তাদের কাছে পানপাত্র ও সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে কচি-কোমল শিশুরা ঘোরাফেরা করবে। আর যা পান করলে মাথা ব্যথা হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দসই ফল-মূল ও রুচিসম্মত পাখীর গোশত নিয়ে আপ্যায়নের জন্য খোরাফেরা করবে।' (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ১৭-২১)

বেহেশতী রমণীরা হবে কুমারী

আল্লাহ বলেন, 'আমি জান্নাতী রমণীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদেরকে চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা বানিয়েছি।' (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৫-৩৮)

হুরেরা হবে আবরণে রক্ষিত উজ্জ্বল মণি-মুক্তার মতো সুন্দরী

আল্লাহ বলেন ঃ 'হুরের উদাহরণ হলো, আবরণে রক্ষিত মুক্তার মতো সুন্দর ও উজ্জ্বল এবং আয়তলোচনা।' (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৩)

আল্লাহ আরো বলেন, 'তাদের চোখ সর্বদাই অবনত (সতী যারা অন্যের দিকে তাকায় না), সুন্দর চোখ বিশিষ্ট এবং তারা যেন ডিমের আবরণের ভেতর সুপ্ত উজ্জ্বল।' (সূরা সাফফাত ঃ ৪৯)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ... যদি বেহেশতের একজন রমণী দুনিয়ার দিকে তাকায় তাহলে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত এবং সুঘ্রাণযুক্ত হয়ে যাবে। তার মাথার ওড়না দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।' (বোখারী)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হুরেরা অত্যন্ত উজ্জ্বল সুন্দরী, রূপবতী, লাবণ্যময়ী, সুন্দর ও বড় বড় চোখের অধিকারিণী হবে, কাপড়ের মধ্য দিয়ে তাদের হাড়ের ভেতরের মজ্জা দেখা যাবে, তাদের দেহ আয়নার মতো স্বচ্ছ হবে এবং যে কেউ নিজের চেহারা তাতে দেখতে পাবে।

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'মোমিনকে জান্নাতে যৌনমিলনের এত এত শক্তি দেয়া হবে। প্রশ্ন করা হলো, এত বেশী কি সক্ষম হবে ? তিনি বলেন, তাকে ১ শত রমণীর কাছে যাওয়ার শক্তি দেয়া হবে।' (তিরমিজী, আলবানী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন)

জান্নাতের তাঁবু ও মাটির বর্ণনা

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জান্নাতে মোমিনের জন্য মুক্তার তৈরি তাঁবু থাকবে। এর দৈর্ঘ হবে ৬০ মাইল। সেখানে মোমিনদের পরিবার থাকবে। তারা তাদের কাছে আসা-যাওয়া করবে, একে অপরকে দেখতে পারবে না।' (বোখারী ও মুসলিম)

তাঁবু দীর্ঘ হওয়ার কারণে সাধারণভাবে একে অপরকে দূরত্বের কারণে দেখতে পাবে না।

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি মিরাজের হাদীস বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহর (সা) বরাত দিয়ে বলেন ঃ 'জিবরীল আমাকে সিদরাতুল মোনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলো। এরপর অজ্ঞাত রং দ্বারা চতুর্দিক আবৃত হয়ে গেলো। পরে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হলো। সেখানে মুক্তার তৈরি তাঁবুসমূহ রয়েছে। এগুলোর মাটি হচ্ছে মেশক।' (বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'জান্নাতের ইট হলো সোনা ও রূপার, মাটি হলো মেশক, কংকর হলো মুক্তা ও ইয়াকুত, মাটি হলো যাফরান। যে প্রবেশ করবে সে সুখে থাকবে, দুঃখী হবে না, চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যু বরণ করবে না, পোশাক পুরাতন হবে না এবং যৌবন শেষ হবে না।

সোনা-রূপার বেহেশত

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'দু'টো বেহেশত রূপার এবং পানপাত্র ও আসবাবপত্রও রূপার। আর দু'টো বেহেশত সোনার এবং পানপাত্র ও আসবাবপত্রও সোনার। জান্নাতে আদনে তাদের ও আল্লাহর মধ্যে দৃষ্টির আড়াল হলো আল্লাহর অহংকারের চাদর।' (বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতের ইটগুলো সোনা ও রূপার, সিমেন্ট হচ্ছে মেশক, কংকর হচ্ছে মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর এবং মাটি হচ্ছে যাফরান।

বাজারের বর্ণনা

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'জান্নাতে বাজার আছে। লোকেরা প্রত্যেক শুক্রবার ঐ বাজারে আসবে। উত্তরের স্নিগ্ধ বাতাস তাদের কাপড় ও চেহারার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। এতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যাবে। তারা ঘরে ফিরে আসলে তাদের স্ত্রীরা বলবে, আল্লাহর শপথ, তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক অনেক গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহর কসম, আমাদের পরে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।' (মুসলিম)

নদীর বর্ণনা

আল্লাহ বেহেশতের নদীর বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ 'মোত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা হলো, নিম্নরূপ ঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল ও স্বচ্ছ দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।' (সূরা মোহাম্মদ ঃ ১৫)

অলংকার

বেহেশতীদের অলংকারের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। সেখানে তারা সোনার চুড়ি ও মুক্তা খচিত কংকন পরবে। তারা মিহি সিল্কের সুন্দর সবুজ পোশাক পরে খাটে হেলান দিয়ে আরামের সাথে বসবে। তারা কতই না উত্তম বিনিময় এবং উত্তম জায়গায় অবস্থান করবে! (সূরা ফাতের ঃ ৩৩)

জান্নাতের নিয়ামত স্থায়ী

আবু সাঈদ ও আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বেহেশতে একজন আওয়াজ দানকারী আওয়াজ দিয়ে বলবে ঃ 'তোমরা এখন থেকে চিরসুস্থ, কখনও অসুস্থ হবে না; তোমরা এখন থেকে চিরদিন জীবিত, আর মৃত্যু বরণ করবে না, তোমরা এখন থেকে চিরযুবক, আর কোনদিন বৃদ্ধ হবে না, তোমরা এখন থেকে চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকবে, কখনও দুঃখ-বেদনার সম্মুখীন হবে না। একথাই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন ঃ

'তাদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমরা এ জান্নাত লাভ করেছো।' (মুসলিম)

সর্বাধিক বড় নিয়ামত

আল্লাহ বলেন ঃ 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের প্রতি তাকিয়ে থাকবে।' (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩)

বেহেশতের মধ্যে সর্বাধিক বড় নিয়ামত হবে আল্লাহর সাক্ষাত।

সোহাইব বিন সেনান রুমী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, তাহলে আমি তা বাড়িয়ে দেবো ? তারা উত্তরে বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে কি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি ? এরপর আল্লাহ নিজের নূরের পর্দা খুলে ফেলবেন।' আল্লাহর অতিশয় সুন্দর সত্তার প্রতি দৃষ্টি দান অপেক্ষা তাদেরকে বেহেশতের আর কোন উত্তম নিয়ামত দেয়া হয়নি।' (মুসলিম)

গান

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'জান্নাতের মধ্যে হুরদের একটি সমষ্টি থাকবে, যারা এমন মধুর সুরে গান গাবে, আল্লাহর কোন সৃষ্টি এত সুন্দর কণ্ঠের গান আর কোন দিন শোনেনি। তারা এ বলে গাইবে ঃ

'আমরা চিরস্থায়ী, কোন দিন খতম হবো না,

আমরা চিরসুখী, কোন দিন দুঃখী হবো না।

আমরা চিরসন্তুষ্ট, কোন দিন অসন্তুষ্ট হবো না,

সুসংবাদ, আমরা যাদের জন্য এবং যারা আমাদের জন্য। (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা)-কে বেহেশতী গানের ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন ঃ সে সকল গান হবে আল্লাহর হামদ ও গুণ-কীর্তন, প্রশংসা ও স্তুতি।

বেড়ানো

বেহেশতে একে অপরের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'বেহেশতীরা বেহেশতে প্রবেশের পর একে অপরের সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী হবে। ইচ্ছা করা মাত্রই একজনের খাট অন্যজনের খাটের কাছে চলে যাবে এবং

উভয়ে এক সাথে হয়ে আরামের সাথে হেলান দিয়ে বসে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি জান, আল্লাহ্ আমাদেরকে কখন ক্ষমা করেছেন ? সাথী উত্তরে বলবে, হাঁ, জানি। আমরা যেদিন অমুক জায়গায় দোয়া করেছিলাম, সেদিন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন।' (বাযযার)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে। সেটাই মধ্যম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।

বেহেশতীদেরকে অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত দেয়া হবে। আল্লাহ্ এক সাথে অনেক নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

'এবং তাদের সবর ও ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক-আশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের তাপ ও শীতের ঠাণ্ডা অনুভব করবে না। আর গাছের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফলসমূহ তাদের আয়ত্ত্বে রাখা হবে। তাদেরকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মতো পানপাত্রে। পরিবেশনকারীরা তা পরিমাণ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতে অবস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝর্ণা।

তাদের কাছে আনা-গোনা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদরে পোশাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের আমল ও কাজ স্বীকৃতি লাভ করেছে।' (সূরা আদ-দাহর ঃ ১২-২২)

জান্নাত সর্বাধিক মূল্যবান জিনিস। তাই তা সংগ্রহের আপ্রাণ ও জোরদার চেষ্টা চালানো উচিত। রমযান মূলতঃ জান্নাত লাভের উপায় এবং তা অর্জনের জন্য বাস্তব চেষ্টা ও পরিশ্রমের বাস্তব প্রশিক্ষণ।

উপসংহার

রমযান হচ্ছে শপথ ও আনুগত্যের নবায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের উত্তম সুযোগ। এটি আত্মসমালোচনার উত্তম সময়। এ মাসটি অন্য এগার মাসের তুলনায় সেরা। ঐ এগার মাসে মানুষের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা দীর্ঘায়িত হতে থাকে। রমযান সেই কামনা-বাসনার লাগাম টেনে ধরে এবং মানুষকে কল্যাণের রাজপথের দিকে ধাবিত করে। রমযান মোমিনের অন্তরে নেক অনুভূতির জন্ম দেয়। কোরআনের মাস কল্যাণের সূচনা ও মোমিনের দ্বীনী ও নৈতিক ব্যবসার মওসুম। রমযানের দিন ও রাত সকল কল্যাণ ও নেক কাজের উৎস। এ মাসে বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত হয় এবং বান্দার সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী হয়। রমযানে অন্তর বিশুদ্ধ হয়।

রমযান মুসলমানের ঐক্যের সূত্র। এ মাসে মুসলমানরা একই পদ্ধতি ও জীবন ধারা অনুসরণ করে। কেননা, সেহরী, ইফতার, শোয়া ও উঠার নিয়ম-নীতি এক ও অভিন্ন।

রমযান হচ্ছে, আত্মার উন্নতির উপায়। যাতে করে তারা দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা শক্তির অধিকারী হতে পারে। মুসলমানরা খালেসভাবে রোযা রাখলে তারা নিজেদের নফস ও আত্মার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পরবর্তীতে রমযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য বিরোধী চরিত্র ও আচরণ অবশিষ্ট থাকলে রোযা রেখে লাভ কি? রাত্রি জাগরণ তো মহান উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। পুলিশ নিরাপত্তামূলক পাহারা, সৈনিক সীমান্ত পাহারা, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা এবং ছাত্র লেখাপড়ার মহান উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ করে। রোযাদারের রাত জাগরণকেও সে মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে হবে।

রমযান হচ্ছে, অল্প এবাদতের মাধ্যমে অধিক পুরস্কার লাভ করার উত্তম মাধ্যম। আমরা যেন মহামূল্যবান রমযানকে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে পারি, আল্লাহর কাছে সে তওফীকই কামনা করছি।

আমরা যেন সাহাবায়ে কেরামের মতো রমযানের পরবর্তী ৬ মাস এ দোয়া করতে পারি। تَقَبَّلِ اللّٰهُ صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا আল্লাহ আমাদের রোযা ও সালাতুল কিয়াম কবুল করুন এবং তার পরবর্তী ৬ মাস যেন এ দোয়া করি وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত জীবিত রাখুন।'

লেখকের রচিত ও অনূদিত অন্যান্য বই

বিশ্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–

১. **ইসলামের সামাজিক আচরণ :** পরিবেশনায় আহসান পাবলিকেশন-এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক আচরণ জানার জন্য এটি অনন্য ও অপরিহার্য বই। এতে সমাজ জীবনের পরিচিত বিষয়গুলোর গভীর ও বিজ্ঞোচিত আলোচনাসহ দুর্লভ দৃষ্টান্তসমূহ স্থান পেয়েছে।

২. **রমযানের তিরিশ শিক্ষা :** পরিবেশনায়- আহসান পাবলিকেশন, বইটি রমযান মাসের জন্য অনুপম হাতিয়ার। এতে রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০টি বিষয়ের ব্যাপক আলোচনাসহ পরিবর্ধিত সংস্করণে বহু নূতন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। রোযা ২১টি রোগের চিকিৎসার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

৩. **সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা :** সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা উৎকৃষ্ট ইবাদত। তবে শর্ত হল, এর ইসলামীকরণ করতে হবে। এ বইতে সে প্রক্রিয়া এবং অপসাহিত্য-সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার সার্থক ও বাস্তব পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. **ফুল যদি ঝরে যায় বরফ যদি গলে যায় :** এ বইতে সময়ের গুরুত্ব ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ৪০ জন মনীষির মহামূল্যবান বক্তব্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. **জিন ও শয়তানের ইতিকথা :** এ বইতে জিন জগতের রহস্য, শয়তানের ৪৯ প্রকার ওয়াসওয়াসা, পরিবার ও ঘরকে জিন ও শয়তান মুক্ত রাখা এবং জিন-ভূত তাড়ানোর প্রচলিত শিরক ও বিদআতী পদ্ধতির পরিবর্তে কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ইসলামী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. **ইসলামে যাদু ও চোখ লাগার প্রতিকার :** সমাজে যাদুগ্রস্ত ও চোখলাগা রোগী অসংখ্য। বহুলোক তা বুঝে না বলে এর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারে না। এ বইতে শিরক ও বিদআত মুক্ত প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. **রাসূলুল্লাহর (সা) নামায ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ :** নাসেরুদ্দিন আলবানী ও এ এন এম সিরাজুল ইসলাম রচিত বইটিতে মহানবীর (সা) নামায পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা এবং নামায ও অযু-গোসলের প্রচলিত দেড় শতাধিক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। অন্য দু'টো প্রকাশনী থেকে পাঠক প্রতারণার কৌশল হিসেবে এর নকল বেরিয়েছে। সাবধান!

৮. **বিশ্ব ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) :** এ বইতে রয়েছে ভালবাসা দিবসের তাৎপর্য এবং ভ্যালেন্টাইন কে বা কি? মুসলমানরা কি এ দিবসটি পালন করতে পারে?

আহসান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত–

৯. **কালেমা শাহাদাত এক বিপ্লবী ঘোষণা :** আতিয়্যা মুহাম্মদ সাঈদ রচিত মূল গ্রন্থটিতে কালেমায়ে শাহাদাত-এর হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. **ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা :** মূল গ্রন্থটির রচয়িতা বাংলাদেশেস্থ সউদী আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিব।

আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–

১১. **ভাল মৃত্যুর উপায় :** নতুন করে প্রায় দ্বিগুন পরিবর্ধিত ও বহু নতুন তথ্য সমৃদ্ধ সংস্করণটি আপনার পারলৌকিক জীবনের সাফল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১২. **যে যুবক-যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায় :** এ বইতে যৌবনের উৎস ও মূল্যায়ন, আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুবকর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. **ইসলামে মসজিদের ভূমিকা :** এ বইতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নবওয়ী এবং মসজিদে আকসাসহ সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা

১৪. **কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস :** (মূল- জামীল যাইনু) ঈমানের অনেক বিষয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ত্রুটিযুক্ত। এ বইতে তা বিশুদ্ধকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৫. **খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম :** মূল– আহমদ দীদাত। (৫টি পুস্তিকার সমষ্টি) এ বইতে খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলো ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬. **ঈসা (আ) বান্দাহ না প্রভু?** মূল- ড. তকী উদ্দিন, এ বইতেও ঈসা (আ) সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা।

১৮. ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস্ রোগের উৎস ও প্রতিকার।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত–

১৯. **মক্কা শরীফের ইতিকথা :** এ বইতে যমযম কূপের রহস্য, মক্কার ইতিহাস, কাবা শরীফ, মসজিদে হারাম, হারাম সীমান্ত ও এতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ, মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদ ও পাহাড়সমূহের বর্ণনা এবং হজ্জ ও হজ্জের প্রায় শ'খানেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

২০. **মদীনা শরীফের ইতিকথা :** বইটিতে মদীনার ইতিহাস, মসজিদে নবওয়ীর বর্ণনা ও ফযীলত, নবী (সা) এবং দু'সাথীর কবর, মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদ ঘর-কূপ ও পাহাড়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হাজীদের জন্য বই দুটো অপরিহার্য সাথী।

২১. **আল আকসা মসজিদের ইতিকথা :** এ বইয়ে মসজিদে আকসা, গম্বুজে সাখরা মে'রাজ এবং মসজিদটি ধ্বংসের ব্যাপারে ইহুদীদের চক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত–

২২. জামাতে নামযের গুরুত্ব।

২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে ধুমপান ও গান-বাজনা।

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

www.ahsanpublication.com